বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

একাদশ বর্ষ, ১৯৯৮
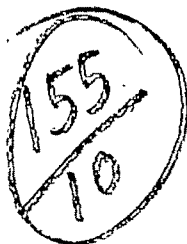
সম্পাদক

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

আদি যুগের তিন মনসা-কবি : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

এক

মনসাকাব্যের অন্ততঃ তিনজন কবিকে চৈতন্য-পূর্বযুগের অর্থাৎ আদিযুগের মনসা-কবিরূপে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এঁরা হলেন মনসাবিজয়-প্রণেতা বিপ্রদাস পিপিলাই এবং পদ্মাপুরাণ রচয়িতা দুজন কবি—বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেব। এঁদের মধ্যে একমাত্র নারায়ণ দেবের রচনাকাল বা অন্য কোন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। যা জানা যায় তা হল, কবি নারায়ণ দেব কায়স্থকুলজাত ছিলেন এবং তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাঢ় থেকে পূর্ববঙ্গে আসেন।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং বাংলার সাহিত্যে ধর্মে ও সমাজ জীবনে তাঁর সম্যক প্রভাব ষোড়শ শতাব্দীর তিনের দশকের পূর্বে বিশেষ উল্লেখ্য নয়। উল্লিখিত তিনজন কবির রচনায় শ্রীচৈতন্যের উল্লেখ নেই এবং শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত বাঙালী মানসিকতার কোন পরিচয় মেলে না। তবে তিনজনের গ্রন্থেই মনসাকাব্যের সৃষ্টিযুগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি বিদ্যমান। এই দিক থেকে বিচার করেই নারায়ণ দেবের রচনাকে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরে নয় বলে ধরা যায়। তাঁর রচনার পুথিগুলি মৈমনসিংহ জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশে) মধ্যে প্রাওয়া যায় এবং ভাষাতেও এই জেলার আঞ্চলিকতার ছাপ থাকায় তাঁকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার কবি বলে ধরা হয়। ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত (১৯৪২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (বহুলাংশে খণ্ডিত) গ্রন্থখানিই বর্তমান আলোচনায় অবলম্বিত হয়েছে।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসাবিজয় (এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত) গ্রন্থখানি বর্তমান আলোচনায় গৃহীত। বিপ্রদাসের রচনার সমস্ত উদ্ধৃতি এই গ্রন্থের অন্তর্গত।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের দুটি সংস্করণ বর্তমান আলোচনায় গৃহীত। প্রথম সংস্করণটি বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল। বর্তমান আলোচনায় বসন্ত সংস্করণ নামে অভিহিত। দ্বিতীয় সংস্করণটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জয়ন্ত দাশগুপ্ত সম্পাদিত (১৯৬২) কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ গ্রন্থ। বর্তমান আলোচনায় এটি জয়ন্ত-সংস্করণ নামে চিহ্নিত।

দুই

বিপ্রদাসের গ্রন্থে প্রদত্ত কাব্য-রচনাকালটি বিনা বিতর্কে গ্রহণ করা যায়। স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির পর কবির উক্তি—

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।
হেনকালে রচিত পদ্মার ব্রতগীত
শুনিয়া দ্রবিত লোক পরম পীরিত।

এর থেকে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়—(১) রচনাকাল ১৪৯৫ খৃঃ (২) হুসেন শাহের রাজ্যারম্ভ কাল ১৪৯৪ খৃঃ হওয়ায় কবির পক্ষে সুলতানের নামোল্লেখ সমীচীন (৩) রচনাকে 'ব্রতগীত' নামে উল্লেখ। এই নামেরই উল্লেখ গ্রন্থের অনেকস্থলে মেলে এবং এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মনসাকাহিনীর প্রাচীন ধারার সঙ্গে বিপ্রদাসের রচনার সুস্পষ্ট সম্পর্কের ইঙ্গিত এখানে মেলে। গ্রন্থে বিপ্রদাসের আত্মপরিচয় এইরূপ—

মুকুন্দপণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম
চিরকাল বসতি নাড়ুড্যা বটগ্রাম।
বাৎস্যগোত্র পিপলায় পঞ্চ প্রবর
সামবেদ কুতুব শাখা চারি সহোদর।
শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে।
পাঁচালি রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ।
কবি গুরু বীর জনে করি পরিহার
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার।

এই পরিচয় থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, লৌকিক দেবতারা যে সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছেন কবি সে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না। আরও দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়। স্বপ্নাদেশ ব্যাপারটি সম্পূর্ণই একটি কবিকৌশল ছিল যার দ্বারা পৃষ্ঠপোষক অথবা সমর্থনকারীর সাহায্য মিলতো। আর লৌকিক দেবতার প্রতি ব্রাহ্মণ্য মতবাদের লোকদের ভক্তিতে কোন ঘাটতি ছিল না

তিন

কবি বিজয়গুপ্তের বসন্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত পদ্মাপুরাণ বহুকাল প্রচলিত। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্তের সম্পাদনায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হলে কবির রচনাকাল ও রচনাবৈশিষ্ট্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

বসন্তবাবুর সংস্করণে অনেক ভিন্ন গায়ক বা কবির নামভণিতা অনেক সমালোচকের কাছে কবির রচনাসম্বন্ধে একটা অনাস্থার ভাব জাগিয়ে তুলতো। তবে মোটামুটিভাবে কাব্যের রসাস্বাদনে কোন বিঘ্ন ঘটতো না এবং কবি-প্রদত্ত রচনাকালটিও উড়িয়ে দেবার বস্তু ছিল না।

জয়ন্ত-সংস্করণে ভিন্ন কবির ভণিতা নেই বললেই চলে। তবে কাব্যের কয়েকটি পদ কবিভণিতাবর্জিত এবং কাহিনীও সে-সব স্থলে বসন্ত-সংস্করণের ভিন্ন কবিনামযুক্ত পদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে সামঞ্জস্যযুক্ত। জয়ন্ত-সংস্করণের চাঁদ-মনসা-দ্বন্দ্বের প্রথমপর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীর পূর্বপর্যন্ত রচনায় সংক্ষিপ্ততা বর্ণনায় এলোমেলো ভঙ্গী এবং ভাষায় আঞ্চলিকতার প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। এমন কি ঘটনাগ্রন্থনেও অবহেলা দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। স্বপ্নাদেশপর্বের পরিকল্পনায় আছে :

ক্রোধ করি কাটিলাম তাহার গুয়াবাড়ি।
জেন মতে বধিলাম শঙ্কু ধন্বন্তরি॥
মহাজ্ঞান হরিলাম ছয়ে পুত্র বধিল।
জালুয়ার ঘরে সোনকা লুকাইয়া রহিল॥

বস্তুতঃ গ্রন্থে গুয়াবাড়ি কাটা যাওয়ার পর চাঁদ মহাজ্ঞান যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ধন্বন্তরিকে দিয়ে গুয়াবাড়ি বাঁচিয়েছে। সুতরাং আগে ধন্বন্তরিবধই কাম্য। কিন্তু ঘটনা বর্ণনায় আগে চাঁদের মহাজ্ঞানহরণের কাহিনী আছে। তারপর ধন্বন্তরিবধপালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বসন্ত সংস্করণে পরিকল্পনামত আগে ধন্বন্তরিবধ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারণ প্রথম বার চাঁদ মহাজ্ঞানপ্রয়োগ না করে ধন্বন্তরিকে দিয়ে গুয়াবাড়ি বাঁচিয়েছে। এবপর মনসা আবার গুযাবাড়ি কাটলে চাঁদ মন্ত্রপ্রয়োগে গুয়াবাড়ি বাঁচিয়েছে। তখনই মনসা তার মহাজ্ঞান রণে নেমেছে। এরপরও চাঁদ গালিগালাজ করায় তার ছটি পুত্রকে মারা হয়েছে।

আসলে ঘটনাগুলি বিপ্রদাসের কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত। বিপ্রদাসকে অনুসরণ করতে গিয়ে ঘটনাবিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে—বসন্তে কম; জয়ন্তে অত্যধিক। বিপ্রদাসে নাথরাবন ধ্বংসের পর চাঁদই প্রথম মহাজ্ঞান প্রয়োগ করে বাঁচায়; তাই প্রথমেই তার মহাজ্ঞানহরণ করা হয়। এরপর নাথরাবন ধ্বংস হলে ধন্বন্তরি বাঁচায়। তখন ধন্বন্তরিবধ।

ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীপূর্ব পর্যন্ত অংশে জয়ন্ত-সংস্করণে সম্পাদক 'খ' ও 'গ' পুথি থেকে দীর্ঘ-দীর্ঘ পাঠান্তর দিয়েছেন। মূল পাঠ 'ক' পুথির। এই পাঠান্তর গুলির সঙ্গে বসন্ত-সংস্করণের পাঠের মিল লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় 'ক' পুথির এই অংশটি কোন কারণে লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী কালে কবি ও গায়কদের দ্বারা এটি দ্রুত সংযোজিত হয়েছে। জয়ন্ত-সংস্করণে চাঁদের ছ' ছেলের দ্রুত মৃত্যুঘটানো এই দ্রুততার একটি পরিচয়।

ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী থেকে পরবর্তী কাহিনী জয়ন্ত ও বসন্তে প্রায় একরকম। অনেক ক্ষেত্রে জয়ন্ত-সংস্করণে কিছু বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। বসন্ত-সংস্করণে প্রদত্ত গ্রন্থরচনা কাল—

ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতিতিলক॥

অর্থাৎ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ। এ সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১-৮২—১৪৮৭-৮৮ খৃঃ)। এঁর মুদ্রাগুলি থেকে জানা যায়, এঁর দ্বিতীয় নাম ছিল হোসেন শাহ। (বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ: রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৫)। ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় এই হোসেন শাহকেই কবি উদ্দিষ্ট সুলতান বলে মনে করেছেন। (মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ১৯৭৪, পৃঃ ৩)।

জয়ন্ত সংস্করণে গ্রন্থরচনাকাল এইরূপ—

ঋতু [শ] শী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতা [ন] হুসন রাজা পৃথিবীপালক॥

অর্থাৎ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ। এই বছরেই বহু পরিচিত আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সুলতান হন। বিপ্রদাসও এই হোসেন শাহের উল্লেখ করেছেন।

বিজয়গুপ্তের দুই সংস্করণেই হোসেন শাহের গুণগান করা হয়েছে এবং স্ব-গ্রামের বিবরণ আছে। কিন্তু বর্ণনায় উভয়গ্রন্থে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বসন্ত সংস্করণের বর্ণনা এই রকম—

সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে খণ্ডেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রীগ্রামে বসতিবিজয়॥

জয়ন্ত-সংস্করণে বিবরণটি এইভাবে প্রদত্ত হয়েছে—

সমরে দুর্জয় রাজা বিপক্ষের যম।
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কামসম॥
যাহার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে [অ] ধিক।
মুলুক ফতোয়াবাদ বাঙ্গরোর [া] [তম] সিক॥

পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর ।
মধ্যে ফুল্লশ্রীগ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
বৈদ্যজাতি বৈসে তথা লেখনে চতুর।
একাদশীর ব্রত লারে পূজয়ে ঠাকুর ॥
স্থানগুণে জেই বৈসে সেই জ্ঞানময়ে।
হেন [ফুল] শ্রীগ্রামে বাস করেন বিজয়ে ॥

বর্ণনা দুটির তুলনা করলে জয়ন্ত-সংস্করণে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বসন্ত-সংস্করণের 'অর্জ্জুনরাজা' জয়ন্ত-সংস্করণের 'দুর্জয়রাজা' হয়েছে। বসন্তে কায়স্থদের 'লিখনের সুর' বলা হয়েছে। এবং তাই সমীচীন। কিন্তু জয়ন্তে বৈদ্যদের 'লেখনে চতুর' বলে 'ক' পুথির লেখক তাঁর হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিজয়গুপ্তের গ্রন্থরচনাকালের ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দটি যদি যথার্থ বলে গৃহীত হয়, তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, সে সময়ে যোগাযোগের ও শান্তি শৃঙ্খলার যে অবস্থা তাতে গৌড়ের সুলতানের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে বরিশালের কবির পক্ষে তার উল্লেখ কি করে সম্ভব ? বিশেষ করে 'যাহার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে অধিক' একথা কবি জানলেন কি করে ? রাজা তো সবে রাজত্ব শুরু করেছেন।

অনেকে মনে করেন, রাজার গুণগান করা তখনকার কবিদের একটি প্রচলিত রেওয়াজ ছিল। তবে কবি বিজয়গুপ্তের পক্ষে এ পদ্ধতিগ্রহণ সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে কিনা বিবেচ্য। 'হাসানহোসেন' পালায় কবির মনোভাব থেকে এ প্রশ্ন উঠতে পারে।

বসন্ত-সংস্করণের ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দই কি খুব গ্রহণযোগ্য ?

জালালুদ্দীন ফতেহ শাহর দ্বিতীয় নাম হোসেন শাহ হলেও তাঁর সময়ে তা কখন এবং কতখানি প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনা ও বৃন্দাবন দাসের ইঙ্গিত থেকে শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে জালালুদ্দীনের নবদ্বীপ আক্রমণ ও হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাটি অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করে নিয়েছেন। বিজয়গুপ্তের হাসানহোসেন পালায় ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের ওপর মুসলমানী অত্যাচারের যে বর্ণনা আছে তাতে অনেকে জালালুদ্দীনের নবদ্বীপ আক্রমণের প্রভাব আছে বলে মনে করেন। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদারের Hosain Shahi Bengal গ্রন্থের (১৯৬৫) ৬৬ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ আছে।

মমতাজুর রহমান বিজয়গুপ্ত-প্রদত্ত হোসেন শাহের প্রশস্তিটিকে আলাউদ্দীন হোসেন সাহের প্রশংসার নজির হিসেবে গ্রহণ করেছেন (পৃঃ ৬৪ দ্রষ্টব্য)। লেখক কিন্তু বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের সংস্করণকে আবার গ্রন্থ হিসেবে নিয়েছেন। এই সংস্করণে প্রদত্ত ১৪৮৪ খৃঃ জালালুদ্দীন হোসেন শাহকে নির্দেশ করে।

চার

বিজয়গুপ্তের 'হাসানহোসেন পালায়' উত্তেজক উপকরণের অভাব নাই। প্রথমেই অত্যাচারীর ভূমিকায় হাসানহোসেন দু'ভাইকে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে আসল অত্যাচারী দুলা নামে হোসেনের 'শালা'।

> সর্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।
> তাহার ভয়ে হিন্দু সব পালায় তরাসে ॥
> যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
> হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ ॥
> বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
> পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥
> পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
> চোপাড় চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা ॥
> যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে হারা কান্ধে।
> পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে ॥
> ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
> বার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে ॥
> ব্রাহ্মণ সুজন তথায় বসে অতিশয়।
> গৃহ ঘর তোলায় না—দুর্জনের ভয় ॥ ইত্যাদি।

চিত্রটি নিঃসন্দেহে অতি ভয়াবহ, কিন্তু এটি তৎকালীন জীবনের প্রতিনিধি-মূলক চিত্র কিনা বলা মুস্কিল। প্রথমতঃ ধর্মান্তর মানুষ ভীতির উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ এত ভীতিসত্বেও অনেক সংখ্যায় (অতিশয়) ব্রাহ্মণ বাস করছে। তৃতীয়তঃ অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে হোসেনের শ্যালকের নামে।

জয়ন্ত সংস্করণের খ, গ পুথির পাঠান্তরে রাখালদের মুখে ব্যক্ত হয়েছে—

> মোলনা মারিয়া ভাই কি না হইল আজি।
> তে কারণে আপনে সাজিয়া আইল বাজি ॥ পৃঃ ১৩০

এই সংস্করণের 'খ' পুথির পাঠান্তরে প্রদত্ত নিম্নের বিবরণটি হিন্দু প্রজা ও মুসলমান ভুস্বামীর তৎকালীন সম্পর্কের যে চিত্র তুলে ধরে তাতেই হোসেন সম্বন্ধে অন্ত ধারণা জন্মে। বন্দী রাখাল যাত্রাবরকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

> খোদা থাকিতে কেনে ভুতেরে নোয়াও মাথা।
> মোর ঠাই কহো তোর বাপ দাদার কথা ॥
> বাপ পিতামহের আমি মাহাত্ম্য কব কত।
> দুর্ভিক্ষে বেচিয়া খাইল বিপ্রে লই থত ॥

পরের সেবা করি আমি আপনা নহে বুঝি।
না বুঝিয়া বোল খোন্দকার আমি ভূত পুজি॥ পৃঃ ১৩২

কবি সূক্ষ্মভাবে এখানে তৎকালীন হিন্দুসমাজের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। দুর্ভিক্ষে পীড়িত বাপঠাকুরদারা ব্রাহ্মণের কাছে খত লিখে দিয়ে সব সম্পত্তি খোয়ালে তাদের দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে যে তাদের বাঁচিয়েছে, সে-ই অত্যাচারী বলে কথিত হাসান। তৎকালে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে দারিদ্র্যে ও ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অনেক ধর্মান্তরকরণ হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এখানে তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

কবি বিজয়গুপ্ত এই হাসানপালাটিকে কেন্দ্র করে নানা রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন। মুসলমান রমণীদের বিধবাবিবাহকে ঘিরে কবির ব্যঙ্গোক্তি তাঁর রক্ষণশীল মনের পরিচয় দেয়। অনুরূপ মনোভাবাপন্ন লোকদের খুসি করাও এর একটি উদ্দেশ্য হতে পারে। হাসান ও তার পাইকদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে স্থূল রসিকতা ও রমনীদের অঙ্গে সাপের কামড় নিয়ে অনেক অশালীন রসিকতা করেছেন।

মনসাকাহিনীতে হাসান-হোসেন পালাটি আনুষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সব মনসাকাব্যে। উত্তরবঙ্গের কবিদের রচনায় পালাটি অনুপস্থিত। নারায়ণ দেবের খণ্ডিত গ্রন্থে এর পরিচয় না মিললেও কবি যে হাসান-বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন তার আভাস মিলছে। উজানী থেকে বরকন্যা নিয়ে চাঁদ তাড়াতাড়ি চম্পকে ফিরতে চায়, কারণ:

হুসেন হাসানের নিকটে আমার পুরি।
না জানি রাজ্যেও কিবা হইল ডাকাচুরি॥

মনসার মুখেও একাধিকবার হাসানের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

কেতকাদাসের কাব্যে হাসানের নতিস্বীকারের পর তাকে হাসানহাটির ভিটে ছেড়ে চাঁদের রাজত্বে পাঠিয়ে দেবার উল্লেখ আছে। সুতরাং নারায়ণদেবের উল্লেখটি কল্পিত মনে করা যায় না।

বিজয়গুপ্তে মুসলমান শাসকের অত্যাচারের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বিপ্রদাসেও এ ইঙ্গিত আছে কিন্তু গুপ্তকবির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক বিস্তর। তাঁর হাসানপালায় যে বিরোধ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে ধর্ম বা জাতিবিদ্বেষ নেই।

বিপ্রদাস গৌড় ও নবদ্বীপের নিকটবর্তী স্থানে বাস করতেন। জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকাল তিনি অবশ্যই দেখেছেন। অথচ হাসানপালায় যেমন হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ বর্ণিত হয় নি, তেমনি হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাতও এখানে স্থান পায় নি। এই পালাটিতে দেবী মনসার সঙ্গে হাসানের লড়াই চিত্রিত হয়েছে।

তৎকালীন মুসলমানসমাজের একটি অন্তরঙ্গচিত্রও বিপ্রদাসের রচনায় মেলে। কৃষাণদের ও বাঁদীদের তালিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নামগুলি কিন্তু সবই মুসলমান ছাপ মারা নয়। মনে হয়, অনেক হিন্দু ধর্মান্তরগ্রহণের পর পূর্বনামের সম্পূর্ণ পরিবর্তন

ঘটায় নি, এ তারই পরিচয়। ধর্মান্তরকরণ যে স্বেচ্ছায়ও হত তার প্রমাণ মেলে সমৃদ্ধ হাসাননগরে একটি অঞ্চলের বর্ণনায়—

হিন্দুত কলিম দিল মুসলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুছলমান
শিখাএ নামাজ অজু সদাই মক্কবে রুজু
নিরন্তর খলিপা জোগান।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দুমুসলমান যখন পাশাপাশি বাস করতে আরম্ভ করেছে সেই সময়ের পারস্পরিক সম্পর্কচিত্র হাসানপালায় তুলে ধরেছেন কবি বিপ্রদাস।

রাখালদের পূজাগ্রহণের পরই ভিন্নধর্মাবলম্বী 'তুড়ুক'দের পূজা প্রচারের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগের মুসলমানরা তুর্কীজাতীয় বলে 'তেড়ুক' নামে প্রথম দিকের মঙ্গলকাব্যে বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের রচনায় খ্যাত। রাখালদের মধ্যে সংস্কারের বাধা, এখানে ধর্মীয় বাধা। বৃদ্ধরূপিনী মনসাকে প্রথম দেখে রাখালদের এই উক্তিটি তাদের সংস্কারগত বাধাকে প্রকাশ করে—

ত্রাসে সভে বলে বুড়ি নাগ-বাচা জানে
মন্ত্র পড়ি জত নাগ ডাক দিয়া আনে।
সভেরে খাইবে আজি নাগ শিখাইয়া
সভে মিলি ধায়্যা গেল হাতে বাড়ি লৈয়া।

হিন্দুর দেবতাদের মধ্যে মন্ত্রতন্ত্র ও আলৌকিক শক্তির প্রাধান্যের জন্য সম্ভবত তারা 'ভূত' নামে মুসলমানদের দ্বারা তখন অভিহিত হত। পৌত্তলিকতা ও বহুদেবতার মান্যতাও মুসলমানধর্ম বিরুদ্ধ বিশ্বাস ছিল—

বিপ্রদাস হাসানকাহিনী এভাবে শুরু করেছেন—

আর এক অপরূপ শুন মন দিয়া
রাহির কারণ কিছু তুড়ুক লইয়া।
হাসনহুসন তার প্রধান দুইজন
চিরকাল আছে সুখে আপন ভুবন।

এরপরই কৃষিচিত্র ও মনসাবিক্রমচিত্র এসেছে—

শতেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত
চষিতে গমন কৈল বড় হরষিত।
জোয়ালি জুড়িয়া গরু লৈল খেদাইয়া
হরিষে চলিল হাতে পাচনি লইয়া।
বুহিতা বাকুড়ি গিয়া দিল দরশন
লাঙ্গল জুড়িয়া চাষ চষে সর্বজন।

গোরামিনা নামে তার প্রধান কৃষাণ
তাহার গোলাম গেল করিবারে স্নান।

যেখানে রাখালরা গাছের তলায় ঘটে সিজের জল রেখে পূজা করছিল, তার পাশ দিয়ে গোলামের স্নানের ঘাটে যাবার রাস্তা। তাকে দেখেই—

ক্রোধ যুক্ত হৈল সবে তুড়ুক দেখিয়া
ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া।

গোলাম পালিয়ে গিয়ে দাদাকে জানালেন। তখন সকল কৃষাণ রাখালদের উদ্দেশ্যে ছুটে এল এবং রাখালরা যথারীতি পালিয়ে গেল। দেবী তাদের ঘটেই ছিলেন, এখন ঘট ছেড়ে অন্তরীক্ষে রইলেন। কিন্তু তার আগে ঘটের মধ্যে বিষতিয়া সাপকে কাঁচপোকা করে রেখে দিলেন। গোরা মিনা ঘটের জল সরিয়ে কাঁচপোকাটি পেয়ে খুসি হল এবং সযত্নে ইজারের পকেটে রাখলো রাজাকে দেখাবে বলে। এবার মনসা হাঁক দিলে—'বধহ তুড়ুক সব জনেক রাখিয়া।'

এরপর বাঁদীদের পালা। তারা পুকুরঘাটে জল আনতে যাচ্ছিল, পথের মাঝে ঘট সাজিয়ে পুষ্পজল দিয়ে মনসা বুড়ি বামনি সেজে নিজেই পূজায় রত হল। রোজার মাসে 'ভূত' পূজা দেখে বাঁদীরা তেলেবেগুনে জলে উঠে শাসালে—

জানাইব এখনি হাসন বিদ্যমান
নাকচুল কাটিয়া করিব অপমান।
কোথা হৈতে আইলি বুড়ি ডাইনি হিন্দুয়ানি
পথ ছাড়ি দেহ বুড়ি লৈয়া জাহ পানি।

'ডাইনি' কথাটি তখন মুসলমান সমাজেও প্রচলিত। বাঁদীদের পরিণতি কৃষাণদের মতই হল। তারপর হাসানের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হল।

বিপ্রদাস দেবীর দ্বারা বিরোধচিত্র এঁকেছেন, বিজয়গুপ্তে এ বিরোধ মানুষের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিপ্রদাসে মনসা বিছুটি ও 'ভেঙ্গরুল' রূপে হাসানকেই জ্বালাতন করেছে আর বিজয়গুপ্তে চতুর কুম্ভকার ভীমরুলের চাক ও বিছুটি দিয়ে হাসানের পাইকদের নাস্তানাবুদ করেছে।

বিপ্রদাস বৃদ্ধা বামনিরূপে মনসার সঙ্গে হাসানের লড়াইয়ের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে অতিশয়োক্তি অবশ্যই আছে, অলৌকিকতারও কিছু ঘাটতি নেই, কিন্তু তৎকালীন যুদ্ধবাজ সৈনিকদের যথাযথ বর্ণনা তাতে মেলে। বিজয়গুপ্তে যুদ্ধযাত্রার আড়ম্বর আছে, যুদ্ধ নেই।

বিজয়গুপ্ত হাসানের মা (বা পিতামহী) জোর করে ধর্মান্তরিত বলে উল্লেখ আছে। হিন্দুদেবদেবীর মহিমা তার পক্ষে জানা স্বাভাবিক। বিপ্রদাসে হাসানের চাঁপাবিবি মুসলমানী মেয়ে কিন্তু তার কথায় হিন্দুমুসলমান সমাজজীবনের একটি যোগসূত্রের পরিচয় ধ্বনিত হয়েছে। যুদ্ধগমনরত হাসানকে উদ্দেশ্য করে চাঁপাবিবি বলেছে—

সাপের দেবতা বটে সেই ত মনসা
হিন্দুর গোসাঞি যবনের হাওয়াসা।
তার সঙ্গে রাজা তুমি না করিহ বাদ
নাগেতে বেড়িয়া রাজা হইব প্রসাদ।

বেশ বোঝা যায়, মুসলমান সমাজেও সর্পদেবীর মহিমা তখন অজানা ছিল না।

মুসলমান অন্তঃপুরে হিন্দু বৈদ্যচিকিৎসকদের তখন (অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে) যাওয়া আসা ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। বিপ্রদাসের হাসানপালায় মুসলমান অন্তঃপুরে খড়িপাঁজি নিয়ে হিন্দু দৈবজ্ঞের যাতায়াত ছিল দেখা যায়। দৈবজ্ঞবেশী মনসার কথাতেই চাঁপাবিবি স্বামীর মাথায় আগুন ফেলে দিয়েছে।

বিজয়গুপ্তে লড়াই নিরস্ত্র রাখালদের সঙ্গে সশস্ত্র বাজির সৈন্যদের। বিপ্রদাসে লৌকিক শক্তির সঙ্গে অলৌকিক শক্তির লড়াই। তাই লৌকিক শক্তির পরাজয় সর্বত্র। তবে এই বর্ণনায় বিপ্রদাস কিছুটা কৌতুক রসের পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কবি কৌতুক সৃষ্টিতে দক্ষ ছিলেন। নৌকাডুবির পর হাঁটাপথে চাঁদ বাড়ি ফেরার কালে একবার ব্যাধ, দস্যুদল, সাধু নগরবাসী সকলের হাতে কৌতুকজনক পরিস্থিতিতে নাকাল হয়। তবে কবি সূক্ষ্ম নির্মাণ কৌশলের দ্বারা বাস্তবসম্মত চিত্রই এঁকেছেন। হাসান-পালাতেও তাই। জাতি ও ধর্মবিদ্বেষের দ্বারা চালিত হয়ে কবি এ-সব কৌতুকচিত্র আঁকেন নি। শুধু অবস্থার বিপাকই সহজ কবিদৃষ্টির দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

হাসানের সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্য নানাস্থানে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সেখানেই মনসার চর কামড়ে মেরে ফেলেছে। বিভিন্ন স্থানে এই মৃত্যুর দৃশ্যগুলি কবি সহজ কবিত্বের দ্বারা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়েছেন। যে পুকুরের জলে নেমেছিল, তাকে জলের বোড়া মেরে ফেললে 'খোলা ছেই হেন জলে ভাসিয়ে বেড়ায়।' যে গাছে উঠেছিল, সে সাপের কামড় খেয়ে 'পাকা তাল হেন শীঘ্র গাছ হৈতে পড়ে।' এই সর্বাত্মক ধ্বংসলীলার চিত্র দুটি লাইনে অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে—

দাবানলে পুড়ে যেন অতি শুষ্ক বন
খেদাড়িয়া সব সৈন্য করয়ে নিধন।

বিপ্রদাস আক্রান্ত পর্যুদস্ত নগরবাসীর যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে তাঁর সহজ কবি দৃষ্টির পরিচয় মেলে। মনসার আক্রমণ থেকে নিষ্পাপ শিশুদেরও রেহাই নেই—

খেলিতে ছাওয়াল জায় তথা বিষতিয়া খায়
কান্দিতে কান্দিতে সেহ চলে

কবি দরিদ্রের দুঃখ ভোলেন নি—

মুরগি করিয়া কোলে মাকুড়ি কান্দিয়া বলে
আজিকালি বজ্রদা পাড়িত।

ধান্ধাবাজেরা দুর্যোগ হাঙ্গামাতেও গুছিয়ে নিয়ে চায়—

মিঞা যদি ফৌত হৈল গোলামের খোস পাইল
বিবি লৈয়া পলাইতে চায়।

বিপ্রদাস ব্রতগীত রচয়িতা বলে সমাজের সর্বস্তরে মনসার পূজা ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রথমে রাখালদের ও পরে হাসানপালার অবতারণা করেছেন। তাই যুদ্ধে পর্যুদস্ত হাসানের কাছে স্বয়ং মনসা এসে বলেছে—পূজহ মনসাপদ একান্ত ভাবিয়া।

জেই বর চাহ সুখে পাবে হৃষ্ট হৈয়া।

আবার হাসানের পূজার পদ্ধতিও সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত এবং সম্পূর্ণ লৌকিক ঢঙের—

সেতার গোছল করি আইল হাসানে
ফুলপানি লৈয়া অতি ভক্তি করি মনে।
ডাকি বলে বামনি লহগো ফুল পানি
জিয়াইয়া দেহ গো হুসেন ভাইখানি।
হাসিয়া বলেন পদ্মা শুনরে হাসন
আমি জেইমতে বলি করহ পূজন।
স্বর্ণবারি বিচিত্র নৈবিদ্য দশ ফল
ভক্তিভাবে তুলসী কমল শতদল।
মনসাকুমারী নামে পূজা একমনে
এমনি জিয়াইয়া দিব জত পুরীজনে॥

অব্রাহ্মণ্য, অপৌরাণিক সমাজ জীবন থেকে লৌকিক দেবতারা উঠে এসেছেন, এখানে তার চিহ্নটি রয়ে গেছে। যেখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, সেখানেই যত ভেদাভেদ, যত রক্ষণশীলতা। লৌকিক দেবতার আদিম সংস্কার একমাত্র বিপ্রদাসের রচনাতেই পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় কবি বিজয়গুপ্ত ব্রাহ্মণ্যসংস্কারযুক্ত। মায়ের কথায় দু-ভাই পদ্মাপূজায় অভিলাষী হয়েছে জানতে পেরেই মনসা নারদকে দিয়ে পূজার ঘট পাঠিয়েছে। ব্রাহ্মণে পূজা করেছে। নানা উপকরণে ও বলিতে দেবীর পূজা সমাধা হয়েছে। হাসানকে দাড়ি কামাতে হয়েছে। দেবীর কৃপায় সবাই প্রাণ পেয়েছে, কিন্তু দেবী দেখা দেন নি।

বিপ্রদাসে সামান্য উপকরণেই লৌকিক দেবতার পূজা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। বলির ব্যবস্থা কোথাও নেই। একমাত্র চাঁদই দেবীকে মেনে নেওয়ার পর বলির রক্তে সর্বত্র ভিজিয়েছে।

পরিশেষে কবি বিপ্রদাস হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের ছোট একটি নজির রেখেছেন হাসানকে বরদানের মধ্যে :

ছত্রিশ আশ্রম লৈয়া সুখে ভুঞ্জ রাজ্য
প্রচার করিহ ক্ষিতি মোর পূজাকার্য।

বর দিলা হাসানেরে ভকতবৎসলা
পদাঘাত কৈলা শিবে হাসিয়া কমলা।

এই গ্রন্থে পরে চাঁদের মাথাতেও দেবী পদাঘাত করেছেন। দেবীর সন্তুষ্টি প্রকাশের এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি পা দিয়ে হাসানের মাথা স্পর্শ করলেন কিন্তু স্পর্শদোষ ঘটলো না।

পাঁচ

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইলিয়াস শাহী আমলে দিল্লীর কবলমুক্ত হয়ে বাংলা স্বাধীনরাজ্যে পরিণত হল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু প্রজাদের সম্বন্ধে শাসক-মনোভাবেরও পরিবর্তন হলো। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা রাজসভায় গৃহীত হল, সরকারী কর্মে অংশগ্রহণে সমর্থ হল, সৈনিকরূপে রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার সুযোগ পেতে লাগলো। এই স্বাধীন সুলতানদের প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার যে সুযোগ এল, তার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টির নমুনা প্রকাশ পেতে লাগলো।

মুসলমান-বিজয়ের প্রথম দেড়শোটি বছরকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয়। এর কারণ হল সেন আমল পর্যন্ত প্রচলিত উচ্চ ব্রাহ্মণ্য-ধারার সাহিত্য রচনা এ সময় স্তব্ধ হয়ে যায়। সহজিয়া বৌদ্ধদের ধর্মাচরণ ঠিকই চলছিল তাদের গুরুর আশ্রয়ে। তান্ত্রিক ও শৈবযোগীরাও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মচর্চায় বিরতি ঘটায় নি। লৌকিক দেবতারা কোন গোষ্ঠীর দেবতা নন। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, শৈব প্রভৃতি ধর্মের মানুষদের বাদ দিলে যে অসংখ্য মানুষ অবশিষ্ট থাকেন তাঁরাই লৌকিক দেবতার উপাসক। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান পুরুষদের সাময়িক অন্তর্ধানের সুযোগে এই লৌকিক ধর্মটি বিশেষ সমৃদ্ধ হয় এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের হিন্দুর ধর্মাচরণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-জীবনীকার বৃন্দাবন দাসের মন্তব্যটি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ:

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥ ইত্যাদি (আদি/২অ)

লৌকিক ধর্মাচরণ যে নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ব্রাহ্মণ্য সমাজের মানুষদের মধ্যে এই ধর্মের প্রভাব যে বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার অকাট্য প্রমাণ বৃন্দাবন দাসের উক্তিটি। মনসা চণ্ডী স্থান করে নিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার রঘুনন্দনের রচনায় মঙ্গলচণ্ডী শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করে ফেলেছেন। আর পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসাকাব্যগুলিতে দেখা যায়, একমাত্র চাঁদ ছাড়া সবাই মনসাভক্ত। তার স্ত্রী, পুত্রবধু, বন্ধুবান্ধব, অনুচর সবাই মনসার ভক্ত। তাই চাঁদই মনসার লক্ষ্য।

চাঁদ এখানে পৌরাণিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতীক। সেই গুপ্তরাজাদের সময় থেকে অর্থাৎ যখন থেকে ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক ধর্ম পাশাপাশি বাস করে আসছিল, তখন থেকেই লৌকিক মানসে তীব্র রেষারেষি বিরাজ করতে থাকে।

আখ্যানমূলক লৌকিক দেবআখ্যানে তাই পৌরাণিক দেবতাদের অবনমন ও লৌকিক দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কাহিনী বরাবরই চলে আসছিল। সম্ভবত সেন-পূর্বযুগে অর্থাৎ যখন বাঙ্গালীর জীবনে নৌবাণিজ্যের প্রাধান্য ছিল তখন থেকেই একটি প্রধান বণিককে লৌকিক দেবতা মনসার প্রধান প্রতিপক্ষরূপে খাড়া করা হয় লৌকিক ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যে। তখন থেকেই চাঁদ বারবার মনসার কাছে পরাজিত হয়ে আসছে। যে লৌকিক ধর্মআখ্যানে চণ্ডী ও শিব বারবার মৃত্যুবরণ করে আসছে সেখানে চাঁদ যে পরাজিত হবে সে আর বিচিত্র কি! সম্ভবত সংস্কৃত সাহিত্যে রাজাদের ও বৌদ্ধসাহিত্যে শ্রেষ্ঠীদের প্রাধান্য দেখেই লৌকিক কাহিনীকাব্যেরা একটি শ্রেষ্ঠ বণিককে মনসার প্রতিপক্ষ করেছে। অবশ্য এসব কথা অনুমানসাপেক্ষ কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য কবিদের হাতে মনসাকাব্য লিখিত রূপ গ্রহণের পূর্বে এ কাহিনীর কোন লিখিত ঐতিহ্যই ছিল না। লৌকিক দেবতার পূজক সমাজের অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর মানুষ বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য কবিদের রচনা যে বিশ্বাসযোগ্য, তার প্রমাণ পৌরাণিক দেবতাদের অবনমন চিত্রগুলি তাঁরা সযত্নে তুলে দিয়েছেন ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামীর দ্বারা চালিত হয়ে কাহিনীর ঐতিহ্যের পরিবর্তন ঘটান নি।

চাঁদ লৌকিকধর্মে পূজকদের কাছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তার নানাবিধ গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার উচ্চ শ্রেণীসুলভ আভিজাত্যের অহঙ্কারের প্রতীক। আর লৌকিক ধর্মের আচরণকারীরা শিক্ষায় বঞ্চিত অস্পৃশ্য বলে উচ্চশ্রেণীর মানুষদের জনপদে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত, সবরকম সামাজিক ও আর্থিক সুযোগসুবিধা থেকে দূরে অবস্থিত এবং যখন তখন নানাবিধ অত্যাচারে সম্বলহীন হয়ে বাস করতো যুগের পর যুগ ধরে। মনসা এদেরই মুখপাত্রী। সমাজ যখন ধর্মকে গ্রহণ করেছেন পুরাণ যখন তাকে সমাদর করেছে স্মৃতিগ্রন্থে যখন তার স্থান হয়েছে তখন চাঁদ তাকে ঠেকাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এবং অনেকে এখানে ধর্মদ্বন্দ্বের ছবি দেখেছেন এবং বর্তমান কালের সমালোচকেরা এর মধ্যে ধর্ম ও পুরুষাকারের দ্বন্দ্ব দেখেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি শক্তিশালী সুবিধাভোগীর সঙ্গে বঞ্চিত দুর্বলদের চিরন্তন সামাজিক দ্বন্দ্বের একটি মধ্যযুগীয় রূপ। তখন পুরুষকার-সংস্কার জন্মায় নি। দৈবের পরাজয়ের কথা সে যুগের লোক ভাবতেই পারতো না। সবাই একান্ত দৈব-নির্ভর।

দেশে নবাগত ইসলামধর্মে সব মানুষের সমমর্যদার দৃষ্টান্তেই সম্ভবত পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের সংস্কারের স্থলে এই গণমুখী ধর্মসাহিত্য ধারাটি জন্মগ্রহণ করেছিল খুব সহজেই, এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গণ চেতনাকে আত্মসাৎ করতে করতে উনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যে পুনর্জন্মের যুগটি সম্পূর্ণরূপে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত এবং এযুগের কবিরা কেউই শুধু ধর্মসাহিত্য রচনায় নিযুক্ত হন নি। যদি ধর্মসাহিত্যরচনাই কবিদের উদ্দেশ্য হত তাহলে কৃত্তিবাস সমগ্র রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করতেন, মালাধর বসু সমগ্র ভাগবতগ্রন্থটিকে অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরতেন এবং ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ও কায়স্থসম্প্রদায়ের কবিরা মঙ্গলকাব্যরচনার ব্রতী হতেন না।

সেন-আমলে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ চরমে ওঠে। ফলে দেশের প্রতিরোধশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। জাতীয় চেতনার অভাবের যুগে একসময়ে ধর্মের যোগসূত্রে লোকে একতাবদ্ধ হত। কিন্তু ধর্ম যেখানে মর্যাদা দেয় না, উচ্চশ্রেণী যেখানে নিম্নশ্রেণীকে মানুষ বলেই মনে করে না, সেখানে জাতি ও দেশ স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়ে। বখ্‌তিয়ার খিলজিদের জয়ের পথ সহজ হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মঙ্গলসাহিত্যে লৌকিক দেবতার সম্মাননার মধ্য দিয়ে লৌকিক দেবতাসমাজের মানুষকে কাছে টানার একটা প্রয়াস দুর্লক্ষ্য নয়। তাছাড়া শিক্ষা ও নীতিমূলক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চর্চার চেয়ে নৃত্যগীত ও কাহিনীসর্বস্ব লৌকিক ধর্মীয় পদ্ধতি লোকের চিত্তবিনোদনের সহায়ক ছিল। কাব্যে আত্মপ্রকাশে ইচ্ছুক কবিকুল তাই নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের কথা ভুলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লৌকিক দেবতার আখ্যান রচনায় ব্রতী হন।

আদিযুগের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যপ্রভাবপূর্ববর্তী পঞ্চদশ অথবা ষোড়শের প্রথম দিকের মনসামঙ্গলকাব্যগুলি একই সঙ্গে পূর্ব (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। এরূপ আকস্মিক যোগাযোগের কারণ নির্ণয় ও খুব দুঃসাধ্য নয়।

মুসলমান বিজয়পরবর্তী প্রথম দেড়শোটি বছর ধর্মীয় আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কিছুটা বিপর্যয় চলে। মনে হয়, এই সময়ে অনেক ধার্মিক ব্যক্তি তাঁদের পুঁজিপাটা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে রাঢ় ও বরেন্দ্র ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে থাকে। সহজিয়া সাধকেরা এই সময়েই তাঁদের রচনারাজি নিয়ে নেপালে আশ্রয় নেন—একথা আজ সর্বজনবিদিত।

একদিন যে অঞ্চলটি পূর্ববর্তী সব রাজাদের আমলে শাসন-কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকতো যে-কোন রাজার উত্থানের সময় প্রথমেই পরাধীনতার শিখল পরে নিতো, সেই অঞ্চলটিই এবার অভিনব ধরনের রাজপরিবর্তনের কালে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হিন্দু গুপ্তরাজাদের মহারাজ শশাঙ্ক সহিষ্ণু পালরাজারা কিংবা সেনবংশীয় রাজাদের আমলে রাজপরিবর্তনে ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিপন্ন হবার কোন কারণ ঘটে নি। কিন্তু এভাবে অধিকারের রূপ ভিন্ন। এই সব অঞ্চল থেকে অনেকেই ধর্মগ্রন্থ ও দেবতাসংস্কার নিয়ে অধিকারী ও পালাতে হয়েছে উত্তরে নেপালে বা পূর্ববঙ্গে।

পূর্ববঙ্গ দীর্ঘকাল মুসলমানশাসন কবল মুক্ত ছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধ লৌকিক ধর্মের উপাসকরা অনেকেই এ সময়ে এখানে চলে আসেন। তারপর ইলিয়াশ শাহী

আমল থেকে সমগ্র বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ গড়ে উঠলে যখন নতুন করে ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয় তখন একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মনসাকাব্য-সৃষ্টি বিচিত্র নয়। তবে স্থানগত ঐতিহ্যের মাহাত্ম্যে বিপ্রদাস-কাব্যে সযত্নে মনসা ঐতিহ্যটিকে তুলে ধরেছেন বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের রচনায় তার বিচিত্র রঙ ফুটে উঠেছে।

মনসা কাহিনীকে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ যেমন আপনার করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তা হয় নাই। নানাবিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে বাস করার জন্য পূর্ববঙ্গীয় জীবনে কঠোরতা ও কোমলতার একত্র সমাবেশ ঘটে। মনসাকাব্যের মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার যুগপৎ উপস্থিতি কাব্যটিকে জনমানসে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলে। মনসাদেবীর সংগে ভক্তির সংগে সংগে একটা আন্তরিক যোগও ঘটে যায়।

মনসাকাহিনীর আদি উৎসভূমি যে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল এবং বিহারের সন্নিহিত প্রদেশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চাঁদসদাগর, বেহুলা, উজানী, চম্পক, গাংগুব নদী বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেবেব কাব্যে সমান মর্যাদা পেয়েছে। এমন কি বিপ্রদাসের কাব্যের সংগে বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের যে পবিচয় ছিল তারাও সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। পূর্ববংগীয় কবি বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের সংগে পশ্চিমবঙ্গীয় কবি বিপ্রদাসের গ্রন্থের পরিচয় যাই থাক না কেন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিস্ময়কর।

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসাকাহিনীর প্রাথমিক রূপটি ধরা যায় যেহেতু কবি কাব্যকে শিল্পরূপ দেবার চেষ্টা করেন নি। বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব তাঁদের কাব্যকে শিল্পরূপ দেবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন।

বিপ্রদাসের রচনায় ঐতিহ্যসম্পন্ন মনসাকাহিনীর প্রাথমিক সূত্রগুলির পবিচয পাওয়া যায়। পুরাণের ব্যবহারেই প্রাথমিকতাব লক্ষণগুলি বেশি পরিস্ফুট। পুরাণকাহিনীর বিকৃতি, একাধিক কাহিনীর মিশ্রণের জটিলতা, দেবচরিত্রে আদিমতার প্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ব্রতগীত' নামে তিনি তাঁর রচনাকে অভিহিত করে লৌকিককাব্যের সূচনা পর্বের ছাপটি ধরে রেখেছেন। রচনায় কাহিনী ও চরিত্রের সুসমঞ্জস রূপ ফুটে উঠেছে অথচ কোথাও লোকমনোরঞ্জনেব চেষ্টায় কাহিনীর মূল আবেদনকে অতিক্রম করে যান নি। অথচ বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের রচনায় বারবার তা লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ববঙ্গীয় কবিদের রচনা যে লোকমনোরঞ্জনে রত তার প্রমাণ মিলছে কাব্যের অবয়বগঠনে। লাচাড়ী ও পয়ার বা শিকলিতে বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব কাহিনীর অবয়বসংস্থান করেছেন। ইংরেজিতে যা narrative, মঙ্গলকাব্যে তাই পয়াব বা শিকলি অর্থাৎ কাহিনীব ক্রম-অগ্রসরতাকথন। ইংরেজিতে যা descriptive মঙ্গলকাব্যে তাই লাচাড়ী অর্থাৎ কাহিনীর অগ্রসরতা থামিয়ে একটি বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার ওপর বেশি আলোকপাত। কাহিনীকে এইভাবে গড়ে তোলায় কাহিনীর একঘেয়েমি নষ্ট হয়ে

আকর্ষণশক্তি বাড়ে। পূর্ববঙ্গীয় কবিরা কাব্যদেহকে পয়ার ও লাচাড়ীতে ভাগ করে লোকমনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন।

পশ্চিমবঙ্গীয় বিপ্রদাসের কাব্যে পয়ার ও লাচাড়ীর এরূপ বিভাগ নাই। রচনা পুরোপুরি বর্ণনাধর্মী। রচনা যদিও রাগরাগিনী প্রধান ও সঙ্গীতময়, কিন্তু কাব্যদেহে ঘটনার এ জাতীয় কোন গুণগত বিভাগ নাই। 'পয়ার'কে শুধু একটি রাগ হিসেবে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। এমন কি পশ্চিমবঙ্গীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাসের কাব্যেও এ জাতীয় গুণগতবিভাগের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পূর্ববঙ্গীয় রচনাগুলি পালাভিত্তিক। মনসাকাব্যের পূর্ববঙ্গীয় জনমনে অসাধারণ জনপ্রিয়তাই এর কারণ। বর্ষার শ্রাবণে জলবেষ্টিত গ্রামাঞ্চলগুলি বিভিন্ন গায়কের পালা-ভিত্তিক গানে মুখরিত হয়ে উঠতো। এর প্রত্যক্ষ ফলরূপে বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের রচনা বিভিন্ন গায়কের নামভণিতাযুক্ত হয়ে কবির বচনাকে সমস্যাকণ্টকিত করেছে। এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডঃ সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের (১৯৬৫) আদিপর্বের অপরার্ধের ২৫৩ পৃষ্ঠায়।

পরোক্ষ ফল হিসেবে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গীয় রচনাগুলিতে লোকমনোরঞ্জনের জন্য নানা প্রকরণপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল—বাণিজ্যপর্বে চাঁদের চাতুর্য প্রকাশের মধ্যে উদ্ভটরসের সৃষ্টি, যম-মনসার লড়াইয়ের অবতারণা করে রাম-রাবণের যুদ্ধের অনুরূপ দীর্ঘ বর্ণনা, দাম্পত্যকলহের মুখরোচক বর্ণনা, নানাবিধ আহার্য সামগ্রীর চিত্তাকর্ষকরূপে দীর্ঘবর্ণনা, যতি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে বেহুলার কলহের মধ্যে গ্রাম্যইতরতার প্রকাশ, এয়ো রমনীদের রূপমোহ ও লালসার মুখরোচক পরিচয়, বাসর-চিত্রের অশালীনতার পরিচয় প্রভৃতি সমাজের যুগোচিত চিত্রাঙ্কন এবং নানাবিধ সংস্কার আচার আচরণের পরিচয়দান প্রভৃতি। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনটিই বিপ্রদাসের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর রচনা অনেকটা পাঠ্যগ্রন্থজাতীয়। ভিন্ন-নামভণিতাবর্জিত অখণ্ডরূপে তাঁর গ্রন্থের সন্ধান মিলেছে।

আহার্যদ্রব্যের বর্ণনা বিপ্রদাসে নাই বললেই চলে। তাঁর রচনায় চাঁদের বাণিজ্যপালা আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ণিত। বণিকসম্প্রদায় বিন্দুমাত্র হেয় প্রতিপন্ন হয় নাই, বরং বণিকই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছে। নৌকাডুবির পর ঘরে ফেরার বর্ণনায় সকলের কাব্যেই চাঁদের মাছ বা কাঠ বিক্রী করে চারটি কড়ি বা চারপণ কড়ি পাওয়ার উল্লেখ আছে। সবাই এই কড়ি দিয়ে কেনাকাটার পরিকল্পনা করেছেন। বিভিন্ন কাব্যে পরিকল্পনাগুলির পরিচয় নিলেই কবিদৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলবে।

বিপ্রদাসের চাঁদ বলেছে—

এই কড়ি দিয়া আজী কিনিব বসন।
আর কাষ্ঠ আনি অন্ন করিব ভোজন ॥

তারপর এই সামান্য অর্থ নিয়ে বস্ত্র কিনতে গিয়ে প্রথমে তাঁতিদের সংবর্ধনা ও পরে লাঞ্ছনার চিত্রটুকুর মধ্যে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের একটি চিরন্তন চিত্র ফুটে উঠেছে। আবার বস্ত্রের মহার্ঘতাও উপলব্ধি করা যায়।

বিজয়গুপ্তের চাঁদ চারপণ কড়ির ভাগ করেছে—

এক পণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আর একপণ কড়ি দিয়া চিড়া কলা খাব॥
আর একপণ কড়ি দিয়া নটী বাড়ী যাব।
আর একপণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব॥

অথচ একখানি বস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন, চাঁদ তা ভেবেই দেখলে না। নটীর বাড়ি যাওয়া, আহার ও দাড়িকামানোর বিলাসচিন্তায় সে বিভোর। কবি নাপিত-বেশী মনসাকে দিয়ে তার চুলদাড়ি কাটা নিয়ে প্রচুর রঙ্গ করলেন, দর্শকসাধারণ অত্যন্ত খুশি হল।

নারায়ণ দেবের চাঁদের হিসেব—

চান্দো বোলে অর্দ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব।
আর অর্দ্ধেক কড়ি আনি নটিরে বিলাইব॥
নগরে বাজাইব বাদ্য বিসহরি মুড়ান।
লঘু কানি শুনিলে যেন পায় অপমান॥

বিজয়গুপ্তের চাঁদের সঙ্গে খুবই মিল, তবে কবি রসিকতা করেছেন অন্যভাবে। এখানে চাঁদ পয়সা পেয়েছে মাছের বদলে। মাছগুলি সব সাপ হয়ে গেছে এবং হাঁড়ি ভর্তি সাপ এনে চাঁদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সকলে তাকে প্রহার করেছে। কিন্তু চাঁদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে হাঁড়ি ভর্তি সাপ নিয়ে এত অপমানের পরেও নৃত্য আরম্ভ করেছে আর বলেছে—

চান্দো বোলে মোর কপালে আছে ভাল।
জাহারে চাহিয়া বেড়াই তার পাইলাম নাগাল॥

চাঁদের মনসা-বিদ্বেষ তুঙ্গে। দেশে ফিরেই ঘোষণা করেছে—

নাগ পাইলে যে য়েড়ে হাত পাও কাটীম তারে
মারিলে দিমু পঞ্চতোলা সোনা॥

বস্তুতঃ চাঁদের বর্ণনায় বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গীয় জনমনে বণিকজাতির প্রতি যে তীব্র বিদ্বেষ ছিল, তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তার যথোচিত নিগ্রহের মধ্য দিয়ে জন-মনোরঞ্জন করেছেন।

একটি অভৌগোলিক এবং কাল্পনিক ভিত্তির ওপর চাঁদের বাণিজ্যপালার রঙ্গরস-জমানোর চেষ্টা বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেবের রচনায় মেলে। প্রথমতঃ সিংহলে নারিকেল জন্মে না এবং দ্বিতীয়তঃ সিংহলের জনগণ ও রাজা অত্যন্ত নির্বোধ—এই দুটি ধারণার সৃষ্টি

করে অত্যন্ত লোভী, স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠুর ও অভিনেতা রূপে কবিরা চাঁদকে বাণিজ্য-পালায় হাজির করেছেন। একমাত্র কেতকাদাসের রচনা ছাড়া প্রথমদিকের সব মনসাকাব্যেই এই বাণিজ্যপালা আছে। বণিক চাঁদ ঐতিহ্যগতভাবে মনসাকাহিনীতে স্থান পেয়ে আসছে বাঙালীর সমুদ্রবাণিজ্যে রমরমার দিন থেকে। সেন-যুগ থেকে বাণিজ্য ব্যাপারটি জনশ্রুতিতে দাঁড়িয়ে যায়। মুসলমান যুগে নতুন করে সমুদ্রবাণিজ্য শুরু হয়েছে, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাসের সপ্তগ্রাম বর্ণনাতেই বোঝা যায়, এই বাণিজ্যকেন্দ্রটি আর বাণিজ্য নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত নয়—অন্ততঃ কবি তার উল্লেখমাত্র করেন নাই।

মনসাকাহিনীতে চাঁদকে বাণিজ্য করতে যেতেই হত ছটি ছেলের মৃত্যুতে শোকার্তা পত্নীর দৃষ্টি থেকে সরে যাবার জন্য এবং প্রজা, আত্মীয়স্বজন সকলের উপহাসপূর্ণ দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য।

বছরের অনেকখানি জুড়ে জলবেষ্টিত পূর্ববাংলার মানুষজনের ওপর পণ্যসরবরাহকারী বণিকদের নির্বিচার অত্যাচার চলতো। ফলে বণিকজাতির ওপর জনগণের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষকেই তুষ্ট করার জন্য বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেবের রচনায় তাদের কুমনোভাবজাত কুকীর্তিকে কবিরা এত উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন এবং সমুদ্রে তার সমূহ সর্বনাশকে বিধাতার ন্যায়বিচার মনে করে আসরের শ্রোতারা বিশেষ হৃষ্ট হয়েছে এবং কবিদেব সাধুবাদ দিয়েছে।

এই পালাব বর্ণনায় বিজয়গুপ্তে কৌতুকপ্রকাশের দিকটিই প্রবল। শুধু একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। নারিকেলের অবিশ্বাস্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখে সিংহল রাজার পাত্রেরা বলে উঠেছে—'বিষম বাঙ্গালী লোকে প্রকারে মারিতে তোকে—তার লাগি আনিছে বিষফল।'

বস্তুতঃ এখানে 'বাঙ্গালী'র স্থলে 'বণিক' হবে। লিপিকর-বা মুদ্রণ-প্রমাদে 'বণিক' 'বাঙ্গালী' হয়ে গেছে। সে সময়ে বাঙালীর জাতীয় বোধ জন্মায় নাই। কবি একটি বাক্যেই সমস্ত সম্প্রদায়টির চিত্র তুলে ধরেছেন।

নারায়ণ দেব কৌতুকের সঙ্গে ব্যঙ্গ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

যম-মনসালড়াই পালাটি সম্পূর্ণই জনমনোরঞ্জনে নিয়োজিত। বিপ্রদাস এমন একটি লড়াইয়ের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। অথচ সংস্কারাচ্ছন্ন মনে যমের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অকালমৃত্যু, আকস্মিক মৃত্যু প্রভৃতি যমেরই কারসাজি মনে করে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ যমের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। মনসার দ্বারা যমের লাঞ্ছনায় লৌকিক মানসে খানিকটা তৃপ্তির স্বাদ মেলে। তবে ঔপন্যাসিক দৃষ্টি সম্পন্ন কবি বিজয়গুপ্ত এই ফাঁকে যম ও যমদূতের সম্পর্কের মধ্যে জমিদারী সেরেস্তায় নিযুক্ত উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী ও মালিক-শ্রমিক কর্মকারীর অসদ্ভাবপূর্ণ মনোভাবটিকে তুলে ধরেছেন। রামায়ণীয় যুদ্ধের ভূমিকাটিও জনমনে আনন্দ দেবার জন্য।

বিজয়গুপ্ত যেখানে জাতপাতবিচার, আচার-সংস্কার প্রভৃতির সমাজজীবনে প্রাধান্য বর্ণনায় এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের রুচিস্বভাব রীতিনীতিকে ফুটিয়ে তোলায় বিশেষ

কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, নারায়ণ দেব সেখানে সর্বশ্রেণীর মানুষের কথাই তুলে ধরেছেন। তবে রচনায় আচার সংস্কারের বর্ণনা অপেক্ষা স্মৃতিশাসিত সমাজ জীবনের চিত্র ফোটানোতেই বেশি তৎপর ছিলেন। যমমনসার দ্বন্দ্বেই তার পরিচয় রয়েছে। মনসা পরাজিত ও বন্দী যমকে বললে—

পরমাঞী থাকিতে নর নেও কি কারণ ॥

যম অপরাধ অস্বীকার করেছে এবং পাপীদের সঙ্গে কথা বলে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে বলেছে। নেতার কথায় মনসা যমের কারাগারে এসে পাপীদের বললে—

নরকের মধ্যে পাপী পচ কি কারণ ॥

পাপীরা তাদের শাস্তির কারণ বলেছে—

কেহো বোলে পিতামাতার লঙ্ঘিয়াছি বাক।
তে কারণে চিরদিন ভুঞ্জিয়ে নরক ॥
কেহো বোলে বিপ্র নিন্দা করিয়াছি উপহাস।
সেহি পাপে হইয়াছে মোর নরকেতে বাস ॥
* * *
কেহো বোলে গুরুপত্নী লঙ্ঘিয়াছি ব্রাহ্মণী। ইত্যাদি।

শেষে নেতা বললে, "আপন দোষে মরে পাপী জমের দোষ নাঞী।" সুতরাং যমের মুক্তি মিললো।

ছয় ছেলের মৃত্যুর পর সনকা স্বামীকে 'বাপ' বলে ডাকতে থাকে। মনসা বুড়ী ব্রাহ্মণী যতী সেজে এসে দ্রৌপদীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝায়। দ্রৌপদী পাঁচ ছেলের মৃত্যুর জন্য স্বামীদের দায়ী করে নাই। সুতরাং সনকা অনুতপ্ত হল এবং স্বামীকে অন্তঃপুরে আহ্বান করলে। তখন চাঁদকে প্রায়শ্চিত্ত করে ঘরে ঢুকতে হয়।

নারায়ণ দেবে বণিকবিদ্বেষ প্রচণ্ডরূপ নিয়েছে। চাঁদের নৌকা ডোবানোর আগে নৌকায় পাহারারত, চণ্ডীকে দেখে মনসা বলেছে—

জত জাতির মৈধ্যে বানিয়া অধম জাতি।
লাজ লজ্জা দয়া ধর্ম নাহি এক রতি ॥
আচুক আমার কার্য হরে মিত্রের ধন।
মায়ের কাণের সোনার দিগে সদায় করে মন ॥

মনসার কাছে চাঁদকে নত করার জন্য তার উত্তেজিত শ্বশুর বলেছে—

দেবগুরু ব্রাহ্মণ আর মাতাপিতা।
বনিয়ার ঠাঁই নাহি এতেক মান্যতা ॥
কাক হস্তে সেখান জে বানিয়া ছাওয়াল।
বানিয়া হস্তে ধুত্তজেই তারে দেই পান ॥

চাঁদের শ্বশুর কি বণিকসম্প্রদায়ের ছিল না? অন্যান্য উক্তি থেকে তাকে বামুন বলে মনে হয়।

নারায়ণ দেবের চাঁদের কাছে মালি বেহুলার ভেলা তৈরীর জন্য কলাগাছ কাটার অনুমতি নিয়ে এল। চাঁদের জবাব—

চান্দো বোলে এক দুঃখ মৈল সাত বেটা।
তাহা হইতে অধিক দুঃখ কলা জাইব কাটা॥
এক ২ ছড়ি বেচিব দস ২ বুড়ি।
কিসের কারণ নষ্ট করিব এতগুলা কড়ি॥

এ চাঁদের সঙ্গে Shylook-এর কোন পার্থক্য আছে কি? অবশ্য নারায়ণদেব ব্রাহ্মণদেরও ছাড়েন নাই। তীরের কাছে কাঁকাল জলে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ চাঁদ স্নানরত এক ব্রাহ্মণের কাছে একটু বস্ত্রখণ্ড চাইলে। কবির উক্তি—

ব্রহ্ম দ্বিজে শুনিয়া চান্দোর বচন।
ভাঙ্গা গামছার অর্ধেক দিল ততক্ষণ॥
জথাতথা ব্রাহ্মণ না হয় তবে দানী।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দিল কড়াটেকের কানী॥

সাত

'নারীগণের পতিনিন্দা' শীর্ষক একটি আলোচনা প্রতি মঙ্গলকাব্যেই থাকে। সমাজে নানাভাবে অবহেলিত মেয়েদের দুঃখকষ্টের বর্ণনাই এই রচনাগুলির লক্ষ্য। বিপ্রদাস এই বর্ণনায় ব্রাহ্মণ্যসংস্কার ও বিশেষ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। একজন পতিব্রতা বলেছে—

ললাটে লিখন ছিল সেই বর সার হইল
ভাবিলে চিন্তিলে কিবা হয়।

কিংবা পিতামাতার প্রতি অভিযোগ করেছে—

শিশুকালে বিভা হইল কেনি
আমি হেন-রূপ হই বিবাহে কুরূপ পাই
চক্ষু খাইল জনকজননী।

বৃদ্ধারা শুধু 'মৃতাবত যৌবনের শোকে।'

কিন্তু মনোরঞ্জনের কবি বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেবের কাব্যে এই বিষয়টি বিশেষ বৈচিত্র্যলাভ করেছে। বিজয়গুপ্ত নারীদের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণের পরিবর্তে কুরূপা রমণীদের লালসাচিত্র এঁকেছেন। এতে অবশ্যই আসরের পুরুষ শ্রোতারা খুশি হয়েছে। কবি কিন্তু এই বর্ণনার দ্বারা স্থূল ও অশালীন কৌতুকরস সৃষ্টির সুযোগ নিয়েছেন। আবার এর দ্বারা নিম্নসমাজের মানসিকতাও ফুটে উঠেছে।

নারায়ণদেব একটু অন্য পথ নিয়েছেন। তিনি তৎকালীন সামাজিক বৈষম্যটি তুলে ধরেছেন। সাহেবেনের স্ত্রী উচ্চশ্রেণীর রমণীদের দাসী দিয়ে নিমন্ত্রণ করেছে এয়ো হবার জন্য। কিন্তু অনাহূত নিম্নশ্রেণীর মহিলারাই এসে ভীড় করেছে এবং বন্ধ দরজা ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাদের দেখে লখিন্দরের বিরক্তিটি ঢাকা থাকে নাই। প্রহরী যথারীতি লাঠির দ্বারা তাড়না করে তাদের আসর থেকে সরিয়েছে।

বিজয়গুপ্তের কুরূপা সুন্দরীদের একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

আর এক আইয়া আইল তাহার নাম রই।
সকল মাথায় আছে তাহার চুল গাছ দুই॥
আর এক আইয় আইল তাহার নাম সরু।
গোয়াইল ঘরে ধুয়া দিতে খোপা খাইল গরু॥ প্রভৃতি

এইসব রমণীদের কিছু কিছু কামনা—

মাগিয়া খাইতে আমি লখাইর দেশে যাই॥
মাগিয়া খাই যদি তবু মোর সুখ।
অনুক্ষণ দেখিব আমি লখাইর চন্দ্রমুখ॥ ইত্যাদি

পূর্ববঙ্গের কবিদের দাম্পত্যকলহ বর্ণনায়, জাতপাত আচার সংস্কারের প্রকাশে, আহার্য বর্ণনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় মেলে। সপত্নীকলহ বর্ণনায় বিজয়গুপ্ত বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। গঙ্গার সম্বন্ধে চণ্ডীর মন্তব্যগুলি পুরাণ কাহিনীর প্রয়োজনানুরূপ প্রয়োগের অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

বলে ভাল জানি জনা যাহার যত সতীপণা
তাহাও মুই জানি ভাল মতে।
আনিতে ভগীরথে ঠেকিলা পর্বত পথে
শৃঙ্গার মাগিলা ঐরাবতে॥
লোকমুখে হেন শুনি পথে পেয়ে জহ্নুমুনি
গণ্ডুষে তুলিয়া করে পান।
তুষিয়া কাকুতি মতে বাহির হইলা কর্ণপথে
তবু তোর নাহি অপমান॥
মলমূত্র যত ছার অপবিত্র যত আর
নরকে পূর্ণিত তোর নীর।
অশেষ পাতক করে সেই তোমার জলে মরে
তবু তোমার নির্মল শরীর॥

উত্তরে গঙ্গা—

গঙ্গা বলে চণ্ডী রহ বড় কথা কত কহ
উচিত কহিতে লাগে দ্বন্দ্ব।
যাহার তাহার ঘরে যাও মৎস্য মাংস বলি খাও
সেও কি আরেরে বলে মন্দ॥
তুমি কিনা জান এবে অসুরে শঙ্কর সেবে
তাহারে বর দিলা পশুপতি।
অসুরে যাহারে ছোঁয় করে সে জন তখনি মরে
সেও তোর মাগিল সুরতি॥

পৌরাণিক ধর্মের শৈথিল্যের যুগে পৌরাণিক কাহিনীর এ জাতীয় ব্যাখ্যায় জনচিত্ত অবশ্যই খুব হৃষ্ট হয়েছে। বিপ্রদাসে এ জাতীয় চিত্রের কথা ভাবা যায় না। নারায়ণদেব কিন্তু এভাবে জীবনের ব্যাখ্যা দেন নাই। তিনি জীবনের বিশেষ গভীরে প্রবেশ করেছেন। তিনি পুরাণের দৃষ্টান্তে শিক্ষা দিয়াছেন, স্মৃতি মতে শাসন করেছেন। সমাজের সবদিকের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মনসাকাহিনীর পুরানো ঘটনাগুলিকে নতুনভাবে তুলে ধরে কাহিনীতে গতিসঞ্চার করেছেন।

মনসাকাব্যে দেবখণ্ডটির বর্ণনায় বিপ্রদাস প্রাচীন সংস্কারের আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে দৈত্যদ্বয় যজ্ঞ ও সিদ্ধাযজ্ঞের বর্ণনার পর গঙ্গার দ্বারা শিবের ধর্মের কৃপালাভ হয়েছে। গঙ্গাও শান্তনু ঋষির পত্নীত্ব ছেড়ে শিবের পত্নী হয়েছে। সমাজবন্ধনহীন আদিম সমাজ-জীবনের চিত্র ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। পৌরাণিক নানা বিকৃতি, দেবতাদের চারিত্রিক অসংযম প্রভৃতির বর্ণনার পর হরপার্বতীর দাম্পত্যকাহিনী এসেছে। কিন্তু সেখানে কোন জটিলতা নাই। ডোমনিবেশী স্ত্রীর সঙ্গে শিবের ও কুশলি রূপী শিবের সঙ্গে চণ্ডীর দুবার দৈহিক মিলন হয়ে গেছে। সামাজিক বন্ধনের শৈথিল্যচিত্রই এখানে পরিস্ফুট। তবে এই জাতীয় যথেচ্ছাচার কিন্তু মানবকাহিনীর বর্ণনায় নাই। একমাত্র স্ত্রীর সাহায্যে শালিকারূপিনী মনসাকে চাঁদ শয্যাগৃহে আনিয়েছে—এই চিত্রটি ছাড়া সর্বত্রই সংযত ব্রাহ্মণ্যসংস্কার ও সরল কবিচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে। বিপ্রদাসের কাব্যে সমাজের নানাচিত্র আছে, কিন্তু সমাজের জীবনচিত্র নাই। বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেবে এই জীবনচিত্র বলিষ্ঠরূপ গ্রহণ করেছে।

জনমনোরঞ্জনের বাসনার জন্যই দেবখণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে মানবরূপ পেয়েছে পূর্ববঙ্গীয় কাব্যে। মর্তের মানুষের রূপ সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার স্বাধীনতা তখন কবিদের ছিল না। শ্রীচৈতন্যজীবনী তাই অলৌকিকতায় পূর্ণ। হরপার্বতী কাহিনী তাই সাধারণ দাম্পত্য কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। নিষ্কর্মা, বহু বিবাহের নায়ক, নেশাখোর, পরনারী-লোলুপ, সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অমনোযোগী শিবচরিত্রটি তৎকালীন কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রতিরূপ মাত্র। সপত্নী সংকন্যা পরিবৃত সংসারের সব দায়িত্ব পার্বতীর, যেহেতু সে সন্তানের

জননী। নারদের কৌশলে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে লুকোচুরি খেলা শুরু হল। ডোমনীবেশিনী স্ত্রীর রূপমোহে যখন শিব সর্বত্যাগে ইচ্ছুক, তখন ডোমনী একটি শর্ত রেখেছে। শিব যদি তার হাতের রান্না খায়, তবেই সে তার ভালবাসাকে খাঁটি বলে মেনে নেবে। নিম্নশ্রেণীর রমণীর সহবাসে দোষ হয় না, কিন্তু হাতের রান্না খেলে আর রক্ষা নাই। এই জাতীয় জাতপাত বিচারের প্রসঙ্গ নারায়ণদেবেও লক্ষ্য করা যায়। বিপ্রদাসে ডোমনী-মিলনে এ জাতীয় প্রশ্ন ওঠে নাই।

নৌকাডুবির পর দেশে ফেরার পথে বিজয়গুপ্তের চাঁদ পেটের জ্বালায় কলার বাকল খেতে গেছে, কিন্তু মনসা বাধা দিয়েছে। তার শুচিতা বজায় রাখার জন্য তাকে কুড়োনো বা উচ্ছিষ্ট জিনিস খেতে দেয় নাই। নারায়ণদেবেও সেই একই চিত্র। অথচ বিপ্রদাসে মনসাই চাঁদকে মড়ার ত্যক্ত বস্ত্র পরে লজ্জা নিবারণ করতে বলেছে এবং কলার চোপা খেয়ে প্রাণ রক্ষার পরামর্শ দিয়েছে।

> প্রাণ রক্ষিবারে সন্তে সব ভক্ষ ভক্ষে
> খাও কুড়াইয়া চোপা কে তোমারে দেখে।
> শ্রীবৎস নৃপতি চিন্তাদেবী তার রাণি
> দৈবকোষে কাষ্ঠ বেচি খাইল অবনি। ইত্যাদি

বিজয়গুপ্তের কাব্যে দেশাচার লোকাচার, নানাবিধ সংস্কারের পরিচয় বেশি। নারায়ণদেবে এই জাতীয় আচার-সংস্কারের পরিচয় কম, কিন্তু জাতপাতবিচার এবং সমাজের ওপর স্মৃতির শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ছিলেন।

বিজয়গুপ্তে জামাতা লখিন্দরকে বরণের সময় বেহুলাজননী সুমিত্রা বলেছে— "বিয়ার দিনে জামাই ছুঁইলে দোষ নাই।" সম্ভবতঃ তখনকার দিনে অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ হত, অথচ পুরুষদের ক্ষেত্রে বয়সের বাছবিচার ছিল না বলেই এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞা।

লখিন্দরকে মানগাছ, মামাভায়ের লাঙ্গলচষা প্রভৃতি নানা সংস্কারমূলক দৃশ্যের মাঝে দিয়ে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করতে হয়েছে আর বেহুলা বিবাহসভায় প্রশংসা পেয়েছে, কারণ—

> বেহুলা সকল জানে সাতবার সাবধানে
> লখীন্দরে করে প্রদক্ষিণ॥

নারায়ণদেবে এস্থলে শুধু স্বামীবশীকরণের নারীসংস্কারের উল্লেখ আছে।

কিন্তু বিপ্রদাসে রীতিমত বলবিক্রম প্রকাশ করে লখিন্দরকে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করতে হয়েছে। 'দুর্জয় ঘন্টা' ও 'লৌহ গাড়র' ভঙ্গ করে লখিন্দরকে যে বীর্যের পরিচয় দিতে হয়েছে, তাতে প্রাচীনকালের বিবাহরীতির ছাপ আছে। এখানে স্ত্রীআচার এককথায়— "নিজধর্ম স্ত্রী আচার করে কুতুহলে।"

বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেবে আচারপ্রাধান্যের চূড়ান্ত ঘটেছে মনসাকাব্যের পরিণতিতে। বেহুলা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে অসাধ্য সাধন করেছে। মৃত সন্তান, আত্মীয়স্বজন, লুপ্ত ধনরত্ন সব ফিরিয়ে এনেছে। শেষ পর্যন্ত বিজয়গুপ্তের চাঁদ ও নারায়ণদেবের চাঁদ মনসার কাছে নতিস্বীকার করেছে। কিন্তু তারপর রীতিমত আনন্দবিহ্বল বিজয়গুপ্তের চাঁদের আহারের নিমন্ত্রণ জ্ঞাতিরা প্রত্যাখ্যান করেছে। ছমাস একাকিনী বেহুলা ঘুরেছে, সুতরাং তার সতীত্বের পরীক্ষা চাই। শেষ পর্যন্ত চাঁদ বেহুলার পরীক্ষা নিতে রাজি হল। বেহুলার কিন্তু তখন সময় নাই। স্বর্গের রথ বেহুলা-লখিন্দরকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেল। কৌতুক-রসের কবি সমাজকে ব্যঙ্গ করে কাব্য শেষ করলেন।

এবিষয়ে নারায়ণদেব আরও কড়া। এখানে চাঁদ নিজেই বেহুলাকে পরীক্ষা দিতে বললে। মনসার সাহায্যে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। কিন্তু শেষের তুলাদণ্ডের পরীক্ষাটির সময়—

নমিয়া পবিলা তোলা ভাসিয়া উঠিল বেউলা।
সতীকন্যা স্বর্গলোকে বোলে।

অর্থাৎ বেহুলা লখিন্দর স্বর্গে চলে গেল। সনকা তা দেখে প্রথমে মূর্ছিতা হল এবং মূর্ছাভঙ্গের পর স্বামীকে বললে—

তুববুদ্ধি হইল সাধু পাতিলে জঞ্জাল।
কাকের বাসাতে কুকিল থাকে কতকাল॥
মুনিস মেলস জাতি উপকার নাই।
এহা জানি অন্তরিক্ষ হইল লখাই॥

পূর্ববঙ্গীয় কবি বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেবের রচনায় বেহুলার অসাধ্যসাধনের কাজ সংস্কারান্ধতার যূপকাষ্ঠে পুরস্কৃত না হয়ে লাঞ্ছিত হল। সংস্কার গোড়ামীর পদতলে মানবত্ব কিভাবে গুড়িয়ে যায়, সোনাইর কথায় তাই ধ্বনিত হয়েছে। তবে নারায়ণদেবের রচনায় এই গোড়ামীচিত্র অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে প্রকাশিত।

এই প্রসঙ্গে "হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ" নামক গ্রন্থে ক্ষিতিমোহন সেনের একটি মন্তব্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।—"বাংলাদেশে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের শাসন চলে।·····বাচস্পতি (মিশ্রের ১৪৪০-৮০ খৃঃ) মত মিথিলায় প্রামাণ্য।······শ্রীহট্টে রঘুনন্দনের প্রভাব নাই, সেখানে চলে বাচস্পতি মিশ্র।··· ···সেখানে রঘুনন্দনের প্রভাব নাই। মিথিলাদি দেশের মতোই এই শ্রীহট্ট, উত্তর ময়মনসিংহ, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণেরা খুব প্রাচীন প্রথার ভক্ত। বাংলায় অন্যত্র ব্রাহ্মণেরা এতটা প্রাচীনপন্থী নহেন। এইসব প্রদেশেই ব্রাহ্মণেতর বহু হিন্দু জাতি প্রাচীনকালে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া বেশী করিয়া ধর্মান্তরগ্রহণ করিয়াছিল।"

পূর্ববঙ্গীয় কবিদের জাতপাতগোড়ামীর কারণ বোঝা গেল। পশ্চিমবঙ্গে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের প্রভাব অনুভূত হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে, আর বাচস্পতির প্রভাব

এ অঞ্চলে পড়ে নাই। তাই বিপ্রদাসের কাব্য সবরকম গোড়ামীমুক্ত, খাঁটি লৌকিক দেবতার মহিমাজ্ঞাপক কাব্য।

লৌকিক দেবতা নিয়ে কারবার করেছেন বলেই বিপ্রদাস লৌকিক দেবীকে প্রকৃত মর্তভূমিতে স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। মনসাকে বনবাসে দেওয়া হয়েছে সিজুয়া পর্বতে। তারপর বিশ্বকর্মাকে ডেকে মনসা পুরী নির্মাণ করালেন।
পুরী নির্মাণের পর—

নির্মাইয়া পুরী বিশাই, গেল নিজস্থান
পাষণ্ডির দেশে বিশাই নিয়োজিল বাণ।
রাজ্য ছাড়ি প্রজা জত আইল তুরিতে
বসিল পদ্মার পুরে সিজুয়া-পর্বতে॥

এরপর জনবসতির বর্ণনা—

প্রথমে ব্রাহ্মণ বৈসে জানে শাস্ত্রনীত
ক্ষেত্রি বৈশ্য বৈদ্য বৈসে কাএস্থ হরষিত।
ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার
পঞ্চ বণিক বৈসে আর কর্মকার।
বাস্থ পুবক কলু কুশলি কাঠুর্‍্যা
শাঁখারি কাসারি বৈসে তামলি সেকরা।
তাতি জুগী মালাকার রজক নাপিত
ছুতার গাড়ার বৈসে হয়া হরষিত।
ধীবর তিয়র মালা বৈসে নদীকূলে
হরিষে ছত্রিশ জাতি বৈসে কুতুহলে।

প্রাচীন গ্রামীন কাঠামো গোবর্দ্ধনাচার্যের (দ্বাদশ শতাব্দী) 'আর্যাসপ্তশতী'তে যেমন-ভাবে পাওয়া যায় এখানেও সংক্ষেপে তাই বিধৃত। একগ্রাম বা জনপদ প্রাকৃতিক কারণে বা শাসক অত্যাচারে ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি স্থাপনের উল্লেখও 'আর্যাসপ্তশতী'তে আছে। বিপ্রদাস যেমন মনসা-ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তেমনি সমসাময়িক জীবনের পরিচয় দানের ক্ষেত্রেও প্রাচীনধারারই অনুবর্তন করেছেন। অন্ততঃ এটুকু সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তথাকথিত অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে বাংলার গ্রামীন কাঠামো বিপর্যস্ত হয় নাই। মুকুন্দবর্ণিত গুজরাট বর্ণনার পূর্বরূপ বিপ্রদাসে মিলছে।

হাসনকাহিনীতে বিপ্রদাস মুসলিম জনজীবনেরই পরিচয় দিয়েছেন। লখিন্দরের বিদ্যার্জন বর্ণনায় বাঙ্গালো শিক্ষাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সপ্তগ্রামের বর্ণনায়, সমুদ্র-যাত্রাকালে নদী তীরবর্তী স্থান নামের উল্লেখ. প্রভৃতিতে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান মেলে। অনেকে 'কলিকাতা' এবং আরও দু-একটি নামকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

আবুলফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র সাক্ষ্য এবং কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যপ্রমাণে কলিকাতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নাই। সপ্তগ্রামের বর্ণনায় হিন্দুমুসলমানের মিলিত সুখী জীবনধারার পরিচয় আছে, ব্যবসাবাণিজ্যের উল্লেখ নাই। মনে হয়, মুসলমান আমলে নতুন করে জলপথে তখনও বাণিজ্য গড়ে ওঠে নাই।

বিপ্রদাস মুখ্যতঃ বর্ণনাধর্মী কবি। লোকমনোরঞ্জনের কোন কৌশল তিনি অবলম্বন করেন নাই, একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এই কারণেই ঐতিহাসিক উপকরণগুলি তাঁর রচনায় যথাযথ রক্ষিত হতে পেরেছে। তিনি রচনায় শিল্পকৌশল প্রয়োগ না করলেও তাঁর স্বভাব কবিত্বের পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

হাসান কাজির কাহিনীতে এই সহজ কবিমনের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। চাঁদের ছেলেদের মৃত্যু ঘটানোর জন্য প্রথমে ঢোড়াসাপ প্রেরিত হয়। আষাঢ়মাসের জলধারায় প্লাবিত মাঠঘাট দেখে এবং ভেকের ডাক শুনে সে রথ থেকে নেমে পড়ে। তারপর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ও ব্যাঙ খেতে খেতে দোহাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল এবং মাছ খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করে ঘুমিয়ে পড়লো।

বেলা দ্বিপ্রহরে কিষাণেরা ছুটে এল মাছ সংগ্রহ করতে। দোহাড়ি তুলতেই সাপের ঘুম ভেঙে যায় এবং ফোঁসফোঁসানি শুরু হয়। তারা ভয়ে দোহাড়ি ফেলে দিলে। সবাই যখন দোহাড়ি সমেত সাপকে ঠেঙিয়ে মারতে চাইলে, তখন—

জাহার দোহাড়ি সে ভাবে মনে মনে
নতুন দোহাড়ি মোর ভাঙ্গিব কেমনে।

সুতরাং কৃষাণটি দোহাড়ির বাঁধন খুলে ঠেঙ্গা হাতে দাঁড়িয়ে রইল, সাপ বেরুলেই মারবে বলে। সাপ কান্নাকাটি করতে থাকে।

এদিকে— অরুণ পূর্ণিত বেলি তৃতীয় প্রহর
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সব হইল ফাফর।
ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সব বেলি পানে চায়
দোহাড়ি হইতে ধোড়া বাহিরে পালায়।

একটি স্বাভাবিক গ্রাম্য কৃষিচিত্র এবং দরিদ্র কৃষকের মানসিকতা অতি সহজে ফুটে উঠেছে।

বিপ্রদাসের বর্ণনায় চাঁদের গৃহে ফেরার পথের বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবি এই পথের ভৌগলিক চিত্র দিয়েছেন। বর্ণনায় ঐতিহাসিকতার ছাপও মেলে।

কালিদহে ডুবিল চাঁদের মধুকর
আসিয়া বারুইপুরে উঠে নৃপবর।
তথা কুমারের ঘরে বেচে কাষ্ঠবোঝা
চৌতলেতে চোপা কুড়াইল চাঁদোরাজা।
পক্ষ ব্যাধ সঙ্গে দেখা সেই নদীতটে
দৈত্য সনে দরশন হইল কালীঘাটে।

মাহেশে দেখিল চাঁদো পুত্রের দাহন
দিগঙ্গে দেখিল রাজা নগর-পোড়ন।
হুগুলি রাখিল গরু ব্রাহ্মণ-আশ্রমে
ত্রিবেণী দেখিল দরবেশ পঞ্চজনে।

ফেরার পথের একটি সুনির্দিষ্ট চিত্র কবি দিয়েছেন, যা আর কোথাও মেলে না। বর্ণিত অবস্থাগুলি সবই বাস্তবসম্মত। মূল ঘটনাগুলি যেমন কাঠ ও মাছ বিক্রি করে অর্থোপার্জন, চোপা খাওয়া, মাঠে ধান্য নিড়োনো অর্থাৎ ঘাস বাছা, চন্দ্রকেতুগৃহে আশ্রয় গ্রহণ তিনটি গ্রন্থেই আছে। বিজয়গুপ্ত আরও নানা ঘটনা সৃষ্টি করে পর্বটিকে বিচিত্রতর করেছেন, কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছেন এবং সাধারণ ঘটনাগুলিরও ভিন্নতর কৌতুকপূর্ণ রূপ দিয়েছেন। চাঁদের গোঁফ দাড়ি কামানোর চেষ্টা ও একটি বিকৃত চেহারার মহিলার সঙ্গে চাঁদের বিবাহ দেওয়ার প্রয়াস সব কৌতুকপূর্ণ চিত্র। চাঁদের খাওয়ার সময় সাপেদের ষড়যন্ত্র চিত্রটি বিশেষ কৌতুকাবহ।

নারায়ণদেবে ঘটনার বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি তবে কৌতুকরস সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য নয়—সমাজের ব্যাপকতর পরিচয়দানের সঙ্গে সঙ্গে মানবরসের প্রকাশও এখানে মেলে। নারায়ণদেব চৌর্যাপরাধে চাঁদকে শূলে চড়িয়েছেন আবার চাঁদকে দিয়ে মনসারই বিবাহের ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। মনসা যতি সেজে চাঁদের কাছে এসে তাকে বাড়ি ফেরার পথ বলে দিয়েছে। যৌবনে যোগিনী দেখে চাঁদ তার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তার গাঁয়ের এক যুগীর পুত্রের সঙ্গে। এই গ্রাম্য 'যুগী' সম্প্রদায়ের বিবাহ তথা তৎকালীন গ্রামাঞ্চলের বিবাহপদ্ধতির একটি তথ্যচিত্র এখানে মেলে।

আমার দেশেতে আইস সাঙ্গা দিব তরে॥
কঠিয়া যুগির পুত্র নাম তার ধিতা।
তার ঘরে চারি বউ অতি সুচরিতা॥
তার ঠাঁই সাঙ্গা পুনি হইব তোমার।
আমি ঘরেত হনে দিব সকল অলঙ্কার॥
পিত্তলের ভেটা দিমু পিত্তলের উঞ্চটী।
পিত্তলের হার দিমু পিত্তলের কাটী॥
রাঙ্গা করিয়া দিমু হাতের চুড়ি।
আপন সুখে পরিবাজে দুই হাত ভরি॥
চুল প্রাচড়িতে তরে দিমু ত মচকা।
নলি ভরিতে দিমু উত্তম চরকা॥

লক্ষিপুরের কাছে সাগর থেকে ওঠার উল্লেখ নারায়ণদেবে আছে। তাছাড়া শ্রীপুরনগর, কেদাররমাণিক রাজা প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

নারায়ণদেব রক্ষণশীল স্মৃতিশাসিত সমাজের পক্ষপাতী অথচ তাঁর বাস্তবদৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত। মাঝেমাঝে দৃষ্টিতে রূঢ়বাস্তবতার ছাপও মেলে অর্থাৎ সত্য কথাকে অকপটে স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল। এতে তাঁর শিল্পীমন ক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিন্তু তৎকালীন জীবনচিত্রটি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

উঁচু ঘরের বিবাহে যৌতুক আদানপ্রদানের বাড়াবাড়ি লখিন্দরের বিবাহে দেখা গেল। বেহুলার মা জামাইকে জমি ও অন্যান্য সম্পদ এত বেশী পরিমাণে দেওয়ার পক্ষপাতী, যাতে জামাইকে ভবিষ্যতে কোনদিন অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিপদসঙ্কুল বাণিজ্যযাত্রা না করতে হয়। দাম্ভিক চাঁদ এই বিপুল দানকে উপহাস করেছে।

বড়ঘরের বাসরবর্ণনা করে তৎকালীন ধনীগৃহের অন্তঃপুরে অবাধ ব্যভিচারিতার চিত্রটা তুলে ধরেছেন। বেহুলার বড় ভ্রাতৃবধূ তাড়কাসুন্দরী বেহুলাকে নিয়ে বাসরে ঢুকেই—

বিপুলারে নিঞা লখাইব বামপাশে থুইয়া।
অঙ্গের বসনখানি ফেলাইল খসাইয়া॥
হাত বাড়ায় তারে কোরে ধরিবারে।
চুলাচুলি করে তারা নারী সকলে॥
কাহার খসিল কেস কাহার বসন।
বিবসন হইয়া রহে জত নারীগণ॥
গুরুগর্বিত করিয়া কাহাকে না মানে।
একজনের কাপড় ধরি তিনজনে টানে॥
আস্তেবেস্তে উঠিয়া কেহ বুকে মারে চড়।
অন্তরে রহে কেহ নাহিক কাপড়॥
মহাঅষ্টমী দিন মদনধামালি।
কৃষ্ণসনে খেলা জেন খেলে গোপনারী॥

এরপরে লখিন্দরের মন উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং পরে একাকী বেহুলাকে পেয়ে লখিন্দর সংযমের বেড়া কিছুটা অতিক্রম করে ফেলে স্বাভাবিকভাবেই। কবি অস্বাভাবিকভাবে বেহুলাকে দিয়ে লৌহবাসরে রান্না না করিয়ে দইচিড়ের খাদ্য বরাদ্দ করেছেন।

লখিন্দরের জন্মের আগে সনকার সঙ্গে চাঁদের মিলন ঘটানোর কাজে চাঁদের ছয় পুত্রবধূই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে। শাশুড়ী কিছুতেই সজ্জিত হবে না, পুত্রশোক প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বধূরা তখন বুঝিয়ে কার্যোদ্ধার করেছে।

ধরিয়া সোনাঞীর চরণ কান্দে যত বধুগণ
শুন বাউলাইন আমার বচন।
আমরা বড় অভাগিনী না দেখিলাম পুত্রখানি
দেওর হইলে করিব পালন।

বেদপুরাণে বলে লতাসিদ্ধি রক্ষা পাইলে
যশমহিমা রহে ভুবনে।
পিতৃলোকের পিণ্ড আশা জলপানির প্রত্যাশা
ইহা পরে কি বুলিব আর ॥
বৃদ্ধ শ্বশুর অভাবে দাঁড়াইব কার আগে
রই হেন আর নাই স্থান।
দেওরখানি হয় সবে পালন করিব তবে
অন্তকালে করিব পিণ্ডিদান ॥

তাদের আবেদনে সনকা সাড়া না দিয়ে পারে নাই।

আট

বিজয়গুপ্ত প্রবাদপ্রবচন তুল্য বাক্যের ছড়াছড়ি, বিদগ্ধ কবিমনটি এই বাক্য ব্যবহারের অন্তরালে কাজ করেছে। কিন্তু পুরাণের ব্যবহার কাব্যে খুব কম। কবি মানবজীবনশিল্পী, জীবনকে তার খেয়ালে চলতে দিয়েছেন, চিত্রগুলি শুধু তুলে ধরেছেন।

নারায়ণদেবে বাগবৈদগ্ধ্য-ও কবিত্ব ভরা ভাষার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বিপ্রদাস ও নারায়ণদেবে পুরাণের বিচিত্র ব্যবহারের পরিচয় মেলে। তবে কবিদের পঠিত পুরাণ কাহিনী এই পুরাণ ব্যবহারের মূলে নাই। কবিরা মনসাকাব্যকে সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থ করতে চান নাই, করা সম্ভবও নয়। লৌকিক দেবতার আখ্যানের প্রথম অলিখিতরূপ দেওয়ার সময় পুরাণ অভিজ্ঞ কবিরা যদি সংস্কৃত পুরাণের কাহিনী কাঠামোটি নিয়ে থাকেন তাহলে খুব অন্যায় হয় নাই। বস্তুতঃ সংস্কৃত মূল পুরাণের সঙ্গে লৌকিকধর্মের কাব্যগুলির সম্পর্ক ঐ পর্যন্ত। ব্রাহ্মণ্যধর্মের কবিরা মুখে মুখে চলে আসা লৌকিক দেবতাদের পূজকদের কাহিনীকে যথাযথ ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। পুরাণ অনুসরণ করলে হরপার্বতীর মৃত্যু ঘটতো না কিংবা শিবকন্যা মনসার সঙ্গে জরুৎকারুমুনির বিবাহ হত না। অথচ পুরাণের দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায় বিপ্রদাস নারায়ণদেবের কাব্যে।

বাংলার পুরাণ পাঠের ঐতিহ্য বহুদিনের। বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগে রীতিমত পুরাণের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরের আবিষ্কারের পর স্বচ্ছন্দে বলা যায়, পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হিসেবে আপামর হিন্দুসাধারণকে গ্রাস করে রেখেছে বহুকাল ধরে। প্রথম দিকের মুসলমান আক্রমণের বিপর্যয়ে উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা অসহায় হয়ে পড়লেও পুরাণের শিকড় তখন জনমনে গাঁথা হয়ে আছে। এ পুরাণ পরিচয় যথাযথ নয়। মিশ্রণ, বিকৃতি, আংশিকত্ব, নতুন সৃষ্টি সবই বিপ্রদাস, নারায়ণদেবের কাব্যের মধ্যে অনুসন্ধান করলে মেলে। বিপ্রদাসে দন্তবোড় মুনির দৃষ্টান্তটি এমনি এক অভিনব সৃষ্টি। বিপ্রদাসের রচনাতেই পুরাণজ্ঞতার পরিচয় সবচেয়ে বেশি। আবার

বিপ্রদাসে পুরাণ দেবতা ও মানুষ উভয়ের স্থলেই শিক্ষকতার ভূমিকা নিয়েছে। চাঁদের অপমান অসহ্য হয়ে পড়লে নেতা মনসাকে বুঝিয়েছে—

নেতো বলে বিষহরি গোকুল নগরে হরি
গোপ সঙ্গে শয়ন ভোজন
কংসরাজা বধিবারে কৈলা হেন ব্যবহারে
বিবেক করহ অকারণ।
আর দেখ অপরূপ রামচন্দ্র ব্রহ্মরূপ
মৈত্রতা বানরসংহতি
ভগবান মহারাজে সীতার উদ্ধার কাজে
হেন ব্যবহার কৈল তথি।

আবার শিব দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনে উদ্যত হলে ব্রহ্মা শিবকে উপদেশ দিয়েছে—

অতি লোভে ভাল নয় দেখ ত্রিভুবনে
অতি সতী নারী-সীতা হরিল রাবণে।
অতিতপে বলি রাজা গেল রসাতলে
অতিতপে মীননাথ কদলীতে ভোলে।

লৌকিক দেবতাকে পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টাটিতে উভয়ধর্মের (পৌরাণিক ও লৌকিক) পাশাপাশি অবস্থানকালে লৌকিকসমাজে পৌরাণিক দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একটি চেতনা ছিল, তাই বোঝা যায়। শিবকে উপদেশে কাজ হয় নাই, কারণ শিব তখন পৌরাণিক দেবতায় পরিণত।

তবে বিপ্রদাসের কাব্যে কবির ব্রাহ্মণ্য মানসিকতার প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। লৌকিক দেবীর ওপরে পৌরাণিক প্রভাব দেখিয়ে সেই মানসিকতাকেই চরিতার্থ করেছেন কিনা বলা যায় না।

নারায়ণদেবে দেবতাকে পৌরাণিক দৃষ্টান্তে বোঝানোর চেষ্টা নাই। অন্যত্র কোথাও এ চেষ্টা নাই। বিপ্রদাসের ব্রাহ্মণ্য মানসিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, চাঁদ মনসাকে দেবী বলে মানার পর তার পূজায় বসে প্রথমেই পূজা করেছে।

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা চাঁদকে পৌরাণিক দৃষ্টান্তেই বুঝিয়েছে চাঁদ রাজা বলে প্রচণ্ড ক্ষুধাতেও কলার চোপা খেতে রাজি নয়। তখন মনসা বুঝিয়েছে—

ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর প্রভু রাম অবতার
হরিল তাহার সীতা রাবণ দুর্বার।
শুন শুন বারতা অবুধ মহারাজ
চোপা কুড়াইয়া খাও মুখে নাহি লাজ।

নারায়ণদেবে মনসা যতি বামনি সেজে দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তে সনকাকে বোঝানোর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এটি মহাভারতীয় কাহিনী থেকে প্রয়োজনানুগ দৃষ্টান্ত তৈরী

করার একটি নমুনা। তখন জনমনে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদির অস্তিত্ব জীবন্ত রূপ বিরাজিত ছিল। তাছাড়া কবির বুদ্ধিমত্তাও লক্ষণীয়।

লখিন্দরের মৃত্যুর পর নারায়ণ দেবের গ্রন্থে সনকা চাঁদকে ধিক্কার জানাচ্ছে পুরাণের ভাষায়—

দেবগুরু ব্রাহ্মণ   যেবা করে লঙ্ঘন
দেখ লিখিয়াছে তার কথা।
হিরণক্ষ কুম্ভকর্ণ   ইন্দ্রজিত রাবণ
এহি দোষে দাহ হইল মাথা।

দৃষ্টান্তের পৌরাণিক যথাযথতা খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। তবে বিপ্রদাস মোটামুটি মূল বজায় রেখেছেন। কিন্তু নারায়ণ দেব একেবারে কিংবদন্তীর দরজায় হাজির। বেহুলা স্বর্গে লখিন্দরের দেহের কোন অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করলে মনসা বলেছে—

কামদেবের মুরারি তারে সে কেন ত্রিপুরারি
রাত্রিদিনে দেবে স্তুতি করে।
সিবে সেই না জিয়াইল তারে।
চণ্ডীর কথা জগতে প্রচুর চণ্ডী লৈক্ষে লৈক্ষে বধিলা অসুর
আর কথ করিস সংকর।
এক লখাইর লাগি এতেক তোলপার। প্রভৃতি

পৌরাণিক দেবতার প্রতি লৌকিক দেবতার ঈর্ষার ইঙ্গিত এখানে লক্ষণীয়।

মনসা কাহিনীর তলেতলে একটি সৎমা বা সৎমেয়ের বিবাদের কাহিনী বিরাজিত। বিপ্রদাসের রচনাতেই এই বিবাদের শুরু। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে শিবের কাছে চাঁদ বর পেয়েছে, আর তখনই চণ্ডী চাঁদকে বলেছে—

শুন শুন কারণ বচন নরবরে।
পদ্মাবতী দুষ্টমতি বড় দুরাচারী
সিজুয়া-শিখরে ঘর সদা মন্দকারী।
দেবপুর মাঝে তার বড় অপমান
না পূজিহ তারে কভু শুন সন্বিধান।

বিজয়গুপ্তে চণ্ডীর এ জাতীয় কোন নির্দেশ নাই, কিন্তু পরিশেষে চণ্ডীর নির্দেশেই চাঁদ মনসাকে দেবী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর নারায়ণ দেবে আত্মসমর্পণের পর চাঁদ মনসাকে বলেছে—

তোমার সনে কন্দল বাড়াইল পার্বতি।
তোমারে পূজিতে মাও হইল পাষণ্ডি।
মহাদেব শিষ্য আমি মাও পাগল।
আমি পাগলের হাতে তোলি দিল হেমতাল।

চণ্ডি বলে তোর ঘরে মনসা কেন বাস।
কালরূপ ধরি তোমার করিব সর্বনাশ ॥
হেমতাল দিআ মোরে পাটাইল গৌরি।
তান বলে আমি গিয়া ভাঙ্গিল ঘটবারি ॥

নয়

বিপ্রদাসে সংমা-সংমেয়ে কিংবা পৌরাণিক-লৌকিক দ্বন্দ্বচিত্রটি পরিণতিতে অত্যন্ত সুস্থ স্বাভাবিক মানবচিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বেহুলার স্বর্গ থেকে প্রত্যাবৃত সপ্তডিঙ্গা (পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কবিদের রচনায় চৌদ্দডিঙ্গা) চম্পকের ঘাটে লাগার পর বেহুলা ডোমনিবেশে একবার শ্বশুড়-শাশুড়ীকে দেখে এসেছে। তারপর দুর্লভ কাণ্ডারীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। দুর্লভ জাকজমক করে বাড়ির দিকে যাওয়ার পথেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

দেখি লোক চমৎকার জানাইল দণ্ডধর
শুনি রাজা ভয়ে চমকিত
পাত্রমিত্র বরাবরি যুক্তি করি অধিকারী
পাঠাইল সোমাই পণ্ডিত।

চাঁদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল 'ভয়'। সোমাইয়ের কাছে দুর্লভ সব বিবরণ দিয়েছে।—

বেহুলা যুবতী সতী মহিমা অপার
দেবতা সমাজে পাত্র বড় পুরস্কার।
নৃত্য করি (বেহুলা) তুষিলা দেবপুরী
জীয়াইয়া প্রভু ছ ভাসুর যত্ন করি।
কালীদহে তুলে দিলা সপ্ত মধুকর
সৈন্যদল অশ্বহস্তী গাঁথর চাকর।

তবে একটি সর্ত আছে, চাঁদ মনসাপুজা না করলে আবার সব ফিরে যাবে। সোমাই দুর্লভকে চাঁদের সভায় নিয়ে এসেছে। তাকে দেখেই—

সম্ভ্রমে উঠিল রাজা দেখিল কাণ্ডার
বিপরীত কর্ম দেখি লাগে চমৎকার।
শুনি চমৎকার রাজা আনন্দিত মন
বেহুলা জিয়াইএ আইল মৃত পুরীজন।

তারপর রাজ্যের লোক নিয়ে আনন্দিত মনে রামেশ্বর ঘাটে গিয়ে—

বেহুলার জতো কর্ম চাঁদো রাজা দেখি
বিশেষ ভকতি-স্তুতি পূর্ণ-অশ্রু আঁখি।

প্রজাদের মুখের কথা চাঁদেরও মনের কথা—

কোথায় সম্ভবে হেন অসম্ভব নরে
লক্ষ লক্ষ মৃত জীব জিয়াইতে পারে।
বিধবা পাইল স্বামী তোমার প্রসাদে
তব কর্ম ঘুষিতে রহিল অবিবাদে।

বিপরীত কর্মের বিবরণ শুনে ও তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেই চাঁদের মতিপরিবর্তন ঘটে গেছে। এরপরে সবই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। বেহুলা প্রণাম করে সর্তের কথা জানিয়েছে। চাঁদের মনে তখন কৌতুকের ভাব জেগেছে :

মনেতে বুঝিয়া রাজা বলে কুতূহলে
হৃদয়ে পদ্মার ভক্তি মুখে কিছু বলে।
না বুঝিয়া সর্বলোক বলে অনোচিত
দক্ষিণার লোভে বলে সোমাই পণ্ডিত।

এরপর আবার বেহুলা, সনকা প্রভৃতি সকলে অনুরোধ করতেই চাঁদ অবিশ্বাস্য অলৌকিক শক্তির একবার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে চেয়েছেন। সে তার নৌকাগুলিকে স্থলপথ দিয়ে হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া দেখাতে বলেছে। মনসা সাপেদের দিয়ে তাই করিয়েছে। পরিবর্তন পালা সমাপ্ত হয়েছে। তারপর ধুমধাম করে মনসাপূজা। চাঁদের বশ্যতা স্বীকার যেমন বাস্তবোচিত তেমনি মানবোচিত। মানবকীর্তি সসম্মানে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতপাতবিচারের তলায় চাপা পড়ে নি, যেমনটি হয়েছে পূর্ববঙ্গীয় কাব্যে। বিপ্রদাস সমাজের চিত্র অঙ্কন করেন নি, লৌকিক দেবী মনসার প্রাচীন ঐতিহ্যটুকু শুধু তুলে ধরেছেন।

দশ

বিপ্রদাসে যেমন লৌকিকচিত্র, বিজয়গুপ্তে সমাজচিত্র, নারায়ণ দেবে তেমনি মানবচিত্র। সচল মানবচরিত্রের প্রাধান্য বলেই গ্রন্থটিও অবিরাম গতিশীল। সকল মনসাকাব্যে দেবতা ও মানুষকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। অথচ সমাজ ও মানুষের এমন সম্পর্কও অন্যত্র ক্বচিৎ লক্ষ করা যায়। চাঁদ একাধারে আত্মীয়-বন্ধু-পরিবৃত সমাজ ও প্রজাদের দ্বারা কর্মপন্থা নির্ণয় করেছে। আত্মীয়দের পরামর্শ নিয়ে পাত্রী দেখতে যাত্রা করেছে আবার প্রজাসাধারণের কথায় মনসাকে দেবী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সাহে বেনেও প্রজাদের কথাতেই লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। কাব্যে সমাজের সবদিকে সর্বত্র আলোকপাত লক্ষ করা যায়।

কাহিনীর রমণীয়তাসৃষ্টিতে নারায়ণ দেবের প্রধান ভূমিকা। এজন্য পরিচিত কাহিনীকে তিনি সর্বত্র অভিনবভাবে দেখাতে চেয়েছেন, পরিচিত ঘটনা ও চরিত্রকে অভিনবত্ব দিয়ে গড়েছেন। আবার ঘটনাগুলিকে নাটকীয়ভাবে রূপদান করেছেন।

বেহুলার সঙ্গে বিবাহসংঘটনে ছদ্মবেশে পুত্র চাঁদের যাত্রা (সৈন্যদল তফাতে রেখে) এবং শেষে ভুল বোঝাবুঝিতে সাহেরাজার সঙ্গে যুদ্ধঘটনায় নাটকীয়তার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে। চাঁদ প্রথমে যুদ্ধ করায় সঙ্কোচ বোধ করেছে, কিন্তু চণ্ডীর প্রেরণায় যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে এবং মাকে প্রচুর রক্তমাংস খাইয়েছে। তারপর আবার ঐ চণ্ডীকে দিয়েই পক্ষ বিপক্ষের মৃত সকলকে বাঁচিয়ে তুলে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা অর্জন করেছে। অন্য কোন চাঁদের ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই। নারায়ণদেবে চাঁদ সর্বাঙ্গীণ রূপ গ্রহণ করেছে। তার মনসা বিরোধিতা যেমন সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছে তেমনি তার রাজমহিমাও গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছে। দেশে ফিরে চাঁদ প্রজাসাধারণকে দেখা দেবার জন্যই পুত্র, পাত্র, সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে নগর ঘুরেছে। প্রজারা কলাগাছ পুঁতে আবির ছিটিয়ে তাদের রাজাকে সম্বর্ধনা করেছে। এ চিত্র অন্যত্র দুর্লভ।

পাত্রের অনুরোধ সভা করে প্রজাসাধারণকে তার দুর্ভাগ্যপূর্ণ বাণিজ্যের বিবরণ দিয়েছে। তার বিবরণ শুনে পুত্রহারা মা, স্বামীহারা জননীরা উচ্চস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করলে ধমক দিয়ে চাঁদ সকলকে থামিয়েছে। তার ভয় মনসা তাদের কান্না শুনে হাসবে।

এরপর সভায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে, ব্রাহ্মণে অশীর্বাদ করেছে, ভাটে (মাধব ভাট) গুণগান করেছে। এই বিদ্যাসুন্দর খ্যাত মাধব ভাটের (কাঞ্চন নগরের উল্লেখ রয়েছে) কাছেই চাঁদ ছেলের জন্য পাত্রীর সন্ধান পেয়েছে। পাত্রী প্রসঙ্গে ভাটের সর্বভারতীয় বিবরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কাশী, কাঞ্চী, উড়িষ্যা, মথুরা, দ্বারকা, অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা, অঙ্গ, কলিঙ্গ, দিল্লী, পাটনা, কেকয়, ত্রিপুরা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পাত্রীর পরিচয়দান প্রসঙ্গে চৈতন্যপূর্বযুগের কবি মনসাকাব্য রচনার প্রথম পর্বেই লৌকিক আখ্যান সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধি বিশেষভাবে বিস্তৃত করেছেন।

লৌহবাসরের পরিকল্পনা এখানে চাঁদের মাথা থেকে আসে নি। পাত্র জয়ধর মনসা-নিন্দা করে চাঁদকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে এবং সে-ই লৌহবাসরেব পরিকল্পনা দিয়েছে। চাঁদের আদেশে কেনাই কর্মকার তার বাড়ির কারখানাতেই লৌহবাসর নির্মাণ করে পঞ্চাশ জন লোকের মাথায় চাপিয়ে চাঁদের বাড়ি পৌছিয়ে দিয়েছে।

নারায়ন দেবের রচনায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মনসা বেগে যমকে বলেছে—

কাকে গরুড়ে বেটা অনেক অন্তর।
সিংহে শৃগালে বেটা করিস সমসর॥
ইন্দুরে বিড়ালে বেটা করিস সমতুল।

বিবাহ সভায় লখিন্দরের সাময়িক মৃত্যুতে সকলের কান্নাকাটির একটি অংশ—

সুমিত্রার ক্রন্দনে বৃক্ষের পাত ঝরে।
চান্দোর ক্রন্দনে জেন ভাঙ্গা ঢোল পড়ে॥

এখানে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব মিলন হয়েছে। কবির পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় —রন্ধন রান্ধে তারকা কানের লড়ে সোনা।

সমাজের বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করা নারায়ণ দেবের বৈশিষ্ট্য। যেখানে স্বর্গে যাবার পথে জামদানির অশালীন প্রস্তাবের উত্তরে বেহুলা বলেছে—

স্বামী ব্রহ্মা স্বামী বিষ্ণু স্বামী মহেশ্বর।
স্বামী বিনে নারীর বিফল কলেবর॥

সেখানে স্মৃতি শাসিত সমাজে জামদানির উত্তর হল—

স্বামী মৈলে জে স্ত্রী আর স্বামী ধরে।
সুরাসুর আদি হেন অধিক পুণ্য বাড়ে॥
তৃতীয় পুরুষগুলা ভিন্ন ভাব নয়।
ইহাতে প্রেম করিলে অধিক পুণ্য হয়॥

'মানসী'র কবিতাপঞ্চক, শতবর্ষ পরে

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৪০-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি 'মানসী' কাব্যের সূচনাংশ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে নিজের যৌবনের কোন কাব্য সম্পর্কে যখন কবি বিশ্লেষণে বসেন তখন তাঁর সব ক'টি উক্তি অভ্রান্ত না-ও হতে পারে। যে-কোন প্রবীণই তাঁর তারুণ্যকে সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। 'জীবনস্মৃতি'ই তার প্রমাণ। অজস্র মূল্যবান মন্তব্যে 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্র-কবিসত্তার গভীরে পৌঁছে যেতে সাহায্য করেছে পাঠকদের; তথাপি 'জীবনস্মৃতি তথ্যনিষ্ঠ দলিল নয়। কিন্তু 'মানসী'র 'সূচনা'র শেষ বাক্যটি চমকপ্রদ; অন্ততঃ একজন রসিক সমালোচক-শোভন একটি মন্তব্যের জন্য: 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল। প্রত্যেক কবিই শিল্পী; বাণীশিল্পী—বাণী তাঁর আত্মোন্মোচনের মাধ্যম। কিন্তু কবির সঙ্গে শিল্পীর যোগ বললে বুঝে নিতে হয় অন্য কিছু। উচ্ছ্বাসের তাড়না সংযত হয়েছে, কবিতা পেয়েছে আপনার ভাষা, ছন্দ হয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত—এই রকম কিছু অমুক্ত কথা 'শিল্পী' শব্দের দ্যোতনায় বুঝে নেওয়া আবশ্যক মনে করি। কিন্তু 'মানসী'র সব কবিতা সম্পর্কেই কি রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য সমান সত্য? সব ক'টি কবিতারই কি সেই অলৌকিক মূল্য আছে, যা রসোত্তীর্ণ কবিতাকর্মের কাছ থেকে একান্ত কাম্য? 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর' অনায়াসে 'সুরদাসের প্রার্থনা'র পাশে ঠাঁই পেয়েছে এবং 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি'র পাশে 'অনন্তপ্রেম' অথবা 'মেঘদূত'-এর মত কবিতা। কিছু কবিতার সমকালীনতার জন্য ঐহিক মূল্য নিশ্চয়ই ছিল এবং সেই কারণে আছেও অদ্যাপি তাদের ঐতিহাসিক মূল্য। কিন্তু অঙ্গুলিমেয় হলেও 'মানসী'তে সত্যিই এমন কিছু কবিতা আছে যেখানে কবির ভাবকল্পনা বা Imagination প্রকাশের মাধ্যম বা Structure-এর সহায়তা লাভ করেছে।

কবিতা 'শিল্প' হয়ে ওঠে কখন? কবিতার সংজ্ঞার মতই এই প্রশ্নের সদুত্তরও অকাম্য। বৃথা প্রজল্পনা অর্থহীন। তবে কবিতা বলতে অবশ্যই বুঝি সমিল বা অমিল পঙক্তি-সমন্বিত স্তবকবদ্ধ রচনা এবং সেই রচনা যতটা ব্যক্ত করে তার চেয়ে পাঠককে প্রাণিত করে অনেক বেশী। প্রাণিত করার সব চেয়ে বড় মাধ্যম ভাষা, ছন্দ, অলংকার, পঙক্তি, স্তবক ইত্যাদি।...খুব প্রাথমিকভাবে এই ধারণা সম্বল করে 'মানসী'র কিছু কবিতার মূল্যায়নের চেষ্টা করা যেতে পারে।

কবিতা অন্যান্য শিল্পের মতই 'রূপকর্ম'। সেই কারণেই যাবতীয় রূপের মত কবিতার অভিসার রূপ থেকে অরূপে—রসে; স্তর ভেঙে ভেঙে। কোন একটি শব্দ বা ছেদ ও

যতিচিহ্নকে উপেক্ষা করা যায় না; যায় না পঙক্তি সমূহের নিবিড় বন্ধনকে অথবা স্তবক-বিন্যাসের কৌশলকে। শব্দ থেকে স্তবক রচনা কোনটাই ভাবের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। নয় বলেই 'অহল্যার প্রতি'র মত বিরাশি (৮২) পঙক্তির কবিতায় প্রথম পূর্ণচ্ছেদ যখন ৪৮ পঙক্তির পরে নেমে আসে তখন বিস্ময় মেনে আমরা কারণ অনুসন্ধান করি। প্রথম সাতাশ পঙক্তিই বা কীভাবে মূখ্যত প্রশ্নচিহ্নের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রইল? যতদূর জানি, এত অজস্র প্রশ্নের জালে কোন কবিতারই স্তবক নির্মাণ করেন নি রবীন্দ্রনাথ। মোট ছ'টি স্তবকের কবিতার প্রথম স্তবক শুধু প্রশ্নের সমবায়। 'তুই' এবং 'তুমি' মধ্যম পুরুষের এই দুই সর্বনামই ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকও প্রশ্নে ভরা। 'জীবধাত্রী জননী'র বুকের গভীরে লীন অহল্যাকে কেন্দ্র করে কবির প্রশ্ন। পাষাণী অহল্যার কাহিনীর মধ্যে Creation ও Fertility মিথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সেই 'মিথ'কে কাব্যের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন বিস্ময়ের নবজাগরণ-সহ। অহল্যা-র কাহিনীতে অহল্যা অভিশপ্তা নারী। অভিশাপের ফলস্বরূপ অহল্যা পাষাণী। কিন্তু নারী অহল্যা সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিতা হলেও যেহেতু দেহধারিণী তাই বিচ্ছেদ হয়েছিল তার জননী পৃথিবীর সঙ্গে। অহল্যা যেদিন পাষাণী হয়েছিল সেইদিন মানবদেহের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটলেও জীবধাত্রীর সঙ্গে নিবিড় নৈকট্য স্থাপিত হল। 'ছিন্ন পত্রাবলী'র দু'একখানি চিঠি এই কবিতার কবির মর্ম-অনুধাবনে সহায়ক হলেও কবিতাটিই স্বয়ংসিদ্ধ। জীবধাত্রী ধরিত্রীকে বারবার মাতৃরূপে উল্লেখ এবং অহল্যাকে তার কন্যারূপে কল্পনা, জননী ও কন্যার সম্পর্কের ছবির সাহায্যে পাঠকদের সংস্কারের গভীরতলে আলোড়ন জাগায়। কবিতার প্রথম স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তি দুটিতে পৌরাণিক উপাখ্যানের স্পর্শমাত্র আছে: 'নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন/শূন্য তপোবনচ্ছায়ে?' তারপরই জননী-কন্যার সম্পর্কে ছবির পর ছবির মত হয়ে আমাদের Stock response জাগিয়ে তোলে। (ক) 'নিত্য নিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর', (খ) 'যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে', (গ) 'ভরিছে সন্তানসহ ধনধান্যরূপে। জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে', (ঘ) 'সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপ-রেখা/মুছিয়া দিয়াছে মাতা', (ঙ) 'মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে'...ইত্যাদি। ধরিত্রী জননী, অহল্যা কন্যা—এই সম্পর্কের ছবি প্রশ্ন, কমা, সেমিকোলন এবং অবশেষে পূর্ণচ্ছেদে শেষ হল পরপর চারিটি স্তবক পরে। শেষ স্তবক দুটিতে জননী অনুপস্থিত, কবি প্রশ্ন-চিহ্ন বর্জন করে সরাসরি অহল্যার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যমী। চিত্ররূপময় বাণী-মাধ্যমে জানান হল বিস্মিতা অহল্যার 'নির্নিমেষ' দৃষ্টির কথা, কৌতূহলাক্রান্ত বিশ্বসংসারের কথা। স্তব্ধতার বর্ণনায় সচল জীবন স্রোতের স্থির চিত্র ধরা পড়ল: 'কৌতূহলে সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে/ সম্মুখে তোমার; /থেমে গেল কাছে এসে/চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।' নিদ্রোত্থিতা অহল্যা-র উপমান 'সদ্যোজাত কুমারী', 'প্রথম উষা'। শেষের দুটি পঙক্তি নবজাগরণের পর অহল্যার বর্ণনা 'চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়' একটি আপাত বিরোধের ছদ্মবেশে অনবদ্য। কবিতাটি বাঁক ফিরেছে কয়েকবার। প্রতিটি প্রশ্নই যেন

এক একটি ছোট ছোট বাঁক-নির্দেশক। কিন্তু অহল্যা-কে কেন্দ্র করে Transformation বা রূপান্তরণের যে পৌরাণিক কাহিনী আছে তাকে Metamorphosis-এর শৈল্পিক সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করায় কোন আকস্মিকতা বা অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ কবিতাটিতে অতি-প্রাকৃতের অবাঞ্ছিত দ্যোতনা আনে নি। নারী ছিল অহল্যা, স্বামীর অভিশাপে পাষাণী এবং একসময় রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পুনরায় নারী। ঋষি-পত্নী অহল্যার পাষাণীতে রূপান্তর—একান্তই অলৌকিক পৌরাণিক বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। কিন্তু সেই অহল্যার জীবধাত্রী ধরিত্রীর বুক থেকে আবির্ভাব কালে 'ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়' 'লগ্ন হয়ে আছে' তার নগ্ন গৌর দেহে এবং চোখে তার জন্মান্তরের বিস্ময়। অহল্যার দু'চোখের এই বিস্ময়ে কবিচিত্তেরই বিস্ময়ের Substitution বা Transfer ঘটেছে। অহল্যার মানবী থেকে পাষাণীতে এবং পাষাণী থেকে মানবীতে রূপান্তরণ আপাতদৃষ্টিতে Natural Transformation হলেও কার্যত কবির অনুভবের উদ্দীপক রূপে এই কবিতায় উপস্থিত। পুরাণের জীর্ণ-বাস ত্যাগ করে অহল্যার রবীন্দ্রকাব্যে চিরন্তনতা লাভের রহস্যই এখানে। অহল্যা-র পাষাণী রূপে ধরিত্রীর অঙ্কে লীন থাকার পৌরাণিক উপাখ্যান কতকগুলি শব্দের অনুষঙ্গে মর্ত্যের মহিমায় ভাস্বর; যথা: 'অযুত পায়ের পদধ্বনি', 'অমুর্বরা-অভিশাপ', 'শিথিল অঙ্গ', 'সুষুপ্ত নিশ্বাস', 'পত্র পুষ্পজালে', 'ধনধান্যরূপে', 'ধূলির শয্যায়', 'দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল', 'শিশির', 'শৈবাল', 'কৃষ্ণ কেশপাশ', 'নগ্ন গৌর দেহ', 'ধূলিলিপ্ত পদচিহ্ন রেখা', 'পূর্ণস্ফুট পুষ্প' ইত্যাদি। সেকালকে একালের অভিজ্ঞতায় আনা এবং পুনর্বার তাকে কাব্যলোকের অনির্দেশ্যতায় পাঠানো—কবিদের এই তো নিত্যলীলা। এই লীলার জন্যই 'নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন' অথবা 'শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে/একবৃন্তে' জাতীয় উক্তি অর্থহীন হয়ে যায় না। কবির সঙ্গে শিল্পীর মিলনে 'অহল্যার প্রতি' একটি সার্থক কবিতাই। বিস্ময় রসের এই কবিতায় কবির হৃদয় আলম্বন বিভাবের ভূমিকায় উপস্থিত।

'একাল ও সেকাল' (২১শে বৈশাখ ১৮৮৮), 'অহল্যার প্রতি'র (১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০) দু'বছর আগেকার কবিতা। আট স্তবকের এই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের পঙক্তি বিন্যাসে কিছুটা রীতিগত বৈচিত্র্য আছে; তা ভিন্ন প্রতিটি স্তবকই চার পঙক্তির এবং মিল বিন্যাসও প্রথমে-চতুর্থে, দ্বিতীয়ে-তৃতীয়ে। দ্বিতীয় স্তবক আট পঙক্তির। কিন্তু এখানেও মিল প্রথমে-তৃতীয়ে, দ্বিতীয়ে-চতুর্থে, পঞ্চমে-অষ্টমে, ষষ্ঠে-সপ্তমে। আপাতদৃষ্টিতে দুটি স্তবক বলে ভ্রম হয়। কবিতার শিরোনাম 'একাল ও সেকাল'। বলাবাহুল্য, শিরোনামেই স্পষ্ট কবিতা রচনার সমকালে কবি অভিসার করেছেন অতীতে। কিন্তু 'সেকাল' বলতে বর্ষার অনুষঙ্গে কবির মনে পড়েছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বর্ণিত শ্রীরাধার বর্ষাভিসারের কথা এবং কালিদাসের মেঘদূতের কথা। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে অভিসারের লগ্ন হিসেবে বর্ষার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রতিকূলা বহিঃপ্রকৃতি নায়িকার শঙ্কিত হৃদয়ে দুর্গম পথযাত্রাকে যেমন কষ্টসাধ্য করেছে, তেমনি অন্তরের বেগবান অনুভূতিকে দিয়েছে অধিকতর বিস্তার ও গভীরতা। বর্ষাপ্রকৃতির অনুষঙ্গে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের মতই স্মরণীয় (হয়ত আরও কিছুটা

বেণী) কালিদাসের বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের অমরকাব্য 'মেঘদূত'। কবিতাটির প্রথম স্তবকে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই একালে : 'বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী। /গাঢ় ছায়া সারাদিন,/ মধ্যাহ্ন তপনহীন,/দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।'—প্রথম তিন পঙক্তিতে বর্ষার নারী-মূর্ত্তি বর্ণনাকে concretise করেছে। 'শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী' শুধুমাত্র শ্যাম বনভূমির উপর ঘনায়মান অন্ধকারের বর্ণনা নয়, 'মেঘদূত'-সংস্কারপুষ্ট পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় কালিদাসের 'পূর্বমেঘে'র বহু পঙক্তি। কালিদাসের মেঘের দেহ শ্যাম এবং উজ্জ্বল শোভান্বিত ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা গোপবেশধারী বিষ্ণুর ন্যায়, অথবা 'মধ্যে শ্যামঃ স্তনঃ ইব ভুবঃ শেষ বিস্তার পাণ্ডুঃ।' জম্বুবৃক্ষের পক্বফলের বর্ণশ্যাম (পরিণতফল শ্যাম জম্বুবনান্তাঃ) ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে 'শ্যাম' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। 'তড়িত চকিতদৃষ্টি' স্মরণ করিয়ে দেয় 'দৃষ্টোৎসাহশ্চকিত চকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ' (পূঃমে ১৪) অথবা 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং' (পূঃ মেঘ ২০)। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে স্পষ্টই মেঘদূতের কথা। 'চাহিত পথিক বধূ' মেঘদূতের 'প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবণিতাঃ'বই রূপান্তর। কিন্তু শেষ তিনটি স্তবক বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের মন বেঁধে দেয়। 'কদম্বের মূল', 'যমুনার তীর', 'শিখীর নৃত্য', 'শ্রাবণ তিমির', 'বৃন্দাবন', 'বাঁশি', 'রাধা'—বৈষ্ণব পদসাহিত্যের পাঠকদের একাল-কে বেঁধে দেয় সেকালের সঙ্গে। প্রত্যেক জাতিরই সংস্কারের জগতে একটি নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার থাকে, বোধ হয়। এই সব শব্দের অনুবাদও অসম্ভব। প্রায়-শিক্ষানিরপেক্ষ এই সব শব্দের আনুষঙ্গিক আবেদনই মুখ্য ব্যাপার। আলোচ্য কবিতার পঞ্চম ও অষ্টম স্তবক দ্বয়ে সরাসরি 'যক্ষনারী' ও 'রাধা'র উল্লেখ মেলে। একালের কবির চিত্তভাব উদ্দীপনে সেকালের মেঘদূত ও বৈষ্ণব সাহিত্য সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে। পাঠকের তরফে মেঘদূতের জন্য অবশ্য একটি শিক্ষিত মনের দরকার কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য আসে 'মিথ' নামক জাতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারের দাবিতে। এলিঅটের পাঠকেরা 'একাল ও সেকাল'এর আলোচনায় অবশ্যই স্মরণ করবেন 'অবজেকটিভ কো-রিলেটিভ' তত্ত্ব। ষষ্ঠ স্তবকের 'এখনো হরিছে চিত্ত— /ফেলিছে বিরহ-ছায়া শ্রাবণ তিমির' এবং অষ্টম স্তবকের 'এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে' ঐ তত্ত্বের সূত্রে নতুন করে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে আজ শতাধিক বছর পরে। কবির যে রোমান্টিক অনুভব অনায়াসে একাল থেকে সেকালে সঞ্চরণ করে সেই অনুভব থেকে জন্ম নিয়েছে 'কুহুধ্বনি'র মত কবিতা। সাতাশ বছরের যুবক কবি নিজেই stock response-এ আক্রান্ত। গাজিপুর-বাসকালে কোন এক বৈশাখের ক্লান্ত মধ্যাহ্নে কবি শুনেছিলেন কোকিলের কণ্ঠস্বর। হোক গাজিপুরের গোলাপের খেত ব্যবসায়ীর সম্পত্তি, কবি বা বুলবুলের না-থাকুক সেখানে নিমন্ত্রণ, গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি-আঁকা হোক-না ব্যর্থ, তবু কোকিলের কণ্ঠস্বরে কবি কেন পরিপার্শ্বেই শুধু চোখ দুটোকে নিবদ্ধ রাখতে পারলেন না? বাস্তবের রূপ দেখতে দেখতে মনের ছিলা কেন জ্যা-বদ্ধ থাকতে পারল না? না পারাটাই সম্ভবতঃ রোমান্টিক কবির অনিবার্য নিয়তি। কোকিলের কণ্ঠস্বরে কবির মনে হল :

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন-বীণা করে ধরি'—

তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি শেলি যেমন স্কাইলার্ক-কে নানামূর্তিতে কল্পজগতে দেখেছিলেন, সেই রকম কোকিলের কুহুতানকে অবলম্বন করে বিচিত্র ভাবের আশ্রয় কবি আপন চিন্তাকে 'সংসারের আবর্ত বিভ্রম' থেকে মুক্তি দিলেন। শেলি-র কাছে স্কাইলার্ক ছিল 'Blithe spirit', 'cloud of fire', 'unbodied joy', 'star of heaven', 'a poet hidden', 'high-born maiden' ইত্যাদি। আর কোকিলের পঞ্চমতানে গাজিপুর-বাসী কবির কোকিলকে মনে হল, 'সরলা সুন্দরী' এবং 'রূপবতী সংগীতের সরস্বতী'। দুই কবিই ব্যথা ও আনন্দের মিশ্রণ দেখতে পেলেন। শেলি, স্কাইলার্ক-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'Thou lovest-but ne'er knew love's sad satiety.' আর কোকিলের কুহুতানে রবীন্দ্রনাথের মনে হল :

সংগীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয়স্বরে।

উপাস্ত স্তবকে কবির অনুভবে এল '…মিশে ভালবাসাভরে / পাখি-গানে মানবের গানে।' সেই বিষাদ ও আনন্দের মিলনের অনুষঙ্গে এল জনমদুখিনী সীতার কথা এবং দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গোপন মধুময় প্রেমলীলার প্রসঙ্গ। বিষাদ ও হর্ষের, ব্যথা ও করুণার মিশ্রণ রাম-কাহিনী ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের কাহিনীর অনুষঙ্গে গভীরতর হয়ে উঠল। তমসার প্রসঙ্গ রাম-কাহিনীতে সীতার বেদনার বার্তাবহ। স্বামী-পরিত্যক্তা সীতা শ্রীরামের বিরহে কাতরা। একালের কবির অনুমানে রাম-বিরহাতুরা সীতার অবস্থা 'বিষাদে হরিষ।' বিষাদের কারণ অবশ্যই রামবিরহ এবং হরষের কারণ দুটি পুত্রসন্তান : লব ও কুশ। কোকিলের কণ্ঠস্বর কবির কাছে হর্ষ ও বিষাদ দুটি বিপরীত অনুভূতির জাগরণ ঘটিয়েছে। হয়ত গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে জড়িয়ে থাকা আলস্যের সূত্রেই কবিচিত্তে এই বিপরীত ভাবের মিশ্রণ। রাম-কাহিনীর পরেই কবির মনে পড়েছে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনী। অবশ্যই কাহিনী দুটি সদৃশ নয়। কিন্তু সন্তানসম্ভবা সীতা-বর্জনের মতই ঘটেছিল দুষ্মন্ত-কর্তৃক শকুন্তলা-বর্জন। সীতার মত শকুন্তলারও সন্তানলাভ হয়েছিল বিরহ-বেদনা বক্ষে বহন করে। উভয়ের কাহিনীই বিরহ-মিলনে বিষাদামৃতময়। তাই সীতার পর রবীন্দ্রনাথের মনে এল দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা :

লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর।

'মানসী'র সেরা কবিতাগুলির জন্মই কি অতীতের কোন কাব্যকাহিনী বা ঘটনার অনুষঙ্গে ? বর্তমানকাল 'মানসী'-কাব্যের একাধিক কবিতার সুনিশ্চিতভাবে উপস্থিত। কিন্তু বর্তমান যেখানে ভালো কবিতার জন্ম দিয়েছে সেখানে হয় উদ্দীপকমাত্র, নয় অতীত স্মৃতিবহ।

'একাল ও সেকাল'-এর রবীন্দ্রনাথই রচনা করলেন 'মেঘদূত' কবিতাটি। 'মেঘদূত' নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের বহুরচনার মধ্যে 'মানসী'র 'মেঘদূত'-কে মনে হয় অনন্যসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের অতীতচারী রোমান্টিক মন কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে, বিশেষত মেঘদূতে লাভ করেছিল পরমোল্লাস। কালিদাসের 'মেঘদূতে' পাঠকেরা fertility cult-এর প্রভাব লক্ষ্য করতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতায় তার ছায়ামাত্র নেই। 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ' মিলে কালিদাসের যে সমগ্র 'মেঘদূত' কাব্য, রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' কবিতার দশটি স্তবকে সেই কাব্য পারিজাত মনোভাবকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এমনও হয়েছে, উত্তরমেঘের প্রসঙ্গ প্রথমে এসে পরে এসেছে পূর্বমেঘের কথা। পূর্বমেঘের মেঘ শুধু বাণীবাহক নয়, নৈসর্গিক ব্যাপারে প্রকৃতির উর্বরতা বিধায়কও। মেঘদূতের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ উল্লেখ করছি : (ক) 'গর্ভাধানক্ষণ পরিচয়াৎ খেআবদ্ধামালাঃ বলাকাঃ' (গর্ভাধানকালের অভ্যাস অনুসারে আকাশে মালাবদ্ধ বলাকারা), (খ) 'কর্তুং যচ্ছ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং' (যার প্রভাবে মহী শিলীন্ধ্রপূর্ণ ও উর্বরা হয়), (গ) 'ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি' (কৃষিফল তোমার উপর নির্ভর করে), (ঘ) 'নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজাকুলগ্রামচৈত্যাঃ' (গৃহবলিভুকের নীড় নির্মাণে যার গ্রামবৃক্ষসকল আকুল হয়েছে) ··ইত্যাদি। কিন্তু কালিদাসের মেঘদূত-এর যে-আলোচনা 'প্রাচীনসাহিত্যে' আছে সেখানে এসবের উল্লেখ থাকলেও 'মেঘদূত' কবিতায় নেই। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত অবলম্বনের চিরকালের বিরহীর বেদনার কথাই জানিয়েছেন।— 'সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম/সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম/তব কাব্য হতে।' একালের কবির অন্তরে চিরকালের বিরহী-বিরহিণীর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা কালিদাসের 'মেঘদূত'। 'কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে', 'মনিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা'-নারী বিরহের চিরনিশি যাপন করছে—এতো রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা। Eternal Passion-Eternal Pain খুঁজেছেন তিনি। আশ্চর্য হল, যে কবিতার শিরোনাম 'মেঘদূত', সেই কবিতার গভীরতল গঠনেই কেবল সক্রিয় আছে কালিদাসের উক্ত শিরোনামের অমরকাব্য। উপরিতলে রবীন্দ্রনাথ শুধুই কালিদাসের কাব্যে সীমাবদ্ধ রইলেন না। কিন্তু সেখানে গভীরতলের আবর্ত স্পর্শে ঘটল ভিন্নতর অনুষঙ্গ আশ্রয়ে। সমগ্র সপ্তম স্তবকটি একেবারেই মেঘদূতের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন। তবে বিরূপতা জাগে না, যখন পড়ি 'যে শ্যামল বঙ্গদেশে/জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে/ দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে/শ্যামচ্ছায়া পূর্ণমেঘে মেদুর অম্বর।' এখানে মেঘদূত অনুপস্থিত, অথচ মেঘদূতের সারাৎসার আছে এবং ভিন্নতর প্রসঙ্গ-আশ্রয়ে। সর্বশেষ স্তবকে 'মেঘদূত' কাব্যপাঠের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। যে-অলকাপুরীর বর্ণনা

কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের 'উত্তরমেঘ' অংশে আছে, রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশ্নে তার অনৈসর্গিকতা স্পষ্ট। অলকার কোন ভৌগোলিক অস্তিত্ব নেই। 'সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে' এই প্রশ্নের রেশ যে শেষ চারটি পঙক্তিতে আছে, তার সমাপ্তি বিস্ময়চিহ্নে, প্রশ্নবোধক চিহ্নে নয়। (আগের পরপর তিন পঙক্তিতে প্রশ্ন চিহ্ন আছে। সমগ্র কবিতাটিতে প্রশ্ন আছে অনেক, প্রশ্নচিহ্ন কম।) সম্ভবত প্রশ্নগুলো বিস্ময়ে রূপান্তরিত ব'লে। পদ্ধতিটা 'অহল্যার প্রতি' কবিতার একেবারে বিপরীত। কিন্তু চিহ্ন থাক বা না-থাক 'অহল্যার প্রতি' এবং 'মেঘদূত' দুটি কবিতাতেই বিস্ময়ের নব জাগরণ। কালের বিচারে 'মেঘদূত' লেখা হয় 'অহল্যার প্রতি'র চার/পাঁচ দিন আগে। একটিতে প্রাচীন কাব্য, অন্যটিতে প্রাচীন উপাখ্যান কবিতা রচনার উদ্দীপক। দুটির মধ্যে আবার রোমান্টিক ভাবব্যঞ্জনা এসেছে কল্পনার সুদূরাভিসারকে কেন্দ্র করে, এবং একাধিক ক্ষেত্রে একালের contrast রূপে। 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' কবিতাদ্বয়ের আরম্ভে আছে সম্বোধন। 'মেঘদূতে' উদ্দিষ্ট স্বয়ং কবি কালিদাস, 'কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে···' ইত্যাদি এবং 'অহল্যার প্রতি'তে অহল্যা—'কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিব নিশি'। এই টেকনিক আশ্রয় করার জন্যই 'প্রকৃতির প্রতি' পরিণত হয়েছে 'ওড'-এ। 'প্রকৃতির প্রতি'তে কবি প্রকৃতি-প্রেমমুগ্ধ। কিন্তু এই মুগ্ধতা প্রকাশকালে অভিমানভরা অনুযোগ মাঝে মাঝে উচ্চারিত: 'মনোচোর', 'নিষ্ঠুরা', 'কৌতুকময়ী', 'মায়াবিনী' ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত একটি বাক্যাংশে আত্মসমর্পিত কবির প্রকৃতি সম্পর্কে বোধের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে, 'তবু তোরে ভালবাসি'। পরপর তিনটি স্তবকের পর চতুর্থ স্তবকের শুরুতে 'তবু' অব্যয়টি অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনুভবের বৈপরীত্য-দ্যোতক। এই বৈপরীত্যের জন্যই পঞ্চম স্তবকে প্রকৃতির মুখখানি কবির কাছে 'রহস্যনিলয়'। রহস্যের সঙ্গে জড়িত 'কৌতুকের হাসি'। ষষ্ঠ স্তবকে প্রকৃতির উপর মানবীর ধর্ম আরোপ করে বলা হয়েছে, 'চপলা-মুখরা'। অষ্টম স্তবকেও সে 'চির-একাকিনী', 'চির-মৌনব্রতা'। নবম স্তবকে প্রকৃতি যেন 'বালিকার মতো'। প্রকৃতির উপর মানুষের ধর্ম আরোপ রোমান্টিক মাত্রেরই সাধারণ ধর্ম। প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণ বা objective বর্ণনা কোন রোমান্টিকেরই স্বধর্ম নয়। ছোট্ট একটি ফুল তাঁর চৈতন্যের গভীরে প্রবল আলোড়ন জাগায়—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই স্বীকৃতি তো যে-কোন রোমান্টিকেরই হতে পারে। প্রকৃতির বিপুলতার মধ্যে রহস্যের সন্ধান, প্রকৃতির বৈচিত্র্যের পটে আপন ক্ষুদ্রতার পরিমাপ—ভাবুকমাত্রকেই আলোড়িত করে, বিশেষ করে রোমান্টিকদের। 'প্রকৃতির প্রতি'ও 'ওড' শ্রেণীভুক্ত কবিতা। কবিতার বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব নেই। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যে কবি ও শিল্পীর যে-মিলনের কথা বলেছেন, 'প্রকৃতির প্রতি'তে তার কিছুটা অভাব আছে। রহস্যের বোধ কবির অনুভবের গভীর থেকে প্রকাশের surface-এ উঠে এসেছে অতি সাধারণ চিত্রাশ্রয়ে। বিচিত্ররূপিণী প্রকৃতির কাছে কবির শেষ আশ্রয় কামনা: 'যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে/মহারূপরাশি/তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,/যত কাঁদি হাসি।···/যত তুই দূরে যাস/তত প্রাণে লাগে ফাঁস,/যত তোরে নাহি বুঝি/

তত ভালোবাসি'—বক্তব্যের গভীরতা ও ভঙ্গীতে শেলি-র যে-কোন কবিতার তুলনায় লঘু চালের। পর পর কয়েকবার 'যত' ও 'তত'-এর ব্যবহারে যে চটুলতা তা দু'দিন আগে লেখা (১৩ই বৈশাখ ১৮৮৮) 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'-কে সফলতর কবিতারূপে চিহ্নিত করে। অবশ্য দুটি কবিতাই ভাবে ও রূপে বিহারীলাল চক্রবর্তীর উচ্ছ্বাসে ভরা 'নিসর্গ সন্দর্শন' অথবা 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যের কিছু কিছু অংশ স্মরণ করিয়ে দেয়। তুলনায় 'সুরদাসের প্রার্থনা' উজ্জ্বলতর। ভাবকল্পনা ও অবয়ব সংস্থানের মিলন এখানে প্রশংসনীয়। তবে 'অহল্যার প্রতি' এবং 'মেঘদূত'-এর মতই 'সুরদাসের প্রার্থনা'র বিষয়বস্তুও অন্য সূত্র-লব্ধ। এই কবিতার সব ক'টি স্তবক সমমাপের নয়। দশম স্তবকের পঙক্তি সংখ্যা ৩২। প্রথম ও ষষ্ঠের পঙক্তি ২৪, তৃতীয়টির ১৮, পঞ্চমটির ২০। তা ছাড়া পাঁচটি স্তবকের পঙক্তি সংখ্যা ১২ এবং ক্ষুদ্রতম আট পঙক্তির স্তবক হচ্ছে অষ্টমটি। প্রথম স্তবকে সুরদাসের অন্তর নিঙড়ানো হাহাকার এবং প্রথমেই প্রার্থনা 'ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন'। অন্ধ সুরদাসের সম্মুখে আরাধ্যা দেবীর মুখের উপর বসন টেনে দেওয়ার বাস্তব উপযোগিতা নেই। কিন্তু সুরদাসের পীড়া গভীরতর কারণে। 'অতি অসহন বহ্নি দহন/মর্ম-মাঝারে করি যে বহন'। আঁখির অস্তিত্ব বাহ্য রূপ দর্শনে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে-রূপ মর্ম-মাঝে বাহিত তাকে সেখান থেকে দূরে রাখা যাবে কিভাবে? হয়ত সেই কারণেই, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও অন্তর্গত যন্ত্রণায় বিক্ষত সুরদাসের প্রার্থনা: 'খুলে দাও মুখ আনন্দময়ী/আবরণে নাহি কাজ'। দ্বিতীয় স্তবকের এই প্রার্থনার পর তৃতীয় স্তবকে আরাধ্যাদেবীর কাছে ব্যথাতুর সুরদাসের অজস্র প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে পর পর। কিন্তু চতুর্থ স্তবকে সুরদাস যখন বলেন 'এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,/ফুটেছে মর্মতলে' তখন সেই আঁখি-উৎপাটন তো বাস্তবে অসম্ভব। সমস্ত বক্তব্যটির তাৎপর্য ধরা পড়ল শেষ পঙক্তিতে: 'সে আঁখি তোমারি হোক'। আত্মসমর্পণের এই ভাষার ব্যঞ্জনার্থ নিঃসন্দেহে গভীর। মনশ্চক্ষুর 'নির্বাণহীন অঙ্গার-সম' জ্বালা নিবারণের এই উপায় আপনাকে নিঃশেষ করার রোমান্টিক বাসনার সুন্দরতম অভিব্যক্তি। পঞ্চম স্তবকে নিসর্গ সৌন্দর্যের দীর্ঘ তালিকা। এই সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ যেমন অপ্রতিবোধ্য, তেমনি দুর্মোচ্য এর স্পর্শসুখ। কিন্তু বাস্তবের এই বন্ধন ছিন্ন করার জন্য সুরদাসের প্রার্থনা: 'লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,/ নাগিতেছি অকপটে,/তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া /-আকাশ-চিত্রপটে'। ষষ্ঠ স্তবকের শুরু পঞ্চমের সূত্রেই। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতি সুরদাসের এই মুগ্ধতা সত্ত্বেও কেন তার প্রতি তাঁর এই অনীহা ষষ্ঠ স্তবকের শুরুতেই তার কারণ ব্যাখ্যা থাকায় স্তবক দুটি আপাত ভিন্ন হলেও একটি ভাবেরই সম্প্রসারিত রূপ। 'আকাশ চিত্রপটে' কেন তিমির তুলিকা বুলিয়ে দেওয়ার জন্য সুরদাস প্রার্থনা করছেন, তার উত্তর মেলে প্রথম পঙক্তিতেই, 'ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা নিয়ে যায় টেনে!' পূর্ববর্তী স্তবকে প্রকৃতির যে-সব সৌন্দর্যের কথা ছিল, এই স্তবকে রয়েছে ধ্যানমগ্ন সুরদাসকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য তাদের ভূমিকার বর্ণনা। এই স্তবকের শেষে সুরদাসের প্রার্থনা: আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা'/ লোপ করো একেবারে'। সপ্তম স্তবকে আবার প্রার্থনা, বর্ণনা নেই; সুরদাসের হৃদয়

উন্মোচিত। পঙক্তি সংখ্যা মাত্র আট। কিন্তু সুরদাসের জীবন ও চাওয়ার দ্বন্দ্বের অবসান অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হলেও স্পষ্ট: 'ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি/পশেছে জীবনমূলে,/ এই ছুরি দিয়ে সে মুরতি খানি/কেটে কেটে লও তুলে।' এই স্তবকের সঙ্গে যুক্ত হল বারো পঙক্তির স্তবক—মাঝে যেন ক্ষণেকের বিরতি। বিবতি এসেছে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে। জাগতিক মোহবন্ধনকে ছিন্ন করার জন্য এই দীর্ঘশ্বাস।—'যাক তাই যাক। পারিনে ভাসিতে/ কেবল মুরতি-স্রোতে।' মূর্তির স্রোত ছেড়ে অসীম অনুভূতিতে নিত্য বসবাসের অভিলাষী সুরদাস। কিন্তু তারপর এসেছে দ্বন্দ্ব, যেমন ছিল প্রথমে ও দ্বিতীয়ে। 'থামো একটুকু, বুঝিতে পারিনে,/ভালো করে ভেবে দেখি'—দীর্ঘতম এই উপান্ত স্তবকে একটা করুণ সুর ধ্বনিত হয়ে অবশেষে বিশ্রাম—'আজি এই দিন অনন্ত হয়ে/চিরদিন রবে চাহি।' সর্বশেষ স্তবকে একটি প্রার্থনা সিদ্ধান্তের মত স্পষ্ট: 'হৃদয় আকাশে থাক্ না জাগিয়া/ দেহহীন তব জ্যোতি।' সমগ্র কবিতাটি নাটকীয় তরঙ্গভঙ্গে উপস্থাপিত। যন্ত্রণা, মুক্তিকামনা, দ্বিধা, আকাঙ্ক্ষা, আত্মসমর্পণ সব মিলে সমগ্র কবিতাটিই বহুভঙ্গিম। কবি আছেন একেবারে অন্তরালে, সম্মুখে এলেও সুরদাসের অন্তরালে। আপনাকে আড়াল করে এই রকম বিচিত্র গতিভঙ্গিমা বিশিষ্ট আর কোন সার্থক গীতিকবিতা 'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন কি? সতর্ক পাঠক জানেন, সুরদাসের কাহিনী কবিচিত্তের উদ্দীপক মাত্র, বাকিটুকু রোমান্টিক ভাবতন্ময় কবির আত্মস্বরূপ-উন্মোচন। 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' এবং 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় কাহিনী আছে; কিন্তু শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা কীটসের কবিতায় স্কাইলার্ক, নাইটিঙ্গেল, গ্রীসিয়ান আর্ন, ওয়েষ্ট উইণ্ড, ড্যাফোডিল যে-ভূমিকা পালন করেছিল মেঘদূত, অহল্যার উপাখ্যান, সুরদাসের কাহিনী সেই ভূমিকাতেই অবস্থিত। হয়ত রোমান্টিক গীতিকবিতাতে এই কৌশলই কাম্য। 'ছন্দের নানা খেয়াল' মানসী-র কবিতাতে যা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে তার গুরুত্ব স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে। একটি কবিতা সার্থক শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে শুধু ছন্দের জন্য নয়, তার অবয়বগত সৌন্দর্যের জন্য, তার চিত্ররূপময় রসাত্মক বাণীবিন্যাসেরজন্য। শুধু গীতিধর্মের জন্যই পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে 'মানসী'তে এমন কবিতাও কম নেই। কিন্তু 'মানসী' কাব্যের শতায়ু হওয়ার সামর্থ্যের কারণ-রূপে গণ্য হতে পারে এমন কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার আলোচনা এখানে করা হল যেখানে যথার্থই কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দিয়েছিলেন।

চলিত ব্যবহারে কবি রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর মণিলাল খান

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-স্নিগ্ধতায় বাঙলা কাব্য সুদীর্ঘকাল ধরে ভাবে ও রূপে—বার বারই কেবল নোতুন থেকে নোতুনতর হয়েই দেখা দিয়েছে। পথের পথিক তিনি চিরকালই। নোতুন সৃষ্টির উল্লাসে তাই তিনি কেবলই যাত্রা করেন রূপ থেকে অরূপে। সীমানা পেরিয়ে অসীমের উদ্দেশ্যে, ভাব থেকে নবতর ভাবলোকে। জীবনের শেষপাদে পৌঁছেও তিনি দেখতে পান শেষের মধ্যে অশেষই বাস করছে। হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্বস্রষ্টার সহযোগী এমন কবি একজনই আবির্ভূত হন।[১]

মাত্র ষোল বছর বয়সেই তিনি 'ব্রজবুলী' ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে পদকর্তা-ভানুসিংহকে পণ্ডিত মহলের গবেষণার বিষয়বস্তু করে তোলেন। সেই তিনি জীবন-সায়াহ্নে এসে বুঝলেন, কিছু অকথিত কথা আছে, যা এতখানি আটপৌরে এবং বৈচিত্র্যহীন যে দীর্ঘকালের অভ্যস্ত পদ্যের পদ-লালিত্যে তাকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।[২] তাই কাব্যসংসারের দীর্ঘকালের সমস্ত সংস্কার দূর করে দিয়ে নোতুন রূপে 'অসংকুচিত গদ্যে'[৩] কবিতা লিখতে লাগলেন। 'লিপিকার' অল্প কয়েকটি কবিতায় পরীক্ষামূলকভাবে এই যুগের যাত্রা সুরু এবং 'পুনশ্চ' থেকেই তার ব্যাপকতর বিস্তৃতি।

এই নোতুন কালের 'কথা' এবং 'রূপ' নিয়েই আধুনিক কবিতার শুভ সূচনা। সুতরাং এখান থেকেই রবীন্দ্রকাব্যে আর একটা ঋতুবদল পরিলক্ষিত হল। বলাবাহুল্য কবি রবীন্দ্রনাথের এই শেষপর্বের রচনার আদর্শ আধুনিক কাব্যে নানাভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে।[৪]

অথচ তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যস্থ পদ্যভাষায় 'চাষী করিতেছে চাষ', 'ও পারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতল', 'ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী', 'বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা—পথখানি বাঁকা,' 'এই গ্রাম', 'ওই শূন্য মাঠ', 'ওই খেয়াঘাট,' 'নিভৃত জলের ধারে চখাচখির মেলা' প্রভৃতি কতদিন দেখা 'এই সব ছবি' প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।[৫] কারণ এই যুগে কবিমানস

---

১. ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, (৩য় সংস্করণ) ১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. 'অপরিচিতের এই চিরপরিচয়

এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়,

সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী

আমি নাহি জানি।'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলাকা, ৪১ সংখ্যক কবিতা।

৩. 'পুনশ্চ'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪. আধুনিক বাংলা কবিতা, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫. বলাকা, ৪১ সংখ্যা কবিতা দ্রষ্টব্য।

রোমান্টিক আবিলতায় মগ্ন ছিল। আর এইভাবেই তিনি চলে এসেছেন—কখনো প্রকৃতি প্রাণতায়, আর কখনো বা মানুষের প্রতি দেখা দিয়েছে প্রগাঢ় প্রেম।

কিন্তু গদ্যকাব্য পর্যায়ে এসে সেই কবিকেই দেখা গেল রোমান্টিকতা বিরোধী কঠিন বস্তুজগতের কবিরূপ। তাই আকবর বাদশাকে তিনটাকা মাইনের ছেঁড়া ছাতি মাথায় হরিপদ কেরাণীর পাশে এসে বসিয়েছেন। এই অতি সহজ ঘটনাটা কবি খুব সহজেই সেরেছেন, তা নয়। 'কারুকৌশল বর্জিত, নিরলংকার বিরল সৌষ্ঠব, অযত্ন গঠিত,'[৬] সাধারণ গদ্যেই তাকে প্রকাশ করেন। শুরু হল গদ্যকাব্যের ও কথ্যভাষার যুগ।

অবশ্য কথ্যব্যবহার এখান থেকে ব্যাপকতর হলেও রবীন্দ্রকাব্যে গোড়া থেকে নানাভাবেই তার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া, যদিও, পুনশ্চের ভূমিকা ও সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থের প্রবন্ধে গদ্যকাব্য ও তার ভাষারীতি নিয়ে যা বলেছেন 'শ্যামলীর দু'বছর পরে 'পুনশ্চের' পুহস্থপাড়াকে[৭] সমর্থন করে 'বাংলাভাষার পরিচয়' গ্রন্থে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে ভাষার কৌলিন্য বাঁচানোর নামে মাধুর্যতা ও চলিতরূপকে 'দুইমুখো' করে রাখার গোঁড়ামীকে অসাধু বলে অভিহিত করেন এবং 'অচিন ডাকে নদীর বাঁকে' বাউল গানটির একটি সাধুরূপ রচনা করে চলিত ভাষার সঙ্গে তার সহজ ব্যবধানটি পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করে, পদ্যভাষায় উভয় রূপের স্বতন্ত্রমর্যদা দান করেছেন।[৮]

তাই বলে এ ধারনা ঠিক নয় যে, 'পুনশ্চ' তথা গদ্যকাব্য-পাঠের এই গৃহস্থ পাড়ার ভাষা তথা চলিত রূপের ব্যবহার এই প্রথম। বরং বলা যায় এই পর্যায়ে যাকে পাই সেটা রবীন্দ্র-কাব্য ধারায় বিশিষ্ট একটা রূপ মাত্র।[৯] আসলে এর প্রয়োগ 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকেই—ক্রিয়াপদ ও একটি দুটি চরণে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ছবি ও গান'—থেকেই গোটা কবিতায় চলিতরূপটা গৃহীত হতে দেখা গেল। এরপর 'কড়ি ও কোমলে'ও পাওয়া যায়। মাঝখানে বিরতির পর 'ক্ষণিকাতে' গিয়ে আবার স্বাভাবিকভাবে চলিত ভাষার সন্ধান মেলে। তারপর 'শিশু' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত চলিত ব্যবহারের প্রবাহ অক্ষুন্নই ছিল বলা যায়। তবে ভাষারূপটা দীর্ঘকাল একটানা চলে আসেনি।

---

৬. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা ৫ম সংস্করণ, ১৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৭. পুনশ্চ, কোপাই।

৮. বাংলা ভাষার পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৯-৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৯. 'রবীন্দ্রকাব্যেই অন্যত্র ভাষার গৃহস্থালী আছে। চৈতালি, ক্ষণিকা ও খেয়া কাব্যের অধিকাংশ কবিতার ভাষায় ও ছন্দে ভাষার গৃহস্থালী, বিষয়েও।'
; রবীন্দ্র-সরণী, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ২৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আলোচনার স্থবিধার জন্যে রবীন্দ্র-পদ্যভাষায় চলিত রূপটাকে কয়েকটা ভাষান্তরে ভাগ করা হচ্ছে—

(ক) প্রথমস্তর, ছবি ও গান—ক্ষণিকা—শিশু,

(খ) দ্বিতীয়স্তর, গীতাঞ্জলি—পলাতকা—পরিশেষ,

(গ) তৃতীয়স্তর, পুনশ্চ—পত্রপুট—শ্যামলী,

(ঘ) চতুর্থস্তর, আকাশপ্রদীপ—আরোগ্য—শেষলেখা।

প্রথমস্তরে মোট ষোলখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ আছে। এগুলোর মধ্যে সাধারণত চলিত রূপের কবিতা 'ক্ষণিকা' ও 'শিশু'তেই মেলে। কিছু কম আছে 'ছবি ও গান,' 'কড়ি ও কোমল,' এবং 'খেয়া'তে। তবে এগুলোতে মিশ্র ও সাধুভাষার কিছু কবিতাও আছে, সংখ্যায় সেগুলো অল্প। বাকি, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী, 'কথা ও কাহিনী,' 'কল্পনা,' 'নৈবেদ্য,' 'স্মরণ,' ও 'উৎসর্গে' চলিত ব্যবহার দু-একটি ক্রিয়াপদে কিংবা একটি দুটি চরণেই সীমাবদ্ধ। তাদের ভাষারীতিও সাধু অথবা সাধুঘেঁষা। অবশ্য ছবি ও গানেই প্রাচীন কাব্যভাষা অনেকটা সহজ রূপ নিয়েছে।[১০]

দ্বিতীয়স্তর 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'পরিশেষ পর্যন্ত। এর মধ্যে এগারটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। এই স্তরের মধ্যে চলিত ব্যবহার কম আছে কেবল 'লেখন' ও 'বনবাণী'তে। এ ছাড়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা, পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, 'পূরবী', ও পরিশেষে কথ্য ব্যবহার যথেষ্ট উন্নত। এ সব কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সাধুরূপের কবিতা নেই বল্লেই চলে। অবশ্য কোন কোন কাব্যগ্রন্থে কিছু বেশি আছে।

তৃতীয়স্তর গদ্যকাব্যের যুগ। 'পুনশ্চ' থেকে 'প্রহসিনী' পর্যন্ত এগারটি গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য প্রায় একই মেজাজে রচিত। অবশ্য পরিশেষের শেষদিককার কবিতা থেকেই ভাষায় এই পর্বের বিশিষ্টতা কিছু কিছু দেখা দিয়েছে। মোটমুটি এখান থেকেই এইরূপটিকে অনুসরণ করেই বর্তমান সাহিত্যে 'আধুনিক কবিতার' সূচনা।

চতুর্থস্তরে, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে ও 'শেষলেখায়' চলিত ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এখানে পদ্য ভাষায় কিছু কিছু সাধু ক্রিয়ার ব্যবহারও চোখে পড়ে, তবে তা খুবই নগন্য। ভাষারূপটা তাই কিঞ্চিত মিশ্র,—তবে কথ্য ঘেঁষা। কোন কোন কবিতা প্রায় গোটাটাই কথ্যে লেখা। এই পর্বে রচিত একমাত্র 'ছড়া' গ্রন্থই ব্যতিক্রম। কারণ চলিত প্রয়োগে এর বিশুদ্ধতা এভাষা শিশু, শিশু-ভোলানাথ প্রভৃতির ভাষারূপটাকেই মনে করিয়ে দেয়।

১০. রবীন্দ্র কাব্যভাষা: ডঃ সুনন্দা দত্ত, ১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এখন এই স্তর পরিকল্পনাটিকে রেখাচিত্রে এই ভাবে নির্দেশ করা চলে—
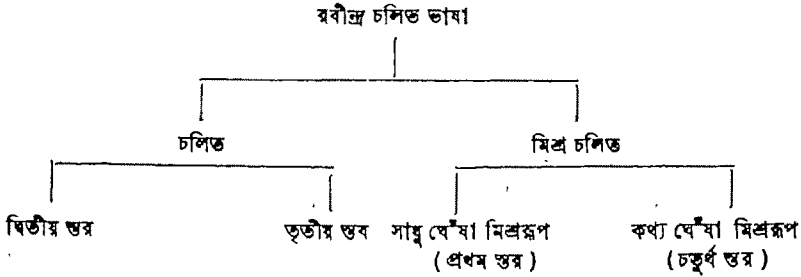
অতএব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে চলিত রূপের একটা সুষ্ঠ ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলির অর্দ্ধেকের বেশিই চলিত ও মিশ্র চলিতে লিখিত। তাঁর কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই এর প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে—

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে—
গান কেই শোনে কেউ শোনে না।
ঘুরে বেড়ায় জগৎ-পানে চেয়ে—
তারে কেউ দেখে কেউ দেখে না।
সে যেন গানের মতো প্রাণের মতো শুধু
সৌরভের মতো উড়ছে বাতাসেতে,
আপনারে আপনি সে জানে না,
তবু আপনাতে আপনি মেতে।[১০ক] [পাগল, ছবি ও গান]

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,
নাইকো হাটে গোল,
ওরে কবি, এইখানে তোর
কুটিরখানি তোল্।
ধুয়ে ফেল্‌রে পথের ধুলো
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা,
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বোস্ রে হেথায়
সারা দিনের শেষে
তারায় ভরা আকাশ তলে
সব পেয়েছি'র দেশে।

[সব-পেয়েছি'র দেশে, খেয়া]

১০ক. কবিতার অংশবিশেষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ 'রবীন্দ্র রচনাবলী' থেকে গৃহীত

এখান থেকে চলিত ভাষা নিজস্ব স্বভাবে এগিয়ে চলে। চলিত রূপের ওপর কবির যে কিছু দখল এসেছে, প্রকাশ-শৈলীর মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষণিকার[১১] মুখের ভাষার রূপটা খেয়াতে কেমন মুখের ভাষার আরও নিকটবর্তী হয়েছে।[১২]

আবার এই রূপটাই গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির মধ্যে সংগীতধর্মী হয়ে উঠেছে—

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
পুণ্য করো
দহন দানে।
আমার এই
দেহখানি
তুলে ধরো।
তোমার ঐ
দেবালয়ের
প্রদীপ করো।
নিশিদিন
আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
(গীতালি)

আবার ছড়াজাতীয় কবিতায় লৌকিকছড়ার ভাষার স্বাভাবিকতার স্বাদ কিছুটা পাওয়া যায়। যেমন—

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়,
কোথা পাবে পাখা সে?

১১. ডঃ সুনন্দা দত্ত, রবীন্দ্র-কাব্যভাষা, ৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১২. ডঃ সুনন্দা দত্ত, রবীন্দ্র-কাব্যভাষা, ৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গাল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার,—
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।
(তালগাছ, শিশু ভোলানাথ)

ছড়ার এই জাতীয় অনাড়ম্বর রূপটা 'শিশু' থেকেই বর্তমান। তারপর 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' এবং 'ছড়া' গ্রন্থে ও তা বিধৃত।

গদ্য কাব্য পর্যায়ে এই স্বাভাবিকতার আর এক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কাণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি, মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাউ পাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার। (বাঁশি, পুনশ্চ)

গদ্যের ঋজুতায় এ কবিতার ভাষা এত স্বচ্ছ যে একে কবিতা বলে ভ্রম হয়।[১৩] তবু এ গদ্য, সে গদ্য নয়।[১৪] এর সঙ্গে শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তির মিলনে ভাষায় একধরণের গাম্ভীর্যতা দেখা দেয়। যেমন—

১৩. শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় এদের কবি তাই বলতে চাননি বলেছেন : রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা গদ্যেরই এক বিশেষ চঙ, তাঁহার বিচিত্র গদ্যরীতির ইহা একটি অভিনব নিদর্শন। —দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র-সরণী', ওর ভাষা গ্রন্থে পাড়ার ভাষা, ৩১৪ পৃষ্ঠা।

১৪. বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল।

পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান—
বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হু হু করে,
মরা-দিনের-কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার
গুমরে ওঠে প্রেতের কণ্ঠে সারা দুপুর বেলা।
মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে
হাওয়ায় হাঁপনি।
হঠাৎ হানে বৈশাখী তীব্র বর্বরতা
ফাল্গুন দিনের যাবার পথে।

(২৪, জন্মদিনে)

ভাষার এই রূপটা এবং এর বাণীবিন্যাসরীতি আধুনিক কবিতায় গৃহীত হয়েছে।[১৫]

রবীন্দ্র-পদ্যভাষায় এমন প্রসন্ন চলিতরীতির পাশেই আবার কেমন এক অবিন্যস্ত সাধু-চলিতে মিশ্রিত পদ্যভাষাও চোখে পড়ে। গোড়ার দিককার ভাষায় এটার ঝোঁক বেশি। পরে অবশ্য কম। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, পুনশ্চের ভূমিকায় পদ্যভাষা সম্বন্ধে কবির সিদ্ধান্ত পরবর্তী কাব্য গ্রন্থে লঙ্ঘিত হয়েছে, যেটা তাঁর কোন চলিত গদ্যে নেই। যদিও বাঙলা কাব্যে সাধুতে-চলিতে মিশ্রিত করা অনিয়ম বলে কোন কালে গণ্য হয়নি। কিন্তু তিন দশকের বাঙলা পদ্য ভাষায় প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ[১৬] এবং তাঁর প্রায় তিন বছর পর বুদ্ধদেব বসুর[১৭] সক্রিয় ভূমিকায় পদ্য ভাষায় যে সংযম দেখালেন আধুনিক কবিতায় আজো তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত নিজের বক্তব্যে অটল থাকতে দেখা যায়নি। সেইটাই বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। যেমন—

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে?
তুমি চিনিতে নারিবে, বুঝিতে নারিবে মোরে।
আমি কেঁদেছি হেসেছি, ভালো যে বেসেছি
এসেছি যেতেছি সরে
কী জানি কিসের ঘোরে।

(উচ্ছৃঙ্খল, মানসী)

---

১৫. কেউ কেউ তাই রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যের মধ্যে আধুনিক জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার একটা লোভ দেখতে পান। দ্রষ্টব্য-রবীন্দ্র কাব্যে গোধূলী, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য) কিন্তু আধুনিক কবিদের সুনির্দিষ্ট পথ লাভের আগেই রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, চিররূপের বাণী শিশুতীর্থ-এর মত প্রথমশ্রেণীর আধুনিক কবিতাও লিখেছেন।

১৬. দ্রষ্টব্য—পুনশ্চের, ভূমিকা।

১৭. কবি বুদ্ধদেব বসু প্রবর্তিত আধুনিক কবিতার ছ'টি বিধি।

মানসীর এই কবিতায় সাধু ক্রিয়াপদের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। যেগুলো সহজেই পরিহার করা যেত। কেননা, ছন্দ-প্রয়োজনে সর্বদা এই মিশ্রণপ্রথা চালু রাখা শ্রুতিমুখকর হয় না, এটাই তার প্রমাণ। অথচ সাধুভাষার চরমোৎকর্ষের নিদর্শনও এই কাব্যের 'মেঘদূত' বা অহল্যার প্রতি' কবিতায় পাওয়া যায়।[১৮]

আবার—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই বারে বার।
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

(২০ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি)

সংগীতের সুরধর্মিতার মধ্যে সামান্য মিশ্রণ অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু গদ্যচ্ছন্দের রাজ্যে এই রূপকটাকে আশা করা যায় না। যেমন—

জয় করেছিনু মন, তাহা বুঝি নাই,
চলে গেনু তাই,
নত শিরে।
মনে ক্ষীণ আশা ছিল, ডাকিবে সে ফিরে
মানিল না হার,
আমারে করিল অস্বীকার।
বাহিরে রহিনু খাড়া
কিছুকাল, না পেলেম সাড়া।
তোরণদ্বারের কাছে
চাঁপাগাছে
দক্ষিণ বাতাসে থরথরি
অন্ধকারে পাতাগুলি উঠিল মর্মরি।

(মুক্তি, বীথিকা)

এখানে 'করেছিনু', 'গেনু', 'রহিনু', 'উঠিল', 'ডাকিবে'—প্রভৃতি সাধুক্রিয়া ও কাব্যিক ক্রিয়াপদ এবং 'তাহা', 'আমারে' 'থরহরি' ইত্যাদি কাব্যিক শব্দের বহুল ব্যবহারে ভাষায় কবি-প্রদত্ত ভাবার-সংহতি রক্ষা পায়নি। অথচ বীথিকার কাল পুনশ্চ শেষসপ্তক এবং পত্রপুট—শ্যামলীর অন্তবর্তী কাল।

---

১৮. ডঃ গুণময় মান্না, রবীন্দ্র-কাব্যরূপের বিবর্তন রেখা (১ম প্রকাশ), ৫০৩.পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অথচ এই মিশ্ররূপের পাশে পাশেই আবার চলিত-ব্যবহার কত সংযম রক্ষা করে চলেছে, যার অজস্র প্রমাণ আগেই দেওয়া হয়েছে। 'শেষ লেখা'তে এসেও কবিমানসের এই বিশিষ্ট রূপটা আশ্চর্যভাবে প্রায় গোটা কবিতাতেই অক্ষুণ্ণই ছিল। যেমন—

জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে।
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।

(সাত, শেষলেখা)

এমন সাধুগন্ধী চলিত রূপটা এর আগেও রবীন্দ্রকাব্যে মেলে। পূরবী, মহুয়া, পুনশ্চ (শিশুতীর্থ, চিররূপের বাণী, তীর্থযাত্রী), শেষ সপ্তক (পনেরো, ছাব্বিশ) পত্রপুট, (যোল, পনেরো) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুতরাং এখন সহজেই একটা প্রশ্ন এসে পড়ে, রবীন্দ্র-পদ্যভাষায় চলিত ব্যবহারের যখন একটা সুষ্ঠু প্রবাহ রয়েছে, সেইখানে 'পুনশ্চের' ভূমিকা কোথায়? ভাবে না রূপে?

জীবনের শেষপর্যায়ে পৌঁছিয়ে সুরেরগুরু রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বেসুরো, ছন্দে পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলী গদ্যকাব্য পরিবেশন করলেন। এদের ভাষা[১৯] ও ভাব—উভয় দিক থেকেই অনেকটা নোতুন।

এগুলোর ভাবগত দিক থেকে কবিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়েছে এই ভাবে : 'কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূর ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়েনা।'[২০]

কবির বক্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, কাব্য এতকাল প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বস্তুজগত থেকে দূরে ছিল। কিন্তু গদ্যকাব্য—পুনশ্চ পর্যায়ে দেখা যায়, এই শেষ দিনগুলিতে গ্রামের লোকেরা কবির অনুভূতি থেকে দূরে পড়েনি, আছে তাতে মিশিয়ে। লোকজীবনের বাণীর দিক দিয়ে নয়, কিন্তু রসসৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এই বইয়ের নানা

১৯. ডঃ সুনন্দা দত্ত, রবীন্দ্র কাব্যভাষা, ১২৬—১৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ, কাব্য ও ছন্দ দ্রষ্টব্য।

কবিতায়, সাধারণ কয়েকটি নরনারী, বালক এবং তুচ্ছ প্রাণীরাও। এর মধ্যে আছে, 'মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি,' আছে বালক তিনু, আছে ছেলেটা, সহযাত্রী, হিরণ মাসির মা-মরা বোনপো, 'ক্যামেলিয়া'র সাঁওতাল মেয়েটি, আছে শালিখটা, সাধারণ মেয়ে, আধবুড়ো একজন হিন্দুস্থানী, কিনুগোয়ালার গলির সেই বাঁশিওয়ালা, সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি এবং 'উন্নতি' কবিতার নায়ক আমি।'[২১]

'পত্রপুট-কাব্যেই মনে করিয়ে দেয় কবির শেষদিনকার সেই বিখ্যাত 'ঐকতান' কবিতার কথা। তাতে ডাক দিয়েছেন তিনি আর-এক কবিকে, যা নিজে জুগিয়ে যেতে পারলেন না সেই বাণীর জন্যে। এখানে সাধারণ ভাবে নিখিল মানবের মধ্যে থেকে বলছেন, সেখানে এই বেদনা নিয়েই গেছেন তিনি মানবের আরোও বিশেষ শ্রেণীতে, দুর্গতদের সীমানায়। বলেছেন কৃষক, তাঁতি, কুলিমজুর প্রভৃতি নিম্ন সাধারণের কথা, যাদের জীবনে তিনি নিজে পাননি—'প্রবেশের দ্বার'।[২২]

বস্তুত, এতগুলো সাধারণ চরিত্রকে নিয়েই কবি 'অনেক গদ্য-কাব্য' লিখেছেন 'যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে' পারতেন না। 'তাদের মধ্যে'—যে একটা 'সহজ প্রাত্যহিক' ভারকে পেয়েছেন, 'হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং এই জন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে' করেছেন।[২৩]

কবির এই দাবী অনেকটা সত্যি হলেও, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন যে গুরুদেব এই প্রাত্যহিক-সংসারকে ইতিপূর্বে গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে, নাটকে প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেছেন। 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' গানে তথাকথিত সর্বহারাদের প্রতি সমবেদনাই ব্যক্ত হয়েছে। 'দুর্ভাগা দেশ যাদের অপমান' করেছে, সেই দেশের মাটি ভেঙে যারা চাষ করছে, পাথর ভেঙে যারা পথ কাটছে, যারা বারো—মাস খাটছে—রৌদ্রজলে, দু'হাতে ধুলা লাগিয়ে যারা জীবন যাত্রা চালাচ্ছে—সবাই এরা এক শ্রেণী, এবং দেবতা গেছেন এদের মধ্যে—সেইখানেই এদের সঙ্গে মিলে কাজ করলে তাই দেবসেবাই হয়ে যায়। 'গোরায়' নিপীড়িত জনগণের ধুলার আসনতলেই গোরাকে মিলতে হয় শেষ পর্যন্ত। 'রক্তকরবী' নাটকে শোষক শ্রেণীর সাথে শোষিত মানুষের সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। এই অন্ত্যজ মেহনতি জনমানবের জয় ঘোষনাই 'কালের যাত্রা'র মূলকথা।[২৪]

অতএব, কোথায় বা নেই এই বস্তুমুখী প্রাত্যহিক জগতের কঠিন সংগ্রামের কথা। গদ্যকাব্যে তারই আর এক প্রকাশ মাত্র। সুতরাং গদ্যকাব্যে বিষয়গত দিকটা, রূপগত দিক থেকে অনেকটা গৌন হয়ে পড়ে।

---

২১. শ্রীসুধীর চন্দ্র কর, জনগণের রবীন্দ্রনাথ, ৪৩-৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২২. জনগণের রবীন্দ্রনাথ, ৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ, ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৪. শ্রীসুধীর চন্দ্র কর, জনগণের রবীন্দ্রনাথ।

আসলে, গদ্যছন্দই রবীন্দ্রকাব্যে যথার্থ নোতুন রূপ।[২৫] বাঙলা সাহিত্যেও প্রায়। কেননা, কবিরাজ কৃষ্ণ রায় দুটির বেশি গদ্য কবিতা লেখেননি বলে, গদ্যছন্দের প্রচার এবং প্রসার সম্ভব হয়নি।

এই নোতুন রূপ সম্পর্কে কবি বলেন: একদা কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমনকি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ্য করে এমন সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম।'[২৬] কবির এমন কুণ্ঠার কারণ তিনি বিদেশী এবং তাঁর কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না। তবু ইংরেজ রসজ্ঞান তাতেই কাব্যের রস পান। তখন কবির মনে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকল না।[২৭]

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত নোতুন ছন্দ-প্রবর্তনের সমর্থনে কবির বক্তব্যের সঙ্গে এক মত হয়েও, এর ভাষারীতি সম্পর্কে দ্বিধাহীন চিত্তে সকলেই কবিপক্ষ সমর্থন জানাবেন, তা মনে হয় না। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে[২৮] পদ্যভাষার সলজ্জ ও সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথাকে হয়ত দূর করা গেছে। কিন্তু কবি যখন বলেন—

> কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
> সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলেজলে,
> যেখানে ভাষার গান আর ভাষার গৃহস্থালী।'
>
> (কোপাই, পুনশ্চ)

তখন, গদ্যকাব্যে ভাষার এই একচেটিয়া গৃহস্থালীর দাবীকে কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কারণ, প্রথমত, এখানে সব কবিতাতেই গৃহস্থপাড়ার ভাষা নেই; দ্বিতীয়ত, অন্যত্র ভাষার গৃহস্থালীর দাবীকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমতঃ গদ্যকাব্যের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাগুলোর কোনটারই ভাষা আটপৌরে গৃহস্থ-পাড়ার ভাষা নয়। স্বাদে এবং সুরে তারা অন্তজাতের। যেমন—

> বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
> অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলি বিলীন উচ্ছিষ্ট;
> তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
> লুপ্ত নদীর বিস্মৃতি বিলগ্ন জীর্ণ সেতু,

---

২৫. 'শেষের কবিতা'র পর গদ্য-কবিতা। তাহা দেখিয়া "নূতন" কবিতার নবীন কবিরা বাক্যহারা হইয়া গেলেন।'

: ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (১৯৬৩ সংস্করণ), ২৫৭ পৃঃ।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ, ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ,

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনশ্চ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপঙক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে—
ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল,
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র—উচ্চারণ,
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয় নিনাদ।

এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত; তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি, অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।'

[শিশুতীর্থ, পুনশ্চ]

এটা একটা প্রথম শ্রেণীর গদ্যকবিতা। অথচ এর ভাষায় কোথাও গৃহস্থালী রূপটা চোখে পড়ে না।[২৯] বরং কি, আশ্চর্য ক্ষমতায় কবি এই কাব্যে—'ধূলিবিলীন,' 'বিস্মৃতিবিলগ্ন,' সর্প বিবরছিদ্রিত, সোপানপঙ্‌ক্তি, গুহাবিদারণ, ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী, গদগদকলমুখর, উচ্চণ্ড, যৌবনমদবিলসিত, আত্মসান্ত্বনার, স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত, নক্ষত্রসংকেতবিদ্‌, সন্ধ্যাভ্রশিখর, মারণ-উচাটন-মন্ত্র, তালীকুঞ্জতল, ভক্তিনম্রশির, চীনাংশুক, লতাজালজটিল প্রভৃতি সাধুগন্ধী দীর্ঘপদী সমাসবদ্ধ ও তৎসম শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্যে চলিত ভাষার শোষণশক্তির পরিচয় দেন।

পরবর্তী দশকে অনেক আধুনিক কবিই রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় ধ্রুপদীরীতির অনুসরণ করেন।[৩০]

দ্বিতীয়ত, গৃহস্থপাড়ার ভাষা বলতে কবি যদি আটপৌরে চলিত বা মুখের ভাষাকেই বুঝিয়ে থাকেন, তবে সেদিক থেকে পুনশ্চ বা গদ্য কাব্যই একমাত্র নয়,—অন্যতম মাত্র। অথবা অর্জিত কল্পরূপ-মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তার প্রমাণ মিলবে—

"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে হবে। আমি দেখছি মোট
এক-শো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই!"
বিনু বললে, "এই
ইস্টেশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেব তবে"

২৯. 'এ ভাষা যে গৃহস্থগণ বলিয়া থাকে তাহাদের নিবাস স্বর্গলোকে সপ্তর্ষিদের পাড়ায়।'
: প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র সরণী, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

৩০. কবি অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'আজন্ম সুরভি,' বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী,' জীবনানন্দ দাসের 'বেলা অবেলা কালবেলা,' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ এই জাতীয়।

এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,—
আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে,—
"কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি!
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও! ঘোচাব নষ্টামি।"
(ফাঁকি, পলাতকা)

এ একেবারে খাঁটি গৃহস্থের মুখের কথা। এই রকম—
'অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা—সাতটা গাড়ি;
ছিল কুকুর; ছিল বিড়াল; নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ-সাতজোড়া;
দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাশি।
—আর ছিল এক মাসি।
(মায়ের সম্মান, পলাতকা)

এগুলো যদি গৃহস্থপাড়ার ভাষা না হয়, তবে কোন্ পাড়ার ভাষা? এর শব্দ ব্যবহারেই নয়, মুখে মুখে উচ্চারিত ইডিয়মগুলোও এতে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। অথচ অন্ত্যমিল থাকলেও বাক্‌ভঙ্গীর স্বাভাবিকত্ব এতটুকু এদিক-ওদিক হতে পারেনি। গদ্যছন্দ না হলেও গদ্যের ঋজুতার প্রমাণ এতে লক্ষ্য করা যায়।

শুধু পলাতকাতেই নয়, তারও আগে 'ক্ষণিকা', 'শিশু' থেকেই এই রূপটা ফুটে উঠেছে। তারপর পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, পরিশেষ পর্যন্ত চলে এসেছে। শেষপর্যায়ে ছড়ার ছবি, খাপছাড়া, আকাশ প্রদীপ, সানাই, জন্মদিনে, ছড়া প্রভৃতিতেও তার প্রমাণ মেলে,—মাঝখানে গদ্যকাব্য।

অতএব, ভাষার গৃহস্থালীর দিক থেকে গদ্যকাব্যের স্বতন্ত্র-মূল্য অবশ্যই নির্দিষ্ট থাকবে, গদ্যের ঋজুতায় এই স্তরে এ ভাষা আরও বেশি ধারালো ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবু, অন্যত্র, অনেক কাল আগেই যে কবিভাষা 'সকল অলংকারহীন সাজের অহংকার'[৩১] পরিত্যাগ করতে পেরেছে কোন কোন কবিতায় তা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং এখন দাবী করা যেতে পারে যে, অকথিত আটপৌরে জগতের বক্তব্য উপস্থাপনায় চাইতে 'গদ্যছন্দ' ও 'গদ্যকবিতার' প্রবর্তনাই এই পর্বে কবির বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

---

৩১. আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার,
তোমার কাছে রাখে নি আর
সাজের অহংকার।
(১২৫, গীতাঞ্জলি)

॥ চলিত-ব্যবহার হিসাবে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের একটি তালিকা ॥

সাধুভাষা বা সাধুঘেঁষা মিশ্ররূপ	সাধুভাষা প্রধান (কিছু ক্রিয়াপদ চলিত)	চলিত রূপের গোটা কবিতাও আছে, সাধু-মিশ্ররূপের কবিতাও আছে	চলিত ভাষা (অধিকাংশ কবিতাই চলিতরূপের)		চলিত ঘেঁষা মিশ্ররূপ (কোন কোন কবিতা গোটাই চলিত বা আংশিক চলিত)
মানসী,	সন্ধ্যা সংগীত,	ছবি ও গান,	ক্ষণিকা,	শ্যামলী,	প্রান্তিক,
সোনারতরী,	প্রভাত সংগীত,	কড়ি ও কোমল,	শিশু,	খাপছাড়া,	সেঁজুতি,
চিত্রা,	নৈবেদ্য,	খেয়া,	গীতাঞ্জলি,	ছড়ার ছবি,	প্রহসিণী,
চৈতালী,	স্মরণ,	বলাকা,	গীতিমাল্য,	আকাশ প্রদীপ,	রোগশয্যায়,
কথা ও কাহিনী,	উৎসর্গ,	পরিশেষ,	গীতালি,	নবজাতক,	আরোগ্য,
কল্পনা,			পলাতকা,	সানাই,	জন্মদিনে,
লেখন,			শিশু ভোলানাথ,	ছড়া,	শেষলেখা,
বনবাণী,			পূরবী,		
			মহুয়া,		
			পুনশ্চ,		
			বিচিত্রিতা,		
			শেষসপ্তক,		
			বীথিকা,		
			পত্রপুট,		

সৈয়দ সুলতান ঃ জন্মস্থান এবং সময়

ডক্টর মযহারুল ইসলাম
ভিজিটিং প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে অনেকগুলো 'যদি', 'কিন্তু' এবং 'সম্ভাবনা'র ওপর ভিত্তি করে—বিশেষ করে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বহুক্ষেত্রে এ-কথা সত্য। তাই চণ্ডীদাস সমস্যা, কৃত্তিবাসের স্থান-কাল গত সমস্যা, মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক কোন্ সুলতান এ-সমস্যা, সগীরের সময়কালের সমস্যা ইত্যাদি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। অনেক কবি সম্পর্কেই অভ্রান্ত প্রমাণপত্রী আমাদের হস্তগত হয়নি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সযত্নসতর্কতায় ইতিহাসগত তথ্যসমূহ রক্ষা করেননি—অনেক সময় সতর্কতা সত্বেও আবহাওয়ার কারণে বা কীটের প্রকোপে প্রাচীন উপাদান বিনষ্ট হয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনেকটা আকস্মিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যদি নেপালে না যেতেন, যদি বাঁকুড়ার গোশালায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পুঁথিটি আকস্মিকভাবে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জনের হস্তগত না হতো তাহলে ইতিহাস অন্যরূপ হতো, সন্দেহ নেই। এসব ছাড়াও ইতিহাস প্রণেতাদের শুধুমাত্র বস্তুগত ও তথ্য-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বহুক্ষেত্রে সমস্যাকে আরো জটিল করেছে। কারো প্রবণতা আলোচ্য কবিকে প্রাচীনতার দিকে ঠেলে নিতে কারো আধুনিকতার দিকে, কারো বা বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিকতার প্রতি। পূর্ণাঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবও অনেক সময় বেদনাজনকভাবে পীড়াদায়ক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে অনেক ভার এবং দায় থেকে মুক্তিকরা প্রয়োজন।

'নবীবংশ' 'জ্ঞানপ্রদীপ' 'পদাবলী' এবং 'জয়কুম রাজার লড়াই' কাব্যগুলোর রচয়িতা সৈয়দ সুলতানকে নিয়ে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে যাঁরা প্রথম আলোচনায় অগ্রসর হন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের নাম উল্লেখযোগ্য। "কবি সৈয়দ সুলতান" এই শিরোনামে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ১৩৪১ সালের ২০শে আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে। প্রবন্ধটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে বা সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (ত্রৈমাসিক) একচত্বারিংশ ভাগে প্রকাশিত হয়। ডক্টর হক সৈয়দ সুলতানের আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক অংশটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি করে প্রমাণের প্রয়াস পান যে, কবি চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মবিবরণীতে পরাগলপুর বলে কোন গ্রামের উল্লেখ সৈয়দ সুলতান করেন নি, উল্লেখ করেছেন "লস্করেরপুর খানি", অর্থাৎ লস্করপুর গ্রামের নাম। ডক্টর এনামুল হকের মতে পরাগল খান ছিলেন হুসেন শাহের লস্কর এবং এই লস্কর নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন, বিধায় বিধায় কবির উল্লেখিত লস্করেরপুর আসলে পরাগলপুর, যা কিনা

চট্টগ্রামের একটি গ্রামের নাম। ডক্টর হকের এই সিদ্ধান্ত যে অনুমানমাত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই আরেকজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। ১৩৫১ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৫১শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় 'কবি সৈয়দ সুলতান' এই শিরোনামে অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বললেন যে, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমায় তরফ পরগণায় লস্করপুর নামক একটি গ্রাম আছে এবং এই গ্রামের সৈয়দ বংশ বেশ প্রাচীন ও বনেদী বংশ বলে খ্যাত। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে লস্করপুরের সৈয়দ বংশের সৈয়দ আব্দুল আগফার চৌধুরী "তরফের ইতিহাস" নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে সৈয়দ বংশের 'বংশলতা' আছে এবং সেখানে সৈয়দ সুলতান যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তার উল্লেখও রয়েছে। সুতরাং অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেন, সৈয়দ সুলতানের আত্মবিবরণীতে যে "লস্করের পুরখানি আলিম বসতি, মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্তাত" বলা হয়েছে, সেখানে অনুমানের কোন অবকাশ নেই। কবি শ্রীহট্টের উক্ত গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য সৈয়দ সুলতানের একটি পদাবলী থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

অজপা পঞ্চশব্দ করি ভালে।
শ্রীহট্ট নগরে বাহএ একতালে॥
কহে সৈয়দ সোলতানে মনে হাঙ্কারি।
পহুদাতা ছোলতান পরমভিখারি॥

শ্রীহট্ট নগরের এই স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় সৈয়দ সুলতান যে শ্রীহট্টের লস্করপুরের গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন, সেই দাবী আরো জোরালো হয়েছে বলে শ্রী ভট্টাচার্য মনে করেন।

আশা করা গিয়েছিল যে, ডক্টর আহমদ শরীফ "সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ" শীর্ষক যে-গবেষণা গ্রন্থটি লিখে পি-এইচ-ডি অর্জন করেন, সেখানে ডক্টর এনামুল হকও অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মত-বিরোধের একটি সদুত্তর দেবেন। কিন্তু তিনি তা দেননি, বরঞ্চ তাঁর স্বভাব সুলভ পাণ্ডিত্য-গর্বী ভাষায় সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি সংক্রান্ত আলোচনার প্রারম্ভেই ডক্টর শরীফ এই বাক্যে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন, "সৈয়দ সুলতান যে চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী ছিলেন, তা আজকাল আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।" [ডঃ আহমদ শরীফ, সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৭২ (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯) পৃঃ ৪৮] অবশ্য আলোচনাটি সমাপ্তির পূর্বে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, "সৈয়দ সুলতান সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার লস্করপুর বাসী ছিলেন বলে দাবী করেন মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্য রত্ন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। কিন্তু আমাদের পরিবেশিত তথ্য তাঁদের দাবী সমর্থন করেনা।" (ডক্টর আ. শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯-৬০)।

ডক্টর শরীফের পরিবেশিত তথ্য যে যথেষ্ট নয় এবং তাঁর বক্তব্য যে জোরালোভাবে প্রণিধান যোগ্য হয়নি, এ কথাই প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন মুহম্মদ আসাদ্দর আলী তাঁর

"সিলেটের মহাকবি সৈয়দ সুলতান" প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সিলেট একাডেমী পত্রিকার ১৩৮৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় (এপ্রিল-মে ১৯৭৯) প্রকাশিত হয়। আলোচনাটি বেশ সুদীর্ঘ এবং যুক্তি নির্ভর। অবশ্য ডক্টর এনামুল হক ও ডক্টর শরীফের মধ্যে যেমন সৈয়দ সুলতানকে চট্টগ্রামবাসী প্রতিপন্নের একটি প্রবণতা আছে, তেমনি দুর্বলতা লক্ষণীয় জনাব মুহম্মদ আসাদ্দার লেখায়, সৈয়দ সুলতানকে সিলেটের লোক প্রমাণ করা চাই। তাছাড়া জনাব আলী সিলেটকে শ্রীহট্ট বলতে যেন কুণ্ঠিত, অথচ আমরা জানি খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীর মহারাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রলিপিতে লিখিত আছে "শ্রীহট্ট মণ্ডল সাতল বর্গ সম্বন্ধ আবেড়িকা সমেত" অর্থাৎ শ্রীহট্ট মণ্ডল বা বিভাগ অতল বা গভীর হ্রদশ্রেণী সমাকীর্ণ উপকূলীয় দ্বীপসহ—এখানে শ্রীহট্ট নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ৬০০ অব্দেও জলন্ধর রাজবধূ প্রতিষ্ঠিত মহাদেব মন্দিরে উৎসর্গ লিপিতে আছে—"শ্রীহট্টাবিষয়ভাঃ।" সুতরাং শ্রীহট্ট নামটি বেশ প্রাচীন। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হলেও সৈয়দ সুলতানের সময়েও এই নাম যে ছিল, তা তাঁর গানেই উল্লিখিত।

ডক্টর আহমদ শরীফ তাঁর গবেষণা গ্রন্থে চট্টগ্রামের কিছু কবির নামোল্লেখ করেছেন, যাঁরা সৈয়দ সুলতানের প্রসঙ্গ তাঁদের কাব্যে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। যেমন শেখ মুতালিব তাঁর "ফিকায়তুল মুসাল্লিন" শাস্ত্র কাব্যে বলেছেন :

নবীবংশে যেসকল প্রমাণ আছ এ।
পুনিতাক লিখিবারে উচিত না হ এ ॥

শেখ মুতালিব নবী বংশ পড়েছেন, কিন্তু নবীবংশের রচয়িতা সৈয়দ সুলতান এ কথা যেমন বলেননি, তেমনি এ কাব্যের রচয়িতা যে চট্টগ্রামের অধিবাসী তারও কোন উল্লেখ নেই। শেখ মুতালিবের পিতা ছিলেন শেখ পরাণ, তিনিও কবি ছিলেন, তাঁর দুটো কাব্যের নাম "নূরনামা" এবং "কায়দানি কেতাব"। "নূরনামায়" শেখ পরাণ বলেছেন :

ফাতেযাকে বিভা কৈল আলী মতিখান
নবী বংশে রচিছেন্দ সৈয়দ সুলতান।

শেখ পরাণ ও সৈয়দ সুলতানের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ ছিলেন এমন কোন আভাষ ইঙ্গিত পর্যন্ত শেখ পরাণ দেননি। শাহমীর মুহম্মদ শফী নামক আরেক জন কবি তাঁর নূরনামা কাব্যে বলেছেন :

কহেমীর শাহ সফী আমি দুঃখ মতি।
এহ লোক পরলোক সেই দুরগতি ॥
পিতামহ শাহ সৈয়দ জানহ দরবেশ।
কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ ॥

এই উক্তি থেকে ডক্টর শরীফ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কবির উল্লিখিত পিতামহ শাহ সৈয়দ আসলে সৈয়দ সুলতান। কিন্তু 'সৈয়দ' কেন 'শাহ' হয়ে গেলেন এবং পৌত্রই বা সৈয়দ

ছেড়ে কেন শাহমীর হয়ে গেলেন তার কোন ব্যাখ্যা জনাব শরীফ দেননি। পীর সৈয়দ হাসান যে সৈয়দ স্থলতানের পৌত্র তার প্রমাণও এই প্রতাপশালী গবেষণা গ্রন্থে অনুপস্থিত। গবেষণা গ্রন্থ হলেও জনাব শরীফের অনেক আলোচনায় যেমন, এখানেও তেমনি, সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার ধরণটি বেশ অনায়াস সাধ্য মনে হয়। ধরে নিলাম, এ'রা কবির পৌত্র ও প্রপৌত্র, কিন্তু তা থেকে কবি যে চট্টগ্রামবাসী তেমন প্রমাণ জনাব শরীফ তাঁর আলোচনায় উদ্ধার করেননি। তাঁর প্রদত্ত ছকেও সে প্রমাণ নেই, কোন সদুত্তরও নয়। অগত্যা জনাব শরীফের একমাত্র উদ্ধারকর্তা হিসেবে আমরা পাই একজন লিপিকরকে, নাম মুজফ্ফার। মুহম্মদ খানের "মোহাম্মদ হানিফার লড়াই" পর্বের লিপিকর মুজফ্ফার পুথির একস্থানে বলেছেন :

স্থলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর।
কহেহীন মুজফ্ফার এজিদ উত্তর॥
মুই হীন অধম যে বুদ্ধি ক্ষুদ্র কহি।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ ধীর করে ছহি॥

অন্যত্র হলে জনাব শরীফ লিপিকর প্রমাদ বলে এই লিপিকরকে বাতিল করতেন, কিন্তু তাঁর নিজের প্রয়োজনেই জনাব শরীফের নিকট এই লিপিকর শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন। এখানে প্রশ্ন, এক স্থলতান নাম হলেই তিনি সৈয়দ স্থলতান হবেন এমন প্রমাণ কোথায়? দুই চক্রশালায় দৌহিত্রের ঘর হলেই একথা প্রমাণ হয় না যে সৈয়দ ও স্থলতানের ঘরও সেখানেই ছিল। মাতামহ ও নাতির ঘর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একস্থানে নয়, কেবল নাতির পিতা ঘরজামাই হলে ব্যতিক্রম ঘটে।

লালমতি সয়ফুল মুলুক কাব্যের কবি শরীফ শাহকেও ডক্টর শরীফ সৈয়দ স্থলতানের দৌহিত্র বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন। কবি শরীফ শাহ বলেছেন :

শাহ স্থলতান স্থত সর্বগুণে অলঙ্কৃত
তান পদে করিয়া ভকতি
কাজী মনসুর মানি তাহার তনয় জানি
শরীফ যাহার ভবতি।

আমরা অন্যত্র দেখেছি, সৈয়দ সহসা মীরশাহ হয়েছেন, এবার স্থলতানের পুত্র কাজী মনসুর এবং তদীয়পুত্র শরীফশাহ। মুসলমানদের বংশ পরম্পরায় এমন দ্রুত পরিবর্তন এবং গড়মিল শুধু বিস্ময়কর নয়, অবিশ্বাস্যও। অথচ ডক্টর শরীফ বিনাবাক্যে এই গড়মিল মেনেছেন এবং সিদ্ধান্তেও এসেছেন। সিদ্ধান্ত কোন তপস্যার ফসল নয়, যেন স্বপ্নে প্রাপ্ত কোন মন্ত্র। পরবর্তীকালে দেখবো, গদা হোসেন হয়েছেন খোন্দকার, সৈয়দের পুত্র কাজী, কাজীর পুত্র শাহ্ আবার খোন্দকার এসবের ব্যাখ্যা অনুপস্থিত, বিধায় গ্রাহ্য হতে পারে না।

একমাত্র "ফায়েতুল মুকতদী" ও "গুলে বকাউলী" কাব্যদ্বয়ের কবি মুহম্মদ মুকিমের উক্তিতে সৈয়দ সুলতান যে চক্রশালার, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কবি মুকিম বলেছেন :

এবে প্রণামিব আমি পূর্ব কবি জান।
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান ॥

এখানে "পীর মীর চক্রশালা" শব্দত্রয়ের পরে "সৈয়দ সুলতানের" ব্যবহার বিসদৃশ মনে হয়। সম্ভবত পীর মীর শব্দদ্বয়ের পর কোন একজন ব্যক্তির নাম ছিল এবং কবি সেই ব্যক্তি ও সৈয়দ সুলতান উভয়কেই প্রণাম জানিয়েছেন। পুঁথিটি আরও সযত্নে পড়ে দেখা দরকার এবং একাধিক পুঁথিতে চক্রশালা শব্দটি থাকলে তবেই এই পাঠ গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথা নয়। তা-ই-বৈজ্ঞানিক রীতি। তাছাড়া কবি মুকিমের সময় সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। ডক্টর শরীফ এই কবিকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি বলেছেন—যিনি মুকতদী কাব্যটি রচনা করেন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর উক্তিতে আছে :

ইংরেজ নৃপতি সে যে ফিরিঙ্গির জাত
চিরদিন ইন্দরাজ এথা মহীপাল
ভালে ভাল মন্দে মন্দ তস্করের কাল।

আমরা জানি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পীট্‌স ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট পাশের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানীর শাসন ছিল অরাজকতায় পূর্ণ। লর্ডওয়েলেসলী গভর্ণর জেনারেল (১৭৯৮—১৮০৫) হবার পর থেকে ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসী তাদের প্রশাসনের রজ্জুটি ধীরে ধীরে মজবুত করতে থাকে এবং বেন্টিঙ্ক (১৮২৮—১৮৩৫) ও ডালহৌসীর (১৮৪৮—৫৬) সময় এই প্রশাসন সমগ্র দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং সমাজে সংস্কার সাধনের পথ প্রশস্ত হয়। কবি যখন বলেন "চিরদিন ইন্দরাজ মহিপাল" এবং ভালোয় ভালো, মন্দের মন্দ ও তস্করের সবচেয়ে বড় শত্রু, তখন বুঝতে হবে, কবির সময়ে ইংরেজ প্রশাসন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই উক্তির প্রেক্ষাপটে মুকিমকে উনবিংশ শতাব্দীর কবি বলাই বোধ করি অধিক সঙ্গত, "তাঁর ঋতু বেদ চন্দ্রশত আশী আর নয়" উক্তি সত্ত্বেও। আর তাই উনবিংশ শতাব্দীর একজন কবির উক্তি ষোড়শ—সপ্তদশ শতকের কবির সময় ও বাসস্থান সম্পর্কে কতটা গ্রহণযোগ্য তা একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন মনে করি। মুকিমের দোহাই খুব বড় রকমের গুরুত্ব বহন করে না, যদিও ডক্টর হক ও ডক্টর শরীফের যুক্তিমালা তাঁর ওপরেই প্রায় সর্বাংশে নির্ভরশীল।

মুহম্মদ খান সহ অন্য যে সব কবি সৈয়দ সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সৈয়দ সুলতান যদি চট্টগ্রামের না হয়ে সিলেটের হন, তাতে সেই শ্রদ্ধা নিবেদনে কোন অসামঞ্জস্য দেখা দেয় বলে মনে করি না। সিলেটের সঙ্গে সেকালে চট্টগ্রাম ও রোসাঙ্গ রাজসভার যোগাযোগ যে ঘনিষ্ঠ ছিল, যাতায়াত ব্যবস্থা ও জল এবং স্থলপথে যে স্বাভাবিক ও সহজ ছিল, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা সৈয়দ সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাঁরা সবাই যে চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই কবি তা যেমন প্রমাণ-সাপেক্ষ, তাঁদের সময়-

কাল যেমন সন্দেহাতীত নয়, তেমনি তাঁরা সবাই চট্টগ্রামের কবি বলে প্রমাণিত হলেও তাঁদের শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্যে একথা প্রমাণ করে না যে, সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত লক্ষবপুর বা চক্রশালার অধিবাসী ছিলেন। সিলেটের কবি ও পীরকেও চট্টগ্রামের কবিরা শ্রদ্ধা জানাতে পারেন, তার জন্যে কবিকে চট্টগ্রামে হাজির করার কোনও প্রয়োজন দেখি না। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বর্ধমানের কবি জয়ানন্দ নবদ্বীপ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না।

অধ্যাপক শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সৈয়দ আব্দুল আগফার চৌধুরী প্রণীত ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭ খ্রীঃ) প্রকাশিত "তরফের ইতিহাস" তাঁর পূর্বপুরুষ স্থাপিত সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারে সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে রক্ষিত দেখেছেন এবং পরে এই পুস্তিকাটি দক্ষিণ কলিকাতার সন্তোষপুরে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে স্থান দিয়েছেন। আমি এখানেই পুস্তিকাটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি। পুস্তিকাটি সৈয়দ সুলতান সম্পর্কিত আলোচনা পর্যালোচনা আরম্ভের বহু পূর্বে প্রণীত। সুতরাং এই গ্রন্থে পণ্ডিতদের প্রয়োজন সিদ্ধের কোন রকম প্রভাব পড়েনি। মরহুম আগফার চৌধুরী নিজেদের বংশ লতিকা ও বংশ সম্পর্কীয় তথ্য ধ্বংস হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে তাঁদের নিজেদের বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং ইতিহাস হিসেবে এর যে কোন মূল্যই নেই, এমন রায় দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। ডক্টর আহমদ শরীফ এই গ্রন্থটি পড়েন নি, পড়লেও তার নামোল্লেখের প্রয়োজন মাত্র অনুভব করেন নি। অথচ ডক্টর শরীফ তাঁর গ্রন্থে পীর গদাহোসেন বলে সৈয়দ সুলতানের এক বংশধরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, যিনি ফেনী অঞ্চলে রাজ্য স্থাপনকারী দুঃসাহসিক শমসের গাজীকে একটি ঘোড়া ও একটি তরবারী দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। ডক্টর শরীফ স্বীকার করেছেন যে, আরাকান রাজই কবি সৈয়দ সুলতানকে এই তরবারী উপহার দিয়েছিলেন এবং উল্লেখিত ঘোড়াটি কবিকে প্রদত্ত আরাকান রাজের ঘোড়ার উত্তর পুরুষ। দেখা যাচ্ছে, আগফার চৌধুরীর পুস্তিকায় সৈয়দ সুলতান আছেন গদাহোসেন আছেন এবং তরবারী ও অশ্ব বিদ্যমান। সুতরাং ডক্টর শরীফ আগফার চৌধুরীকে যতটা উপেক্ষা করেছেন, তিনি তেমন উপেক্ষার পাত্র নন, বরঞ্চ তাঁর পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে বিবেচনার দাবী রাখে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, শ্রীহট্টে গদাহাসননগর নামে একটা পরগনা ছিল এবং সম্ভবত এর নামকরণ হয়েছিল গদাহোসেনের নামানুসারে। একাত্তর বছর পূর্বে শ্রী অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সেখানে আগফার চৌধুরীর বংশীয় ইতিহাসটি শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। (শ্রী অচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধি: শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্বাংশ ১ম ও ২য় ভাগ, ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৫ম অধ্যায়, প্রকাশক শ্রী উপেন্দ্র নাথ পাল, কলিকাতা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১০০—১১১)। প্রসঙ্গত শ্রীযুক্ত স্বরূপ চন্দ্র রায় কৃত "সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস" এবং শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ২য় ভাগ, ষষ্ঠ খণ্ড গ্রন্থদ্বয়ের কথা এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। কেননা উভয় গ্রন্থেই তরফের সৈয়দ বংশের উল্লেখ আছে ঈষা খাঁয়ের পিতা কালিদাস গজদানী এই

সৈয়দ বংশের ইব্রাহিম খালেকউল উলামা-এর নিকট থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন এবং ত্রিপুরার মহারাজা অমর মানিক্যের সঙ্গে প্রথমে বৈরিতার, পরে হৃদ্যতা-সম্পন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয় সৈয়দ বংশের সৈয়দ আদমনামক এক তরফদারের। আগফার চৌধুরীর পুস্তিকার সাথে এসব ঘটনার কোন গরমিল নেই। গদা হোসেন ছাড়াও হবিগঞ্জের লস্কর পুরান্তর্গত আরেকজন ব্যক্তির অস্তিত্ব আমরা লাভ করি, নাম সৈয়দ মুসা, যিনি সৈয়দ সুলতানের ভ্রাতা ছিলেন। কবি মুকিব প্রসঙ্গে ডক্টর শরীফ ও সৈয়দ সুলতানের ভ্রাতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কেননা মুকিমের কাব্যে আছে :

সৈয়দ সুলতান বংশে শাহাতুল্লা নাম।
একে তান ভ্রাতৃ পুত্র দ্বতীয়ে জামাতা।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ শরীয়তি জ্ঞাতা॥

মুকিমের বক্তব্য যে নির্ভরযোগ্য নয়, তা পূর্বে বলেছি। ডক্টর শরীফের মতানুসারে যদি নির্ভরযোগ্য ধরা হয়, তবে মুকিমের উক্তিতে উল্লিখিত এই ভ্রাতার নামই সম্ভবত সৈয়দ মুসা। সৈয়দ সুলতান যেমন আরাকান রাজের প্রীতিভাজন ছিলেন এবং তারই নিদর্শন স্বরূপ তিনি একটি ঘোড়া ও তরবারী উপঢৌকন হিসেবে লাভ করেন, তেমনি তদীয় ভ্রাতা আরাকান রাজের অনুগ্রহ-ভাজন ছিলেন। শ্রীশিবরতন মিত্র সংকলিত "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" গ্রন্থে (১৭ পৃঃ) বলা হয়েছে যে, সম্ভবত ইনিই সেই সৈয়দ মুসা যাঁর অনুরোধে মহাকবি আলাওল "সয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল" কাব্যটি লিখেছিলেন। এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু বলা অবশ্য কঠিন, তবে সৈয়দ মুসা নামে সৈয়দ সুলতানের একজন ভ্রাতা ছিলেন এবং তিনি আরাকান রাজের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন, এমন মনে করা যেতে পারে; সুতরাং হবি গঞ্জের লস্করপুরে আমরা তিনজনেব অস্তিত্ব ঐতিহাসিক ভাবে লাভ করেছি— সৈয়দ মুসা, সৈয়দ সুলতান এবং সৈয়দ গদা হোসেন। এই সৈয়দ পরিবারের সাথে দিল্লীর যোগাযোগ ও আত্মীয়তা সহজ হয়ে ওঠে এবং একদিকে আত্মিক-সাধনা অন্যদিকে প্রশাসনে দৃঢ়তা ও ন্যায়বিচার উভয়বিধ কারণেই এই সৈয়দ পরিবার বাংলার সম্ভ্রান্ত ও কৃতি পরিবারের একটি হিসেবে দীর্ঘকাল খ্যাতিলাভ করে। চট্টগ্রামের পরাগলপুরে বা চক্রশালা চাকলার আধুনিক পটিয়ার কোন গ্রামে সমগ্র বাংলাদেশে খ্যাত ও দিল্লীর সঙ্গে এবং আরাকান রাজ ও ত্রিপুরাধিপতির সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত কোন সৈয়দ পরিবার ছিল কিনা তেমন প্রমাণ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও ডক্টর আহমদ শরীফের পরিবেশিত তথ্যে অনুপস্থিত।

ডক্টর মুহম্মদ শাহীদুল্লাহও এই আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ লিপিকর মুজফ্‌ফরের উক্তিকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে সৈয়দ সুলতানের নিবাস চক্রশালা বলে ধার্য করেন। জনাব মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন জনাব শহীদুল্লাহর এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলে (মাসিক মোহাম্মদী, ২৪শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা) ডক্টর শহীদুল্লাহ তরফের ইতিহাস প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই ইতিহাসে যে

সৈয়দ সুলতান ছিলেন, তিনি ছিলেন প্রশাসক, তিনি যে কবি ছিলেন এমন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। সুতরাং শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ সাহেব মনে করেন যে, কবি সৈয়দ সুলতান সিলেটের তরফের সৈয়দ সুলতান থেকে ভিন্ন এবং তাঁর নিবাস ও জন্মভূমি ছিল চট্টগ্রামের চক্রশালা—চাকলার আধুনিক পটিয়ার কোন একটি স্থানে (মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫৯ সন, বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ২৯)। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থেও জনাব শহীদুল্লাহ সৈয়দ সুলতানকে চট্টগ্রামাঞ্চলের কবি বলেই প্রতিপন্ন করেছেন (বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩)। শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহর স্বভাব সুলভ উদারতা এখানে যে, তিনি তরফের ইতিহাসকে উড়িয়ে দেননি। তবে সৈয়দ সুলতান প্রশাসক ছিলেন কবি ছিলেন না, তাঁর এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, সৈয়দ সুলতান প্রশাসক ছিলেন বলেই বাংলা ভাষায় ইসলামী বিষয় বিশেষ করে নবীদের জীবনী প্রকাশে দুঃসাহস দেখিয়ে ছিলেন। সেকালে বাংলাভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ লিখলে যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণগণ রচয়িতাদের রৌরব নরকে স্থান নির্দেশ করতেন, কৃত্তিবাস, কাশীদাসকে সর্বনেশে বলে চিহ্নিত করতেন, মুসলমান মোল্লারাও তেমনি আরবী থেকে পবিত্র কোরাণ বা নবীদের জীবনী প্রকাশকে কুফরী কাজ বলে মনে করতেন। সৈয়দ সুলতানের উক্তিতে তার প্রমাণ আছে :

এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুআ এ।
প্রকাশ্য সকল কথা মনে নাহি ভাএ॥
লস্কর পরাগল খনে আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি॥
হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে॥
গ্রহ শত রস যোগে অব্দ গোঙাইল।
দেশী ভাষে এই কথা কেহনা কহিল॥
আরবী ফার্ছি ভাষে কেতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে না বুঝে মূর্খ-সুত॥
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যত কহিমু অধিক॥
লস্করের পুরখানি অলিম বসতি।
মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি॥
আলিমান পদে আমি মাগি পরিহার।
খোমিবা পাইলে দোষ না করি গোহার॥
ছৈয়দ সুলতান কহে কেনে ভাবি মর।
সহায় রসুল যার তরিবে সাগর॥

বাংলা ভাষায় নবীবংশ রচনার ও প্রচারের কারণে কবিকে যে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কবি অন্যত্রও তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

এত ভাবি নবী বংশ পাঁচালী রচিলুম।
আল্লা একমনে ভাবি প্রচার করিলুম॥
তে কারনে কত কত পশু বুদ্ধি নরে।
কি ভাব ভাঙ্গিলুম করি দোষ এ আমারে॥

সুতরাং সৈয়দ সুলতান একজন তরফদার ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এই সমালোচনাকে সামলানো সম্ভব হয়েছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে এ-কাজ দুরূহ ছিল। সৈয়দ সুলতানের পূর্ববর্তী কবি শাহমুহম্মদ সগীরও এই ভীতির কথা উল্লেখ করেছেন :

চতুর্থে কহিমু কিছু পোথার কথন।
পাপ ভয় এড়ি লাহ দৃঢ় করি মন॥
নানা কাব্য কথা রসে মজে নরগণ।
যার যেই শ্রদ্ধায় সন্তোষ করে মন॥
ন লিখে কিতাব কথা মনে ভয় পাত্র।
দোষিব সকলতাক ইহন জুয়া এ॥
(য়ুসুফ জলিখা কাব্য)

কবি মুজাম্মিল বলেছেন :

আরবী ভাষায় লোকেঁ ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুঁ পয়রে বচন॥
যে বলে বলোক লোকেঁ কবিলুঁ লিখন।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ, ন যাত্র খণ্ডন॥

ডক্টর এনামুল হকও একথা স্বীকার করে বলেন : "কবি সৈয়দ সুলতান যে সময়ে বাংলা ভাষায় সাধনা করিতেছিলেন সে সময়ে শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা শোচনীয় ছিল। আরবী ও ভাষাভিজ্ঞ আলিমগণ বাঙ্গলা ভাষা জানিতেন না। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুধর্মের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রন্থাদিকে বা ধর্মের কথাকে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা ধর্মদ্রোহিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।" (সা. প. প. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২) সৈয়দ সুলতান একটি তরফের মালিক ছিলেন, কবি ছিলেন এমন কথা তরফের ইতিহাসে নেই, তাই কবি বলে তাঁকে স্বীকার করা চলে না, শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে উদ্ধৃতি সমূহ প্রদত্ত হোল। সৈয়দ সুলতান নামক একজন কবিকে আমরা পেয়েছি। তিনি লস্করপুরের মানুষ বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন, শ্রীহট্ট নগরের কথাও বলেছেন এবং তরফের ইতিহাসে সৈয়দ সুলতান আছেন, এসব কারণগুলো মিলিয়ে আমাদের বিচার করতে হবে যে, তরফের ইতিহাসে উল্লেখিত ব্যক্তিই

কবি সৈয়দ সুলতান কিনা। যে কারণে শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ হবি গঞ্জের সৈয়দ সুলতানকে ভিন্ন ব্যক্তি বলতে চেয়েছেন, যুক্তি হিসেবে তা খুব প্রনিধান যোগ্য নয়, বরঞ্চ একজন ক্ষমতা সম্পন্ন লোকের পক্ষেই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় নবীবংশ রচনা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করবার কারণ রয়েছে। বলা প্রয়োজন, তিনিই প্রথম মুসলমান কবি যিনি এই সৎসাহস দেখিয়ে ইসলাম ধর্মকথা বাংলায় রচনা করেন। এদিক থেকে সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের চক্রশালার একটি অখ্যাত স্থানের সাধারণ পরিবারের মানুষ ছিলেন, এই দাবীর চেয়ে তিনি যে হবিগঞ্জের বাংলা ও ভারত বিখ্যাত সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন এবং তরফের ইতিহাসে উল্লেখিত ক্ষমতাধর পুরুষ ও পীর সৈয়দ সুলতানই ছিলেন, এমন দাবী তুলনামূলক ভাবে অনেক জোরালো বলে মনে হয়। কবি নিজে বলেছেন লস্করপুর অথচ সেই স্থানকে পরাগলপুর নামে রূপান্তরের কৃতিত্ব ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের। পরবর্তী-কালে ডক্টর শরীফও লস্করপুরকে পরাগলপুর বলে চালিয়েছেন, তবে ব্যাখ্যা হিসেবে ডক্টর হকের এক ধাপ আগে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। ডক্টর হকের ব্যাখ্যা তাঁর মুসলিম বাংলা সাহিত্য (প্রথম মুদ্রন, ১৯৫৭, পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স্‌, পৃঃ ১৪৮) গ্রন্থে বিদ্যমান। সেই সুরে সুর মিলিয়ে ডক্টর শরীফও বলেন, "কবি পরাগলপুরে সাময়িক ভাবে বাস করেছেন। বিশেষ করে নবী বংশ শুরু করার সময় পরাগলপুরেই ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন: লস্করের পুরখানি আলিম বসতি, মুক্রি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি। পরাগল খাঁ কর্তৃক পরাগলপুর পত্তনের ষাট-পয়ষট্টি বছর পরে সৈয়দ সুলতান "লস্করের পুর" উল্লেখ করেছেন। এতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। এক, ১৫৮৪-৯৬ খৃষ্টাব্দে পরাগলপুর অন্ততঃ আঞ্চলিক শাসন-কেন্দ্র ছিল। দুই, তখনো লস্কর বলতে প্রখ্যাত পরাগল খাঁই লোক-স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। অথবা এই কেন্দ্রের শাসনভার তখনো লস্কর উপাধি কিংবা পদবীধারী কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত ছিল। তবে শেষোক্ত অনুমানের অবকাশে অল্প, কেননা, আমাদের উদ্ধৃত চরন দুটির আগেই কবি উল্লেখ করেছেন:

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি।

কাজেই লস্করের পুর যে পরাগল পুরই, তাতে সন্দেহ থাকেনা। (প্রাগুক্ত গবেষণা গ্রন্থ) কবি সৈয়দ সুলতানের 'লস্করের পুর'কে পরাগল পুর হিসাবে প্রতিপক্ষের যে প্রয়াসে উপরোক্ত চট্টগ্রাম নিবাসী দুইজন পণ্ডিত গলদঘর্ম হয়েছেন তাকে রীতিমত কষ্টকল্পনা বলে বিবেচনা করা যায়। উভয়েরই এই প্রয়াসে মৌলিকতা আছে কিন্তু তা যতটা কল্পনা-স্পর্শী, ততটা বাস্তবধর্মী নয়। পরাগল খানের নাম কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে উল্লেখ করেছেন, যাঁর প্রেরণায় রবীন্দ্র পরমেশ্বর গুপ্ত মহাভারত অনুবাদ করে ছিলেন। তার মানে এই নয় যে, সৈয়দ সুলতান কবীন্দ্রের সমসাময়িক ছিলন এবং পরাগল পুরের অধিবাসীও তাঁকে হতেই হবে। সিলেট হবিগঞ্জের কবির পক্ষেও লস্কর পরাগলের এবং কবীন্দ্রের নামোল্লেখ সম্পূর্ণ ভাবেই সম্ভব এবং স্বাভাবিক একটি ঘটনা। এই সহজ ও স্বচ্ছ ব্যাপারটিকে নিয়ে

এমন জট পাকানোর অর্থ এবং উদ্দেশ্য একমাত্র এই দাঁড়ায় যে, কবি সৈয়দ সুলতানকে চট্টগ্রামের কবি বলে প্রতিপন্ন করতেই হবে। অথচ কবি ঘুনাক্ষরেও কোথাও নিজবাস ভূমি যে পরাগলপুর একথাটি বলেন নি, বলেছেন লস্করের পুর, অর্থাৎ লস্করপুর, পয়ার ছন্দের ধ্বনি সামঞ্জস্যের জন্য হয়েছে লস্করের পুর। ডক্টর এনামুল হক এবং ডক্টর শরীফ কবি আলাওলকে উভয়েই নিয়েও এক সময়ে এমন জট পাকিয়ে ছিলেন। আলাওল বলেছেন ঃ—

গৌড় মধ্যে মূলুক ফতেহাবাদ শ্রেষ্ঠ।
বৈসন্ত মহৎজন সমাজ তেই হৃষ্ট॥
বিজজ্ঞ দুনিয়াবন্ত খলিকা সুজান।
আউলিয়া সবের বহুতান গোরস্থান॥
হিন্দুকুলে শ্রোত্রী মন্ত্র ব্রাহ্মণ সুজন।
মধ্যে ভাগিরথী ধারা বহে অনুক্ষণ॥
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি।
তাহান অমাত্য সুত মুঞি হীন মতি।

(মৎ সম্পাদিত সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮০, আলাওলকৃত অংশ, পৃঃ ৭৬)

উভয় পণ্ডিতই বলেছেন যে, এই ফতেহাবাদ চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে, ৩১টি মহাল নিয়ে ফতেহাবাদ সরকার গঠিত হয়েছিল এবং এর রাজস্ব ছিল ৭৯৬৯-৫৬৭ দাম। দিল্লী সম্রাটের জন্য ফতেহাবাদ সরকারকে ৫০৭০০ পদাতিক সৈন্য এবং ৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য যোগাতে হোত। ফরিদপুর জেলা সমেৎ যশোর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা এমনকি নোয়াখালী জেলার অংশ বিশেষ এর অন্তর্গত ছিল। রিয়াজুস সালাতিনের মতে বাংলার স্বাধীন সুলতান জালালুদ্দিন আবুল মুজফ্ফর ফতেই শাহের নামানুসারে ফতেহাবাদ নাম হয়েছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, ফতেহ শাহ বা ফতেখাঁর নামে এইনাম হয়েছে। আলাওল যে মজলিস কুতুবের নাম করেছেন তিনি বারো ভূঞার বিদ্রোহের সময় যাঁরা স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন, তাঁদেরই একজন ছিলেন। মির্জানথনের বাহারিস্তান গৈবীতে আমরা তাঁর নাম পাই। পাঠান আমলে এখানে মুদ্রা অঙ্কিত হতো। এই ফতেহাবাদ সম্ভবত বর্তমান ফরিদপুর শহর নয়। ফরিদপুর শহর থেকে প্রায় চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গেরদা বলে একটি গ্রাম আছে যার অনেক কীর্তিই পদ্মাব করলে নদীবক্ষে বিলীন হয়েছে। এই গ্রামে এবং চারপাশে যে আলাওল বর্ণিত ফতেহাবাদ ছিল এমন অনুমান বেশ জোরের সাথেই করা যায়। —(শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; চত্বারিংশ ভাগ, ১৩৪৩, পৃঃ ১১০) এই স্থানই ছিল আলাওলের জন্মভূমি।

চট্টগ্রামের হাট হাজারী থানার জোরবা গ্রামে আলাওলের নামে যে মসজিদ ও দীঘি আছে তা যে আল্লারাস্তি খান নির্মান ও খনন করেন এখন তা প্রমাণিত হয়েছে। আলাওলের জন্মের বহু পূর্বে সম্ভবত ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নির্মান ও খননের কাজ হয়। সুতরাং আলাওল সম্পর্কে যেমন ডক্টর হক ও ডক্টর শরীফের দাবী অসার প্রতিপন্ন হয়েছে, সৈয়দ সুলতান সম্পর্কেও উভয়ের দাবী যে একই প্রবনতা থেকে উৎসারিত, এতক্ষণের আলোচনায় আমি সে কথাই প্রতিপন্নের চেষ্টা করেছি। পরাগলপুর কষ্ট কল্পিত একটি উপাখ্যান, চক্রশালার দাবীর ভিত্তি মোটেই দৃঢ় নয়। অন্যপক্ষে লস্করপুর একটি প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধস্থান, হবিগঞ্জে এই নামে একটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। সৈয়দ সুলতান তাঁর জন্মভূমি হিসেবে এই নামের উল্লেখ করেছেন, শ্রীহট্ট নগরের উল্লেখও আছে তাঁর একটি গানে, তাঁর ভ্রাতা সৈয়দ মুছা, বংশধর গদা হোসেন, ঈশা খাঁর পিতার ধর্মান্তরণ, আরাকান রাজের অশ্ব ও তরবারী, শমসের গাজীর প্রসঙ্গ ত্রিপুরা রাজের বৈরিতা ও হৃদ্যতা, শতবৎসর পূর্বে মুদ্রিত সৈয়দ আব্দুল আগফার চৌধুরী প্রণীত 'তরফের ইতিহাস' শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্ব-নিধির "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" ইত্যাদি অভিনিবেশ সহ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বস্তুগত দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে একথাই বলা সম্ভবত সঙ্গত হবে যে, কবি সৈয়দ সুলতান সিলেট জেলার হবিগঞ্জের লস্করপুরেই জন্ম গ্রহণ করেন।

মুহম্মদ আসাদ্দার আলী "সিলেটের মহাকবি সৈয়দ সুলতান" প্রবন্ধে মূল্যবান তথ্য ও ও যুক্তির পরিবেশন করেছেন। সৈয়দ সুলতানের ভাষায় চট্টগ্রামের চেয়ে যে সিলেটিখ্যাত লিকতার বৈশিষ্ট্য অনেক বেশী, জনাব আলী তার প্রচুর প্রমাণ তুলে ধরেছেন। যেমন ডুব বা ডুবাইব সৈয়দ সুলতানে আছে বোর, বোরাইমু এমন প্রয়োগ চট্টগ্রামে নেই, আছে ডুম, ডুময়্যম্। ঢাকিয়া চট্টগ্রামে ঢাকি বা ঢাকিয়া, সিলেটে ঘুরি বা ঘুরিয়া, সৈয়দ সুলতানেও ঘুরি বা ঘুরিয়া আছে। আমি মনে করি জনাব আলীর প্রবন্ধটি, ঢাকার কোন ডাক সাইটে পত্রিকায় প্রকাশিত না হলেও, খুবই তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ এবং তাই বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। ভাষার ক্ষেত্রেও সৈয়দ সুলতানের ওপর সিলেটের দাবী যে অনেক বেশী, এ কথা সুস্পষ্ট। সৈয়দ সুলতানকে এসব কারণে সিলেটস্থ হবিগঞ্জের লস্করপুরের অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করি। ডক্টর হক ও ডক্টর শরীফের গুরুতুল্য জনাব আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদও এই যুক্তি গ্রহণ করেছেন। ১১-৮-৪৯ তারিখে অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যকে তিনি একটি পত্র লিখেন। কতকগুলো ছোট কাগজ, যা অকেজো, একত্রে আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে তিনি একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা তৈরী করে তার মধ্যে তাঁর বক্তব্য লিখেছেন। আমি শ্রীভট্টাচার্যের বিরাট সংগ্রহশালায় এই পত্রটি দেখেছি এবং পড়েছি। জনাব সাহিত্য বিশারদ সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেন তা সমর্থন করে লিখেছেন, "কুমিল্লার আলী আহমদের তালিকা আমি দেখিয়াছি। উহা সুলিখিত হয় নাই। সম্প্রতি তিনি ওফাতে রসুল নামক পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি দেখিয়াছেন কি? তাঁহার গবেষনার ও পাণ্ডিত্যের বহর

দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। সৈয়দ সুলতানের সঠিক পরিচয় আপনা কর্তৃক প্রকাশিত হইবার পরও তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে এতকথা বলিতে যাওয়া গবেষণা শক্তির অপব্যবহার মাত্র। তারপর তিনি প্রাচীন বানান হুবহু রক্ষা করিয়াছেন! সেকালের লিপিকারেরা বানানের কোন ধার ধারিতেন না। কলমের আগায় যাহা আসিত, তাঁহারা তাহাই লিখিয়া যাইতেন। তাঁহাদের অজ্ঞতাকে সেকালের প্রচলিত ভাষা মনে করিবার কোন হেতু আমি দেখিনা।"

সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-বিশারদের দৃষ্টিতে যা গবেষণা-শক্তির অপব্যবহার মাত্র, অনেকের নিকট তা-ই- পাণ্ডিত্যের প্রধান সহায়। তাই লস্করপুর পরাগলপুর হয়, ফতেহাবাদ ফরিদপুর থেকে হয় স্থানান্তরিত।

ডক্টর সুকুমার সেন সৈয়দ সুলতানের "গ্রহ শতরস যোগে" এই উক্তিকে "দশশত রস যুগ" ধরে ১৬৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তার নবী বংশ রচনারম্ভের কাল বলে নির্ণয় করেছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপর, ১৯৬৩, ৩য় সং, পৃঃ ৩৪৩) কিন্তু মুহম্মদ খান সৈয়দ সুলতানকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর সময়কাল আনুমানিক ১৫৮০-১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ ধরা হয়েছে। ডক্টর শরীফ "গ্রহশত রস যুগে" এই পাঠ ধরে কবির নবী বংশ রচনায় হাত দেবার সময় ১৫৮৪-৮৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে স্থির করেছেন। কিন্তু গ্রহশত রস যোগে ধরলে অনেকগুলো হিজরী সন পাওয়া যায়—এতে সমস্যার এমন সহজ সমাধান হয় না। তাই জনাব শরীফ নির্ণীত ৯৯১-৯৪ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৪-৮৬ সাল যে কাব্যারম্ভের কাল নয় এমন অনুমানই যথার্থ মনে করি। কবি তাঁর উক্তিতেও বলেছেন যে, এই সময়টি পার হয়ে গেল, অথচ কেউ মুসলমানী গ্রন্থে হাত দিচ্ছেন না। জনাব আসাদ্দার আলী এই গ্রহশত রস যুগে বলতে মঘী সন ধরে বিচার করে ১৬৩০-১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ পেয়েছেন এবং এই সময়টাকে নবীবংশ রচনার আরম্ভ কাল বলে উল্লেখ করেছেন। ডক্টর এনামুল হক এবং ডক্টর শরীফ উভয়েই হিজরী সন ধরে বিচার করেছেন। কবি মুউতান যে, হিজরী সনেরই ইঙ্গিত করেছেন, তার কোন রূপ নিশ্চয়তা নেই, এই সন মঘী সনও হতে পারে, কেননা সে সময়ে মঘী সন সমগ্র আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কবি মুহম্মদ খানের বিখ্যাত কাব্য 'মকতুল হোসেন' রচনার কাল ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ধরা হয়েছে—এর পূর্বেই অর্থাৎ ১৬৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু করে ১৬৩৫-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকেই সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশ সমাপ্ত করেছেন, এমন অনুমান যথার্থ বলে মনে করা যেতে পারে। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ সুলতানের অসমাপ্ত কাজের অর্থাৎ কারবালার কাহিনী অংশের রচনার দায়িত্ব সৈয়দ সুলতান তাঁর যোগ্য শিষ্য মুহম্মদ খানকেই দিয়েছিলেন—সুতরাং তখনো তিনি জীবিত ছিলেন, তবে বৃদ্ধ। এ থেকে অনুমিত হয়, সৈয়দ সুলতান আলাওলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রায় সমসাময়িক পূর্ববর্তী-কবি ছিলেন। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের রচনাকাল, ১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যপক্ষে দৌলত কাজীর সতীময়না ও লোর চন্দ্রানীর রচনাকাল ১৬৩০-৩৮

খ্রীষ্টাব্দ। আমার মনে হয়, রচনাকাল হিসেবে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ সম্ভবত সতীময়নার সমসময়ের। সৈয়দ সুলতানের সময় নিরূপণের ব্যাপারে ডক্টর এনামুল হক ও ডক্টর শরীফ যেমন সুনিশ্চিত বিশ্বাসে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা সমীচীন বিবেচিত হতে পারে কিনা, সেকথাও অবশ্যই বিচার-সাপেক্ষ। আমি সৈয়দ সুলতানের স্থান-কাল সম্পর্কিত উভয় পণ্ডিতের মতবাদের সঙ্গে একমত হতে পারিনি বলেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

উত্তরকালের গল্প ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

অনুপুঙ্খ বিস্তারিত না হলেও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের উত্তর-পর্বের ছোটগল্পগুলি নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। সনাতন ও প্রগতিবাদী সমালোচকদের দুটি বিচ্ছিন্ন মেরু রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক ও বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক; —সমালোচনার এই দুটি সমান্তরাল ধারার সমন্বয় ও সংশ্লেষ কখনই সম্ভব হয় নি। ফলে অধিকাংশ সমালোচনাই হয়েছে খণ্ডিত, অসম ও যান্ত্রিক।

অনেকের মতে, এই পর্বের ছোটগল্পের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবে প্রচারবাদী। এই সময়কার অধিকাংশ গল্পই বক্তব্য প্রধান, মার্কসবাদী আদর্শের ভারবাহী মাধ্যম মাত্র; প্রথম পর্বের মত জীবনরসে সঞ্জীবিত, শিল্পে উত্তরিত সাহিত্যকর্ম নয়। লেখকের ফ্রয়েড থেকে মার্কস উত্তরণের সঙ্গে উত্তর পর্বের গল্পের শৈল্পিক মূল্যের অবনতির যোগসূত্রও তাঁরা লক্ষ করেছেন—এটি এক ধরনের সরলীকৃত ব্যাখ্যা। আবার অনেকের মতে প্রথম পর্বের গল্পগুলি ভাববাদী—ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনে আবিল, মার্কসবাদে দৃঢ় প্রত্যয়ই উত্তরপর্বের গল্পগুলিকে অনেক বেশী ঋজু ও বলিষ্ঠ করেছে। তাঁদের মতে মার্কসবাদ গ্রহণ ও ফ্রয়েডবাদ বর্জনের ফলে শিল্পকুশলতায় কিছুমাত্র ভাঁটা পড়েনি।

সাহিত্যিক উৎকর্ষ সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত হলেও উভয় শিবিরের সমালোচকদেরই মূল কথা হল—পার্থক্য। প্রথমপর্বের ও উত্তরপর্বের লেখক মাণিকের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। এই দুই পর্বের গল্পগুলির মধ্যেও সকলেই একটা গুণগত ও বিষয়গত পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমপর্বে লেখক ছিলেন অন্তর্নিবেশী, বিশ্লষণ-প্রবণ, জটিল, খানিকটা morbid; উত্তরপর্বে তিনি হয়েছেন—বহির্মুখী, গণমুখী, মূলত সমষ্টিজীবন—প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সোচ্চার শিল্পী। এই পার্থক্য আদৌ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় কিনা, এই পার্থক্যের প্রকৃত স্বরূপ কেমন বা সামগ্রিকভাবে শিল্পীর সাহিত্য-জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের অবস্থান কোথায়—এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর পর্বের ছোট গল্পের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ মূল্যায়নের একটি প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

উত্তরকালের গল্প সংগ্রহে আছে ১৮টি গল্প। মনে রাখা ভাল, এই সংগ্রহের গল্পগুচ্ছ কালানুক্রমিক নিরবচ্ছিন্ন নয়; ফলে শিল্পীর অন্তর্জীবনের বা শিল্প বিবর্তনের আলোকে এই সংগ্রহের মধ্যে সেই অর্থে ধারাবাহিকতার সন্ধান করা অর্থহীন। গল্পগুলি ফ্রয়েডমুক্ত-

মার্কসবাদী যুগের ফসল ; কিন্তু ব্যাপকভাবে মার্কসীয় চিন্তাধারায় রচিত হলেও, এর মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বমূলক গল্পও আছে।

মানিক 'কলম পেষা মজুরের' সৌখিন মজুরীতে বিশ্বাসী ছিলেন না ; তাই সৎ সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে সরাসরি অন্বয় ঘটিয়াছিলেন। তাঁর 'ছন্দপতন' উপন্যাসের 'কবিতায় ও জীবনে বস্তুবাদী' কবি নবনাথের ভাষায় 'কবি তার কবিতায় একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা আমার কাছে উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়।"

তখন সময়টা ছিল অস্থির। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—একটা উত্তাল গণবিক্ষোভ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিমণ্ডল। একদিকে মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সমাজ, কণ্ট্রোল, মন্বন্তর, বিপর্যস্ত সামাজিক জীবন, পুরানো মূল্যবোধের অবক্ষয়, অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা। চারিদিকে একটা অদ্ভুত শূন্যতা। সমাজজীবনে এই দুর্যোগের বাতাবরণে, চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই মানিকের মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার প্রবণতা দেখা যায়। মার্কস, বুখারিনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং লিয়েন্টিয়েভের মার্ক্সীয় অর্থনীতির ব্যাখ্যা পড়ে তিনি সাম্যবাদী চিন্তাভাবনায় উদ্বুদ্ধ হন, শুরু হয় আর এক নতুন অধ্যায়—নতুন পথে উত্তর খোঁজার পালা। ১৯৪৪ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিষ্ট দলে যোগ দেন। সাম্যবাদে তাঁর সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের প্রথম প্রতিভাস তাঁর ১৯৪৮–৪৯ সালে লেখা 'সহরতলী' উপন্যাসের দুটি খণ্ডে ; উপন্যাসটি অর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বন্দ্বের বাস্তবচিত্র। 'লেখকের কথা'য় মানিক লিখেছেন "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি"—এখানে 'পরিবর্তন' কথাটি লক্ষ করবার মত। সমালোচকদের মতে সরাসরি ভাববাদী নিয়তিবাদ (determinism), বিবরগামিতা ও ব্যবচ্ছেদী মনঃসমীক্ষণ থেকে অর্থনৈতিক নিয়তিবাদে উত্তরণ। এই কারণেই উত্তরকালের অধিকাংশ গল্পই 'মার্কসবাদী সাহিত্য' রূপে চিহ্নিত।

দুই

উত্তরকালের সব গল্পই এক ছাঁচে ঢালা মার্কসবাদী ফরমূলাভিত্তিক লেখা নয়। এখানে নানা রঙের, নানা ভাবের গল্প রয়েছে। বহু গল্পই নিছক প্রচারধর্মী নয়, জটিল ও বহুস্তরী ; মার্ক্সীয় ও ফ্রয়েডীয় দর্শণের সংশ্লেষণের প্রয়াসের আভাসও পাওয়া যায়। কিছু গল্পে ইতিবাচক সমাধানের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন পথনির্দেশ থাকলেও শিল্পীর অন্বেষণ যে শেষ নয় এমন ইঙ্গিতও অনেক গল্পে আছে ; চিন্তার অবকাশ সৃষ্টি করেছে, প্রশ্নে শেষ, প্রত্যয়ে নয়—এমন গল্পও আছে। বক্তব্যপ্রধান গল্প আছে, আবার মনস্তাত্ত্বিক গল্পও রয়েছে। ভাষাশৈলীর বৈচিত্র্য ও নিতান্ত কম নয় ; গল্পের বৌদ্ধিক জটিলতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরপর্বের লেখকের ভাষা আরও মেদহীন, আরও তীক্ষ্ণ।

এই স্বল্পপরিসর নিবন্ধে সব গল্প নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই বেছে নিতে হয়। এই বাছাই করার কাজটি বিশেষ দুরূহ—কারণ এখানে আছে 'আজকাল-পরশুর গল্প', 'হারাণের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'র মত বহু প্রশংসিত উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম; আবার রাজনৈতিক চেতনাপুষ্ট, মতাদর্শপ্রধান গল্প—প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই যার মূল কথা—যেমন, 'টিচার', 'ছাটাই রহস্য', 'উপদলীয়', 'দুঃশাসনীয়', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'কংক্রীট', 'খতিয়ান', 'একটি বখাটে ছেলের কাহিনী', 'ছিনিয়ে খায় নি কেন ?' ইত্যাদি। প্রায় সব গল্পই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের পটভূমিকায় সাধারণ মানুষের চরম দুঃখ দুর্দশা ও জীবনযন্ত্রণার নিখুঁত চিত্র—কিন্তু এমন অনেক গল্পও আছে যেগুলি স্বতন্ত্র, কোনও শ্রেণীভুক্ত করা চলে না—যেমন 'শিল্পী', 'গুপ্তধন', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ', 'ফেরিওলা', 'মাসিপিসী'।

প্রতিবাদের একটি সুন্দর গল্প—'শিল্পী'; যুদ্ধের বিষাক্ত পরিমণ্ডলে যখন সকলেই অর্থোপার্জনে ব্যস্ত, তখন তাঁতী মদন নিজের জীবনের বিনিময়েও শিল্পীর সম্মানকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় না; সে প্রকৃত শিল্পী। যুদ্ধের সময় সুতোর কালোবাজারে খোলা বাজারে সুতোর অভাব। চোরাকারবারী ভুবন তাঁতীদের দুরবস্থার সুযোগ নেয়। জীবনধারনের তাগিদে মদন ছাড়া আর সবাই ভুবনের বিধি ব্যবস্থা মেনে নেয়। মদন শিল্পী—সে বিদ্রোহ করে, মেনে নিতে পারে না; ঘরে তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, চরম দারিদ্র্য, সে নিজে অসুস্থ, ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার্ত। শেষ পর্যন্ত দাদনের সুতো নিলেও সে ব্যবহার করতে পারে না, সারারাত খালি তাঁত চালায়।

> "বুড়ো ভোলা শুধোয়;" 'তাঁত চালিয়েছ দুফুর রাতে চুপি চুপি'……
> 'চালিয়েছি। খালি তাঁত…মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে'—
> মদন হঠাৎ থেমে যায়। ('শিল্পী')

'মাসিপিসী' গল্পটিও স্বতন্ত্র ধরনের; খাপছাড়া; দুর্ভিক্ষ মহামারীর প্রকোপে আহ্লাদীর মা, বাপ, ভাই সবাই মারা গেল; মাসি আর পিসী ছাড়া আহ্লাদীর আর কেউ নেই, তাদের কাছেই সে থাকে। মাসিপিসীর মধ্যে বিদ্বেষ-কলহ লেগেই থাকে, কিন্তু বাবার তাগিদে তারা এক হয়। আহ্লাদীর স্বামী অমানুষ, আহ্লাদীকে দিয়ে মাসিপিসীর চিন্তাভাবনার অন্ত নেই; প্রায়ই নানাভাবে তার ওপর আক্রমণ হয়—মাসিপিসী তীক্ষ্ণ নজর রাখে, আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য, আত্মরক্ষার জন্যে সশস্ত্র ভাবে বঁটিকাটারী নিয়ে প্রস্তুত থাকে তারা। প্রতিরোধ ও আত্মবিশ্বাসের গল্প; বিষয় বস্তু, গল্প বলার ধরন সবই স্বতন্ত্র ধরনের। ভিন্নধর্মী গল্প, প্রচারধর্মী নয়। আর একটি প্রতিবাদের গল্প "কংক্রীট" কারখানা আর শ্রমিকের গল্প। যুদ্ধের সময় সিমেন্টের কালোবাজারে দালাল শ্রমিক বেন্দা প্রতিবাদী শ্রমিকদের রোলার মেশিনে থেঁতলে দেওয়াতেও দ্বিধাবোধ করে না। বেন্দার স্ত্রীর কাছে রঘু জানতে পেরে আর একদণ্ডও সেখানে থাকবে না বলে

মনস্থির করে—'কানে তালা লেগে গেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে থেঁতলে যাবার যে শব্দ সেই—তার মত' (কংক্রীট)।

'খতিয়ান' গল্পটি সম্প্রদায়িক পটভূমিকায় লেখা। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সুযোগ নেয় কারখানার মালিকরা। ব্যাপক ছাঁটাই চলে ; চরমবিপদের মুহূর্তে তারা জাতপাতের পার্থক্য ভুলে যায়—উপলব্ধি করে জাত তাদের একটাই—"গরীবের জাত" ; "তুই গরীব, আমরা গরীব,—আমরা গরীবের জাত"—এ গল্পটি বক্তব্য প্রধান হলেও স্লোগানধর্মী নয়। 'ফেরিওলা' শ্রেণীগত সম-অনুভূতির গল্প। অর্থনৈতিক সংকটে শ্রেণীভেদ ক্রমশ মুছে যাচ্ছে ; তথাকথিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আজ ফেরিওলায় পরিণত। উপসংহারের চমক গল্পটিকে একটি নিটোল ছোটগল্পের রূপ দিয়েছে।

"গায়ে একটা জীর্ণ সতরঞ্চি জড়িয়ে ভেতরের মানুষটা জীবনের সামনে এসে দাড়ায়। এ্যালুমিনিয়ামের বাসনের সেই ফিবিওয়ালাকে বক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সামনে দাঁড়াতে দেখে নিজের পাওনা টাকাটার বদলে প্রথমেই জীবনের মনে আসে এই কথা যে লোকটার খুব জ্বর, কয়েক দিনের মধ্যে বীণার কাছে হাঁড়ির দামটা সে চাইতে যেতে পারবে না।"

(ফেরিওলা)

যুদ্ধের সময় নিয়োগ ও যুদ্ধের পরে ছাঁটাই-এর ব্যঙ্গাত্মক গল্প 'ছাঁটাইরহস্য' পুরোপুরি প্রচারধর্মী। স্থায়ী কাজের লোভ দেখিয়ে শ্রমিকদের খাটিয়ে নেওয়া হয়। মিথ্যা অভিযোগে কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়, শ্রমিকদের বিশ্বাস ভেঙে যায়, তাঁরা দেওয়ালে লেখে—ছাঁটাই রহস্যের আসল কথা। এই রকম আর একটি একদেদর্শী গল্প 'ছিনিয়ে খায়নি কেন'—গল্পের বক্তব্য ক্ষুধা ; একদিকে পঞ্চাশের মন্বন্তরে গণমৃত্যু ও অপরদিকে মহাজনদের মজুতদারী এই চিত্রটিই লেখককে নাড়া দিয়েছিল। এখানে প্রশ্ন একটাই—"এরা সকলে দলে দলে মরছে তবু এরা ছিনিয়ে খায়নি কেন ?—উত্তর দিয়েছে যোগী ডাকাত—"একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়"—ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনীশক্তি কমতে থাকে। তার প্রতিবাদের ক্ষমতা লোপ পায়।

সমস্যাটি তুলে ধরা হয়েছে, সমাধানের পথনির্দেশ নেই, উত্তর নয়, প্রশ্নে শেষ এমন গল্পও আছে—যেমন 'টিচার' বা 'যাকে ঘুষ দিতে হয়।' 'টিচার' গল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয়—বুনো রামনাথের আদর্শের অবাস্তবতা। তুচ্ছ আর্থিক কারণে শিক্ষকরা কেন শ্রমিকদের মত ধর্মঘট করবেন—রাজমাতা হাইস্কুলের সেক্রেটারী রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার শিক্ষকদের এই উপদেশ দেন। গিরিন ছাড়া কোন শিক্ষক এর প্রতিবাদ করেন না। গিরিন ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনের নাম করে রায়বাহাদুরকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে তার চরম দুর্দশার নির্মম ছবিটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেয় যে এই আদর্শ কতটা অবাস্তব ও হাস্যকর—শেষ পর্যন্ত গিরিন বরখাস্ত হয়।

'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পটি দুর্নীতিগ্রস্ত ধনী সমাজের নগ্নরূপ ; মাখনের আর্থিক উন্নতির মূলে দাদাসাহেব ; মাখন জানে ঘুষের ফলেই লাভ। বড় লাভের লোভে মাখনের স্ত্রী সুশীলাও ঘুষের মতই ব্যবহৃত হয়। এখানেও সমস্যাটি তুলে ধরা হয়েছে। সমাধানের ইঙ্গিত নেই। শুধু সমস্যাটিকেই প্রকট করে তুলে ধরা হয়েছে 'দুঃশাসনীয়' গল্পটিতেও। অন্নকষ্টই শুধু নয়, বস্ত্রসংকটও চরমে উঠেছে। রাবেয়ার লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকুও জোটে না। শেষে সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। 'হারাণের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা সার্থক ছোটগল্প। প্রথম গল্পটিতে মূল চরিত্র ময়নার মা— তার বুদ্ধিবলেই কৃষকদের সংগ্রামী নেতা ভুবন মণ্ডলকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায়, এটিও প্রতিরোধের গল্প। দ্বিতীয় গল্পটিতে আন্দোলন মূলত নেপথ্য পটভূমিতে থাকলেও আন্দোলনের ব্যঞ্জনাময় উপস্থিতি গল্পটির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। দিবাকর—তার স্ত্রী ও শিশু ছোট বকুলপুরের যাত্রী—পুলিশী সন্ত্রাস ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে তাদের আকস্মিক আবির্ভাব। তাদেব পাসমোড়া কাগজে লেখা ইস্তাহার "ছোটবকুলপুরেব সংগ্রামী বীরদের প্রতি" পুলিশের সন্দেহ জাগায়, জেরার মুখে হতচকিত দুজনে দোষী সাব্যস্ত হয়। সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক ব্যঞ্জনা গল্পটিতে অন্যমাত্রা যোগ করেছে।

'আজকালপরশুর গল্প' নির্যাতিতা মেয়েদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার গল্প। গল্পটি ইতিবাচক, বলিষ্ঠ। দুর্ভিক্ষ মহামারীতে জীবনধারণের তাগিদে আত্মরক্ষার ঘৃণ্য পথ মুক্তার মত অনেক নারীকেই হয়ে নিতে হয়েছে, কারণ সনাতনী সতীত্বের চেয়ে জীবনধারণের প্রশ্ন আরও বড়। গল্পটি রামপদর বৌ মুক্তাকে সহর থেকে উদ্ধার করে আবার গ্রামে রামপদর ঘরে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী মাত্র নয়, এটি একটি সর্বজনীন সমস্যা।

তিন

এখানে মূল বিচার্য বিষয় তিনটি—(১) উত্তর পর্বের ছোট গল্পের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থে নির্লিপ্ত 'কমিটেড' লেখক কিনা ; গল্পগুলিকে রাজনৈতিক মতাদর্শমুখর শ্রেণী সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ছাড়া অন্য কোনভাবে বিচার করা যায় কিনা ; (২) সম্পর্কিত আর একটি প্রশ্ন—লেখকের মার্কসবাদী প্রত্যয়ের প্রতিফলনে গল্পগুলির শৈলিক মূল্য কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং (৩) প্রথম পর্বের শিল্পী গল্পকার মানিক ও দ্বিতীয় পর্বের মার্কসবাদী গল্পকার মানিকের মধ্যে প্রকৃতই অসংলগ্নতা আছে কিনা। তিনটি বিষয়ই পরস্পর সংযুক্ত।

চল্লিশের দশককে বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন এবং মার্কসবাদী মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের দশকরূপে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়। অনেকেই তখন শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবিষয়ে সেসময় তাত্ত্বিক পর্য্যায়ে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে। যেমন ম্যালিনাওস্কির (Malinowski) 'A Scientific Theory of Culture and other Essays' অবলম্বনে মানব-সংস্কৃতির 'বাস্তব হাতিয়ার' (material tools) এবং মানসিক হাতিয়ার (spritual tools) এর প্রসঙ্গ, মার্কস-এঙ্গেলস্

কথিত বস্তুজগত ও ভাবজগতের পারস্পরিক দ্বন্দ্বমিলনের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে (বিনয় ঘোষ, পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৫৩, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৫৩) মার্কসবাদী সাহিত্যে প্রচার বলতে কি বোঝায়, কমিউনিষ্টরা যা প্রচার করেন তা কেন সাহিত্যধর্মের সঙ্গে সমন্বিত ইত্যাদি বিষয়েও অনেকে আলোচনা করেছেন। 'ফলিত' ও 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের মধ্যে অনেকে প্রকারভেদ করেছেন (আবু সয়ীদ আইয়ুব)। অনেকের মতে "কমিউনিষ্ট নন্দনতত্ত্ব বলে কোন পদার্থ নেই, আর্টের ক্ষেত্রে সমালোচক নন্দনতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নিছক ব্যক্তি হিসেবেই বিচার করতে পারেন (পিয়ের এর ভ, ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য); আবার অপরপক্ষের মতানুযায়ী, নন্দনতত্ত্বকেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে—এটা না মানার অর্থ হল শ্রেণী সংগ্রামে শিল্পের দায়িত্বকেই প্রায় অস্বীকার করা (লুই আরাগঁ)।

বিষয়টি বিতর্কিত। এই বিতর্কের গভীরে না গিয়ে এখানে কয়েকটি চিন্তাসূত্র ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মার্কসবাদ অধ্যয়নের পর মানিকের কাছে তাঁর আগের লেখার অনেক ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি স্পষ্ট হয়েছিল, সন্দেহ জেগেছিল; শিল্পী সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন—"আমার অর্দ্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল বলে গণ্য করতে হবে"—উত্তর নিজেই দিয়েছেন—না, তা হবে না। "মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেন সাহিত্য করতে নেমেছিলাম ভেবে আত্মগ্লানিবোধ করলে সেটা মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে—যান্ত্রিক, একপেশে বিচার আরেকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে"—এই "যান্ত্রিক, একপেশে বিচার" সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

প্রথমপর্বে তিনি ভাববাদী শিল্পী মাত্র, আর উত্তরপর্বে তিনি যথার্থ জীবনমুখী, গণমুখী, কমিউনিষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন একথা বললে, যান্ত্রিক, একপেশে বিচার'ই করা হয়। মার্কসবাদে বিশ্বাস তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষের মাপকাঠি হতে পারে না—এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে হবে। মার্কসবাদ সাহিত্য মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না এ কথা তাঁর অজানা ছিল না; নিরপেক্ষ শিল্পীর মতই তিনি বলেছেন "মার্কসবাদ না জানায় কিছুই করতে পারিনি—এই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া মার্কসবাদকে অস্বীকার করারই সমান অপরাধ" (লেখকের কথা, পৃঃ ১৭)। রাজনীতিকে শিল্পের সঙ্গে অন্বিত করতে হবে ঠিকই, কিন্তু বিষয়বস্তু রাজনৈতিক দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শিল্পমূল্যের বিচারে উত্তীর্ণ না হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। স্লোগানের ভঙ্গিতে রচিত শিল্পকর্মে বিষয়বস্তু আছে কিন্তু রূপরীতি নেই। এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড আপওয়ার্ডের (মার্কসবাদীর চোখে সাহিত্য) কয়েকটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে সৎসাহিত্য রচনা করতে হলে ব্যবহারিক জীবনে সাহিত্যিককে সমাজতন্ত্রী হয়ে শ্রেণীসংঘর্ষের প্রগতিশীল পক্ষে যোগ দিতে হবে; কিন্তু সমাজতন্ত্রী হলেই সৎসাহিত্য রচনা করা যায় না। রচনার গুরুত্ব নির্ভর করে ব্যক্তিগত প্রতিভা ও বাস্তবজগতের জটিল অবস্থা সমূহের পর্যবেক্ষণ-শক্তির ওপর। এ বিষয়ে লেলিনের চিন্তাভাবনার অনেক সময় একপেশে ও

সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপ্তি লক্ষণীয়—তিনি বলেছেন—"literature must become part of the common cause of the proletariat, 'a cog and a screw' of one great Social Democratic Mechanism" (সমগ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড); আবার একথাও বলেছেন যে "সাহিত্যের ক্ষেত্রে" 'mechanical adjustment' বা 'levelling' চলে না—এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, প্রবণতা, চিন্তা ও কল্পনার বিশেষ অবকাশ রয়েছে—(পার্টি অরগানাইজেশন এ্যাণ্ড পার্টি লিটারেচার)।

তবে একথা বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'নন-কমিটেড' (non-committed) লেখকের অস্তিত্ব সোনার পাথরবাটির মতই অবাস্তব। জীবন, মত/পথ এবং সত্য—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি তাঁকে কোন না কোনভাবে দায়বদ্ধ হতেই হয়। যেমন বালজাকের দায়বদ্ধতা ছিল জীবন ও সত্যের প্রতি—এই কারণেই তিনি বড় শিল্পী। এই কারণেই লেনিনের চোখে টলষ্টয় মহৎ শিল্পী।

আর একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ গল্পের ভিতর ভিড় করে এলেই সে গল্প বাস্তব ও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে না, দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনার গুণে সে গল্প 'প্রতিক্রিয়াশীল'ও হয়ে যেতে পারে। মানিক নিজেই বলেছেন বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নয়, তিনি শিল্পী; কল্পনার রঙে রসে তিনি তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন কিন্তু দেখতে হবে কল্পনা যাতে ফাঁকা আদর্শবাদীতার মিথ্যায় পর্য্যবসিত না হয়, জীবনবিরোধী না হয়ে ওঠে।

আবার কেবল জীবনাশ্রয়ী সাহিত্য হওয়াই যথেষ্ট নয়; George Lukacs ফ্লবেয়ার মঁপাসার বাস্তববাদ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে "স্থিরচিত্র" আর "জীবন্তচিত্রের" মধ্যে একটা পার্থক্য করেছেন। মঁপাসা জীবনাশ্রয়ী কিন্তু বালজাকের মত জীবনরসসঞ্জীবিত নয়। ঠিক তেমনই বলা যায়, গণমুখী বাস্তবধর্মী সাহিত্য কল্লোল কালিকলমের যুগে অনেকেই লিখেছিলেন, যেগুলি 'রোমান্সের ওপিঠ' ছাড়া আর কিছুই নয়। মানিকের গণজীবনের চিত্রায়ণ বৃহত্তর জীবনবোধে উজ্জ্বল।

তাছাড়া ছোটগল্পের নিয়ামক উপাদান যদি বস্তুময় জীবন ভূমি ও লেখকের স্বকীয় উপলব্ধির প্রত্যয়-ব্যঞ্জনা হয় এবং ছোটগল্পে শিল্পীর গুণ যদি হয় সংহতি, সংক্ষিপ্তি আর ব্যঞ্জনা—তাহলে উত্তরকালের 'শিল্পী' 'মাসিপিসী', 'ফেরিওলা, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'—গল্পগুলি তার অসামান্য সাহিত্যকর্ম বলেই বিবেচনা করতে হবে। আমার মতে, উত্তরকালের তথাকথিত উদ্দেশ্যমূলক গল্পগুলি সচেতন কর্মের পরীক্ষারূপেই বিচার করতে হবে। এ পরীক্ষা তিনি আগেও করেছেন।

তবে নিছক কর্মের পরীক্ষা নয়, বিষয়ের পরীক্ষাও বটে। দ্বন্দ্ব বা সংঘাতই মূল কথা। মার্কসবাদের আলোকেই ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব তার কাছে সচেষ্ট হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন: "ভাববাদ যদি একেবারে বর্জন করতেই পারতাম, তবে আর সংঘাত কিসের?

উত্তরপর্বে এই দ্বন্দ্বের শেষ হয়নি, পথ খোঁজা তখনও চলছে, শেষ কথা বলার সময় আসেনি ; ইতিবাচক মতাদর্শের সন্ধান পেয়েছেন, গ্রহণ করেছেন, প্রয়োগও করেছেন, কিন্তু সংঘাতের চিহ্নও থেকে গেছে—এই পর্বেরই বহু খাপছাড়া গল্পে, মনস্তাত্ত্বিক জটিল গল্পে। এই কারণেই এই পর্বের গল্প নিছক প্রচারধর্মী, সাহিত্য নয়—একথা নির্বিবাদে মেনে নিতে পারি না। যেমন মেনে নিতে পারিনা ফ্রয়েডীয় লিবিডো তত্ত্ব মানিকের প্রথমপর্বের গল্পে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে, উত্তর পর্বেই তিনি যথার্থ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী সাহিত্য রচনা করেছেন।

এই ভাবে বিচার করলে শিল্পী-জীবনের অন্তর্লীন ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করা যায়। পর্যবেক্ষণমূলক বাস্তববাদ থেকে উদ্দেশ্যমূলক বাস্তববাদে উত্তরণ ধারাবাহিকতাবিহীন, স্ববিরোধী বা অসংলগ্ন বলে মনে হয় না। সংশ্লেষের এই নিরবচ্ছিন্ন বৌদ্ধিক প্রয়াসেই মানিকের উত্তরকালের ছোটগল্পের সার্থকতা।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস: গানের ভূমিকা

—নির্মলেন্দু ভৌমিক

এক

নাটকে ও কথাসাহিত্যে, বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপনার তাগিদে, গানকে গ্রহণ নতুন কোনো ব্যাপার নয়। সব দেশের সাহিত্যেই আছে, আমাদের দেশেও। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে শুরু করে একালের কোনো কোনো উপন্যাসে। যে বিশেষ বক্তব্যটি বলতে চান লেখক, একটা কোনো বিশেষ চরিত্রের গানের মাধ্যমে তা তিনি বলেন। হয়তো সে কথা গদ্যে বললেও চলত। তথাপি গান চাই। গান মনের ভেতরে এক নতুন জগৎ নির্মাণ করে নেবে। লেখকের বক্তব্যটি তীরের মতো গেঁথে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ করে কোনো চরিত্রের কণ্ঠে গান বসিয়ে দেওয়া যায় না। উপন্যাসের প্রয়োজনের অবকাশ থাকা চাই। সেই উপন্যাসের ভাব-পরিমণ্ডলটাই এমন হবে, যাতে কোনো চরিত্রের কণ্ঠে গান দিলে তা বেমানান ঠেকবে না। বিনা প্রয়োজনে হঠাৎ করে একটি গায়ক-চরিত্র এনে উপন্যাসের বক্তব্য বিষয়ের কিছু আভাস দেওয়া গেল, তাতেই কিন্তু গানের সার্থকতা লুকিয়ে থাকে না। মূল কথা—উপন্যাসের 'ভাব-পরিমণ্ডল'।

'ভাব-পরিমণ্ডল' বলতে উপন্যাসের বিস্তৃতি ও গভীরতা—দুটি দিকই বোঝায়। 'বিশ্লেষণ' মহৎ উপন্যাসের একটা বড় দিক। বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে রসের নিবিড়তা যুক্ত না হলে সাহিত্যের শেষ সিদ্ধিও বিড়ম্বিত হয়। গদ্যের বিশ্লেষণের সীমা-শেষে গানের অবতারণার সার্থকতাও সেই রসের জগতে পৌঁছে।

উপন্যাস-ছোটোগল্পের এ এক পুরোনো ও পরিচিত কৌশল। একই লেখক তাঁর একাধিক রচনায় এক-এক ভঙ্গিতে গানকে ব্যবহার করে থাকেন। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এবং 'কবি'—তিনটি উপন্যাসেই গান-কবিতার প্রয়োগ আছে। কিন্তু তিনটির প্রয়োজন যেমন ভিন্ন, প্রয়োগপদ্ধতিও তেমনি।

দুই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একাধিক রচনাতে গানের প্রয়োগ করেছেন। অনুমান করি, সেগুলি তাঁর নিজেরই রচনা। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে যেমন দিনের ও রাতের কবিতাকে পৃথক ভাবে এক-একটি পর্যায়ের ভূমিকা রূপে গ্রহণ করেছেন, তেমনি ভাবে অবশ্য আর কোথাও করেন নি। করলে সেটা শিল্পসম্মতও হত না। ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে তিনি গানকে বিশেষ কারণে গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর 'ছোট বড়'-গল্পগ্রন্থের 'ষ্টেশন রোড' এবং 'গায়েন'—এ দুটি গল্পের উল্লেখ ও আলোচনা করছি।

'ষ্টেশন রোড' গল্পের ষ্টেশন রোডও রূপকার্থে ব্যবহৃত। ষ্টেশন মানেই এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার সঙ্গম-স্থল।

> দিনের শেষে ষ্টেশন রোড ঘুমের দেশে যায় না, কর্ম ব্যস্ততায় অবসানে শুরু করে অবসর যাপন, আত্মপ্রকাশ, চেনা অচেনা প্রাণের যোগাযোগ। শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্য নতুন মানুষ এসে ঠেকে যায় এখানে রাত্রির জন্য। যাত্রার দল, কবি ওয়ালা, সাধু বৈষ্ণব ফকির। মাঝে মাঝে অনেক রাতে জমে ওঠে বাছা বাছা পালার বাছা বাছা গানওয়ালা অংশ, কবি গাওন, একতারা বা তিনতারার সাথে গান, ছড়া বা পাঁচালি।......
>
> দু'রকম ভাবে জমে দু'জনের এই কথকতায়। মনোহরের গুরুগম্ভীর বর্ণনায় গা ছম ছম করে, শ্রোতার কথার আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে হৃদয়, তীব্রতায় আগুন ধরে যায় রক্তে, দাঁতে দাঁত চেপে হাত মুঠো করে ফেলে অনেকে। নিতাই আবার অন্য রকম, সে থেকে থেকে সকলকে হাসায়, বুকে জ্বালা ধরিয়ে শুধু মুখে হাসায়। আগা গোড়া তার কথা ও সুর হয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হাসি তামাসায় কিন্তু তারই ঝাঁঝে আঁতে যেন ছ্যাঁকা লাগে সকলের।......

মানুষকে মাতাবার যে দুই ভিন্ন পদ্ধতির কথা মনোহর ও নিতাইয়ের গানের ভিন্নতার মাধ্যমে লেখক এখানে তুলে ধরেছেন, এক হিসেবে তা স্বয়ং লেখকেরই দুটি ভিন্ন পদ্ধতি।

'ষ্টেশন রোড' ছোট গল্পটিতে দেখা যায়, মনোহর বা নিতাইয়ের গানই যেন রাস্তার এক ধার থেকে শ্রোতাদের অন্য ধারে নিয়ে যায়। ষ্টেশন রোডের এক প্রান্তে সে দিন ১৪৪ ধারা আইন জারী করা ছিল। কাজেই, পাঁচ জনের বেশি মানুষ একত্র হতে পারবে না। ষ্টেশন রোডের অপর প্রান্তে কিন্তু ওই আইন জারি হয় নি সেদিন। কাজেই, সেদিন গানের আসর বসল ষ্টেশন রোডের অন্য প্রান্তে। গানে-গানে সবাই যেন এক অচেনা ভিন্ জগতে চলে গেল। ঠিক যেমন কবি হোসেন মিয়া কেতুপুর থেকে সবাইকে নিয়ে চলে যায় ব্যবসায়ী হোসেন মিয়াকে ছাড়িয়ে মায়া-ঘেরা ময়নাদ্বীপে। কেতুপুর ও ময়নাদ্বীপ 'ষ্টেশন রোডে'র দুই পার।

'গায়েন' গল্পে অবশ্য ভিন্ন কথা পাই। গায়েন রাজেন দাস একদিন শ্রোতাদের মন মাতিয়ে দিত। এখন তার বায়না তিন কুড়ি। কিন্তু হরিখালির নরহরি, যে হলে-হতে-পারত রাজেনেরই শিষ্য, আজ সে নতুন কালের নতুন কথা বলে শ্রোতাদের মন ভরায়। রাজেনের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েছে। রাজেন-নরহরির মধ্যে, কাজে-কাজেই, এখন ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারটি এসে গেছে। গায়েন হল মহাকালের সূত্রধার। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিষয়েরও পরিবর্তন করতে হয়। যে তা না পারবে, সেইই কালের পেছনে পড়বে, মানুষ তাকে বাতিল করে দেবে। যেমন হয়েছে রাজেনের। কিন্তু রাজেনের মতো খাঁটি বিশুদ্ধ গায়ক যারা, তারা মানসিক দিক থেকে উদারও হয়। তাই একদিন গান শুনতে গিয়ে নরহরিকে সে স্বীকার করে নিল। যুগে যুগে নতুন গায়েন

আসে, নতুন কালের বার্তা বহন করে ; তার কাজ ফুরিয়ে গেলে আর একজন এসে তার স্থান দখল করে নেয়। রাজেনরা চলে যায়, নরহরিরা আসে। কিন্তু কালের বার্তা বইবার জন্য গায়েন একজন থাকবেই। বিশুদ্ধ গায়েনরা সেই নতুন গায়েনকে স্বীকার করে নেয়। গান ও গায়েনকে এইভাবে কালের বার্তাবহ এক উপায় রূপে লেখক যেখানে দেখেছেন, সেখানেই কথা শিল্পের ক্ষেত্রে গানের বিশিষ্ট ভূমিকাকেও স্বীকার করে নেই।

কথাশিল্পে গানের ও গায়কের ভূমিকা কী, ওপরের দু'টি ছোটো গল্প থেকেই তা বোঝা যায়। 'পদ্মানদীর মাঝি'র গানের ভূমিকাকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে।

তিন

> গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, একখান গীত ক' দেখি কুবির ?
>
> হ, নীত না তর মাথা।
>
> কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শুনে। যে যাহারে ভালো সে তাহারে পায় না কেন, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। এ বড় সহজ গান নয়।—প্রথম পরিচ্ছেদ

গণেশের এই গানটি উদ্ধৃত হয় নি। কিন্তু বিষয়টির উল্লেখ আছে। প্রেমের গান। না-শোনা সেই গানটিই সপ্তম পরিচ্ছেদে শোনা যায়। গণেশেরই কণ্ঠে। শ্রোতাও এবার কুবেরই। হোসেন মিয়ার সওদা নিয়ে ওরা গিয়েছিল আমিন বাড়ী। শম্ভু, বগা ও গণেশ কোনো রূপ-কন্যার গৃহে রাত কাটিয়ে এসেছে।

> ...কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কাইল রাইতে ছিলি কই ? প্রশ্ন শুনিয়াই গণেশ হাসিয়া ফেলিল, ফিস ফিস করিয়া বলিল, বাক্যা মাইয়া কুবিরদা, কিবা গীত কয় ! বলিয়া সে গুন গুন করিয়া গান ধরিল—
>
> পিরীত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই...
>
> ...গণেশ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কুচরিত্তির কিবা ? গীত শোননে দোষ নাই। ঠিক বেড়ার আড়ালে মালা বুঝি শুনিতেছিল, ডাকিয়া বলিল, আবার কও গীতখান—শুনছ মাঝি ? আবার কও।—সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কেন গণেশকে দিয়েই গান গাওয়ানো ? সে নাম গাইতে পারে না ভালো করে, সে 'খোকা'। তথাপি, তাকে দিয়েই যখন দুবার গান গাওয়ানো হয়েছে, দুবারই প্রেমের, তখন এর পেছনে কোনো কারণের অনুমান নিশ্চয়ই করা যায়।

হোসেন মিয়া 'রহস্যময়', এমন কি নিয়তির মতো শক্তিশালী ; আর, গণেশ 'বোকা'। দুটি চরিত্রই বিশেষত্বপূর্ণ। এ দু'জনের কণ্ঠেই গান গেলো। দু জনেরই লক্ষ্য কুবের। লক্ষনীয়, হোসেন মিয়া তার স্বরচিত গান এককভাবে কুবেরকেই শুনিয়েছে।

'বোকা' গণেশের কোনো ব্যক্তিত্বই নেই। গণেশ আসলে কুবেররই প্রতিরূপ। সর্বদা গণেশকে কুবেরের সহচররূপে মেশে। কুবেরের নিস্তরঙ্গ জীবনে একদিন কপিলা এসে তরঙ্গ তুলল। প্রেমের ঢেউ। কুবেরের অন্তরের প্রেমিকসত্তা, কপিলা তার জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সবেরই ব্যাখ্যাকার হল গণেশ। কিন্তু সে অবোধ ব্যাখ্যাকার। গণেশ যদি চতুর ও সপ্রতিভ হত, তবে সে কুবেরের ব্যক্তিত্বের প্রতীক বা প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারত না। সে জন্যে ইচ্ছে করেই ঔপন্যাসিক তাকে নির্বোধ করে এঁকেছেন।

কুবেরের জীবনের একদিকে আছে মালা ও গণেশ ; অন্যদিকে কপিলা এবং অবশ্যই হোসেন মিয়া। হোসেন মিয়া একটি অগ্রবর্তী বিন্দুর মতো কুবেরকে নিয়ন্ত্রিত করে যাচ্ছে। কুবের মাঝি, হোসেন মিয়া আরো বড় মাঝি। কিন্তু 'মাঝি' পরিচয়ই হোসেন মিয়ার শেষ পরিচয় নয়। হোসেন মিয়া যেমন সৃষ্টির প্রতীক, বহু মাঝিকে সে কৃষকে পরিণত করেছে, ফসল ও মানুষ সৃষ্টি করতে প্রণোদিত করেছে, কুবেরও তেমনি একদিন প্রেমের কারণে মাঝিবৃত্তি পরিত্যাগ করে ময়না দ্বীপের কৃষক-গৃহস্থে পরিণত হল। পদ্মা নদীর সত্যিকারের 'মাঝি' বলতে কেউ আর রইল না। না কুবের, না হোসেন।

কিন্তু কুবেরের সেই প্রেম নিয়তির মতো দুর্বার, অলঙ্ঘ্য ও অমোঘ। নিয়তির সেই প্রতিনিধিই হোসেন মিয়া। কুবেরের মনে আছে দ্বিধার বাধা। কিছুতেই সে কেতুপুর ছেড়ে ময়না দ্বীপে যাবে না ; অথচ, হোসেনের কারসাজিতেই পীতম মাঝির চুরি হওয়া টাকার ঘটিটা কুবেরেরই বাড়ীতে পাওয়া গেল !

> ভয়ে তাহারা হোসেন মিয়ার দিকে তাকাইতে পারে না। মনে হয় আশ্বিনের ঝড় নয়, হোসেন মিয়াই আমগাছ ফেলিয়া আমিনুদ্দির কুটিরখানি চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। লোকে যে বলে কোন কোন মানুষের ভূত প্রেতের উপর কর্তৃত্ব থাকে, হোসেনেরও তাই আছে কিনা কে জানে। একদিন রাত্রে সে যে হোসেন মিয়ার পকেট হইতে পয়সা চুরি করিয়াছিল সে কথা মনে করিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতে থাকে। এমন অলৌকিক শক্তি যার, সে কি টের পায় নাই চুরির কথা ? ঘরের চালা হয়ত নয়, হয় তো হোসেনের পোষ-মানা অন্ধকারের অশরীরী শক্তি সেদিন গোপির হাঁটু ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, বাড়ী ছিলনা বলিয়াই কুবের সেদিন বাঁচিয়া গিয়াছিল নিজে।—সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হোসেন একদিকে ধ্বংস করে, অন্যদিকে গড়ে। ঠিক পদ্মা নদীর মতোই। তার ধ্বংসের দিকটিকে নিয়তির লীলার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। এই ধ্বংস-লীলারই আর একদিক—মালা-কুবেরের দাম্পত্য জীবনে ছেদ ঘটানো ; আর সৃষ্টির দিক—কুবের-কপিলাকে মেলানো। নিয়তির বেশে সে যদি আমগাছ ফেলে আমিনুদ্দির ঘর ভাঙে, তবে সেই

আবার আমিনুদ্দির 'নিকা' দেয়। এ কাজে সে কঠোর। মালা এবং আমিনুদ্দির মেয়েরা অনন্তকাল ধরে কাঁদলেও হোসেন মিয়া বিচলিত হয় না।

কুবেরের প্রেম ও তার সমস্যাকে নিয়ে রচিত তার মনের দ্বিধাকেই লেখক যেখানে নিয়তি-রূপী হোসেন মিয়া করে তুলেছেন, সেইখানেই তাঁর শিল্পীরূপে সার্থকতা অর্জন করেছেন। হোসেন মিয়ার দুর্বার শক্তি কপিলার প্রেমের দুর্বারতা রূপে দেখা দিয়েছে। এই জন্যেই হোসেন-কপিলাকে এক গোত্রে ফেলেছি। কপিলার মধ্যেও ছিল দ্বন্দ্ব। "কপিলা চুপি চুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট।" কিন্তু এ দ্বিধা ক্ষণিকের। কুবের হোসেনের হাতের পুতুল : "কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।"

কপিলার প্রেম যখন কুবেরের মনে এক আবর্তের সৃষ্টি করেছে, তখন হোসেন মিয়ার কারসাজি এক হিসেবে তার কাছে শাপে বর হয়েছে। কুবেরের বাড়ী থেকে পীতমের ঘটিটা যদি সত্যিই না পাওয়া যেত, তবে কুবের কোনো দিনই কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে রওনা হত না। এইখানেই তার প্রেমের সমস্যার মধ্যে নিয়তিরূপী হোসেন মিয়ার ক্রিয়া-কলাপ সমাধানের স্বস্তি এনে দিয়েছে।

কিন্তু কুবেরের মনেই কি হোসেন-নিরপেক্ষ পরিস্থিতিতে কপিলাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার বাসনা হয় নি! অপূর্ণাঙ্গ, বিকলাঙ্গ মালা পারবে কি নৌকোতে আমাকে পৌঁছে দিতে! "...সে তো কোন নদীতীরে ছুটিয়া আসিতে পারে না—বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য ভঙ্গিতে পারে না সোজা হইয়া দাঁড়াইতে।" এই "নদীতীরে ছুটিয়া" আসা একটি প্রতীক। যে দিন ময়না দ্বীপে তারা রওনা হল, সে দিনও কপিলা নদীর তীরেই ছুটে এসেছিল। নদীই ভাঙে, নদীই গড়ে। কেতুপুরে ভেঙে ময়না দ্বীপে গড়ে। কপিলার মধ্যেও তার ইঙ্গিত ছিল।

> কপিলা বলে, ডরাইছিলা, হ? আবে পুরুষ! তারপর বলে, আমারে নিবা মাঝি লগে? বলে আর কপিলা আব্দার করিয়া কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে।..... কিন্তু কপিলা যায় না। ঝগড়া করিয়া গাল দিয়া অধরকে সে ভাগাইয়া দেয়। কে জানে কি আছে কপিলার মনে!—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কপিলা কুবেরকে সর্বদাই হয় 'পুরুষ' নয় 'মাঝি' বলে সম্বোধন করেছে। কুবেরের পৌরুষকে সে ব্যঙ্গ করে সে বিষয়ে তাকে সচেতন করেছে। এই দুটি সম্বোধনকে একত্র করলে এই দাঁড়ায় : কুবেরের যদি পৌরুষ থাকে, তবে সে কপিলাকে নিয়ে অজানার উদ্দেশে নাও নিয়ে মাঝি হয়ে পাড়ি দিক। কপিলার তরফ থেকে আহ্বানের কোনো ত্রুটি ছিল না। কুবেরের মনের কথা গণেশ ব্যক্ত করেছে—উল্লিখিত গান দুটিতে।

* * * * *

চার

কুবের-কপিলার অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে মালার ভূমিকা কী ও কতখানি, সে খতিয়ানের প্রসঙ্গটাও এইখানে উঠে পড়ে।

মালার পঙ্গুত্ব এবং রূপকথা বলবার অসামান্য দক্ষতা—এ দুটিই বিশেষ প্রতীকার্থে উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। হোসেন মিয়ার মধ্যে ধ্বংস ও সৃষ্টির যে বৈপরীত্যের কথা আগে বলেছি, আশ্চর্যের কথা, তা পরোক্ষ ভাবে মালার মধ্যেও দেখা যায়। তার পঙ্গুত্ব (এবং সে পঙ্গুত্বে সম্প্রসারিত রূপ—ঝড়ের রাতে গোপির পা ভেঙে যাওয়া) সহজেই জীবনের এক অসম্পূর্ণতা ও নিষ্ফলতার প্রতীক বলে মনে করে নেওয়া যায়। মালার ধারণা ছিল, গোপির মতো সেও হাসপাতালে চিকিৎসা করালে ভালো হয়ে যাবে। কুবেরের অজ্ঞাতে একবার সে চেষ্টাও সে করেছে। সফল হয় নি। নিশ্চিতভাবেই সে চিরতরে পঙ্গু হয়ে থাকবে; যদিও চিকিৎসায় ভালো-হওয়া গোপী নবতর দৃষ্টির পথে যাত্রা করে, তার বিবাহোত্তর জীবনে। পঙ্গুত্বের তা হলো দুটি রূপ। শীতের শীর্ণ পদ্মা মালার মধ্যে পঙ্গু হয়ে থাকে; বর্ষার পদ্মা সচল হয়ে গোপীর মধ্যে ধরা দেয়। মালা চিরকালের পিছু টান। কুবের-কপিলা-গোপীরা সম্মুখের টানে অন্ধকার দিকে পা বাড়ায়। আর সন্তানদের নিয়ে মালা কেতুপুরের আঙিনায় স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তবে, মালার রূপকথা সেই অজানা-অচেনা জগতের নিশ্চিত ইঙ্গিত বাহী। যে রাজ্যে সে কোনদিনই যেতে পারবে না। যে রাজ্যে গেল তার স্বামী, কন্যা ও সহোদরা। পঙ্গুত্ব যদি অচলতার প্রতীক হয়, রূপকথার অচিন জগৎ তবে এক রোমান্টিক জগৎ। পঙ্গু মালার কাছে এক অধরা জগৎ। অচলতা ও সচলতা—মালার জীবনের এই দুটি বিরুদ্ধ-বিপরীত দিক কুবের-কপিলার প্রেমের দুই বিরুদ্ধ দিকের প্রতীক।

* * * *

পাঁচ

অতঃপর এই উপন্যাসের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ—হোসেন মিয়ার চরিত্র এবং তার গান। অবশ্য, এ বিষয়ে আগেই দু'চার কথা বলেছি।

হোসেন মিয়ার প্রসঙ্গে আসবার আগে উপন্যাসটির সূচনা-অংশ লক্ষ করা যাক: কুবেরের একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে এর সূচনা। এই নবজাতকের আগমন—একটি সৃষ্টির দিক। পদ্মা নদীর মধ্যেও সেই সৃষ্টির দিক:

> পদ্মা তো কখনো শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, কে জানে। সমুদ্রগামী জল প্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।—প্রথম পরিচ্ছেদ।

মনে রাখতে হবে, এ মন্তব্য করা হয়েছে কুবের-সন্তানের জন্মের সংবাদ দেবার ক্ষণে। পদ্মার জল যেমন অনন্তকাল গতিশীল থেকে দৃষ্টিধারাকে অব্যাহত রাখে, তেমনি মানুষের দৃষ্টি ধারাও। এই জন্যেই এই প্রসঙ্গে কুবেরের শৈশব কালের একটি স্মৃতিখণ্ড—তাদের ঢেঁকির ইতিহাস—তা এই প্রসঙ্গেই প্রদত্ত হয়েছে। কুবেরের শৈশব, পিতা হারাধনের সঙ্গে কবে কোন্ পদ্মা-পার হবার বিপদ-জড়িত কাহিনীর ভগ্নাংশ—কুবেরের জীবনের যে অতীত প্রেক্ষাপটটিকে উজ্জ্বল করে তোলে, তারই সঙ্গে তার উত্তর কালের প্রজন্মের সেই বন্ধন ওই দৃষ্টিধারার নিরন্তরতার দিকটিকে স্পষ্ট করে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে যে দৃষ্টিধারার ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসের সূচনা, প্রতীকী চরিত্র হোসেন মিয়ার মধ্যে তারই পূর্ণতা।

কুবের সরল সৃষ্টির একটি প্রাথমিক আভাস মাত্র ; কিন্তু তার সব জটিলতা, নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য হোসেন মিয়ার মধ্যে। এই জন্যেই সে রহস্যময়। সমুদ্রের মতোই তার বিস্তার। দিক্‌চিহ্ন হীন সমুদ্র বক্ষে কম্পাস-ধ্রুবতারা মিলিয়ে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের হিসাব তার অভিজ্ঞতাকে বিপুলতর করে। সমুদ্রবক্ষের কাঁপুনিতে কোথায় কোন্ নির্জন দ্বীপে দৃষ্টির প্রথম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, হোসেন সেই অসম্পূর্ণ নৈসর্গিক দৃষ্টিকে মানবিক পূর্ণতা দিতে চায়। এই উদ্দেশ্যেই সে এক ঘর ভাঙে, অন্য ঘর জোড়া দেয়। যে নর-নারীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই, ময়নাদ্বীপের জনসংখ্যা কয়েক বছরেও যে একটিও বাড়াতে পারে না, হোসেন তাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেখানে স্বাভাবিক সমাজের ন্যায়-নীতিকেও সে বরদাস্ত করে না। যে যুবক-যুবতী ময়নাদ্বীপের জনসংখ্যা বাড়িয়ে তাকে মানবের বসবাসের উপযোগী করে তুলবে, হোসেন তাকেই সমাদর করে মাথায় তুলে নেয়। এক হিসেবে, এই ন্যায়-নীতি বর্জিত দৃষ্টিক্ষুধার মধ্যে একটি আদিম জীবন-পিপাসা লুকিয়ে আছে। এই আদিম দৃষ্টিক্ষুধার একদিক সত্যিই কঠোর ও ভয়ঙ্কর ; ন্যায়-নীতির বালাই না রেখে কেবলই জনসংখ্যা বাড়িয়ে নৈসর্গিক দৃষ্টিতে মানবিক পূর্ণতা দান ; আর তার বিপরীতে, সেই দৃষ্টিক্ষুধার প্রেক্ষাপটে আছে একটি রোমান্টিক কাব্য সৌন্দর্যবোধ। হোসেন তখন কবি, গীতিকার। একদিকে সে ব্যবসাদার, চোরা কারবারী, অভিজ্ঞ কারবার সংগঠক ; অন্যদিকে সে রহস্যময় এক অনির্দেশ্য জগতের অধিবাসী। ক্ষণে কেতুপুরে আসে, ক্ষণেই উধাও হয়। কেউ তার আসা-যাওয়ার হদিশ পায় না। তার যেমন আসা, তেমনি যাওয়া।

দৃষ্টি, মানব দৃষ্টি এবং তারই ফল হিসেবে একটি ভূখণ্ডের পূর্ণতা, হোসেনের কল্পনায় হয়তো সেটাই এক বিরাট কিছু দৃষ্টির সমান। এ জন্যে টাকা চাই, চোরা কারবারীর টাকা হলেও দোষ নেই। বৈধ-অবৈধ যৌন জীবনেরও কোনো প্রশ্ন নেই। এ জন্যেই কুবেরের নবাগত সন্তানের জন্মের বৈধতা নিয়ে সংশয় এসেছে কিন্তু তা নিয়ে কেউ বিচলিত হয় নি। উপন্যাসের প্রারম্ভের এই ইঙ্গিতধর্মী ঘটনাগুলিই একধারে উপন্যাসের পরিণতি এবং হোসেনের চরিত্রের মূল ধুয়া-সুরটিকে ধরিয়ে দিয়েছে।

জন্মের পর খাদ্য চাই। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই জন্যেই অন্নবাবার মাঠের কথা মেলে। রথের মেলা, সেই মেলা থেকে গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি কেনা, এবং খাদ্যদ্রব্য চুরি করা—এ সবই কেবল নিছক বাঁচার জন্য কতকগুলি অত্যাবশকীয় উপকরণ সংগ্রহের প্রাণান্ত প্রয়াস। তারপর আসে বন্যা, আসে ঝড়। সেই ভাঙনের মুখে দৈবী রূপ ধরে হোসেনের আবির্ভাব। সে তখন কোন্ দূর লোকের আদিবাসী। কলকাতা থেকে তার এনে দেওয়া সূঁচও এক অলোক সামান্য সম্ভার। মালা আক্ষেপ করে। হোসেন মিয়া যে কলকাতায় যায় সে এক 'অপ্রাকৃত কলকাতা'। সেটাই কি মায়াময় ময়নাদ্বীপের আভাস-প্রতিভাস।

কুবেরের সঙ্গে হোসেনের প্রথম সাক্ষাতেই কুবেরকে এক 'দুর্জ্ঞেয় আকাঙ্ক্ষা'র অস্বস্তিতে বিব্রত হতে দেখা যায়। খুব সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে কথাকার এখানে ভবিষ্যতের তাবৎ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দিয়েছেন। লেখকের মন্তব্য: "ঘর ছাইবার জন্য হোসেনের কাছে বিনামূল্যে কিছু শন পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাকে দেখিয়া কুবেরের খুশী হওয়াই উচিত ছিল।" কুবের খুশি হয় নি, তার কারণ এক অজ্ঞাত আশঙ্কা। হোসেন বিনামূল্যে ঘর ছাইবার শন দিয়েছে; বদলে তার ঘর ভেঙে দিয়েছে।

হোসেনের বেশ-বাস, চেহারা-চরিত্র, আর্থিক অবস্থা ও রহস্যময়তা প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক স্বয়ং বিশদ মন্তব্য করেছেন। পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। তবু দুটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য: "বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের।...এই সব অর্ধ উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালবাসা আছে।" এবং দ্বিতীয়ত, "কেতুপুরের জেলে পাড়ার তিন ঘর মাঝিকে সে যে আদিম অসভ্য যুগের চাষায় পরিণত করিয়াছে, এখবর জেলে পাড়ায় কারো অজানা নাই।" কিন্তু সে জন্যে জোর-জবরদস্তি নেই। কেউ সে কথা তুলে খোঁটা দিলে হোসেন দুঃখ পায়। এই দুঃখ পাওয়াটাই তার অনুভূতির দিক, কবিত্বশক্তির জন্য যা প্রাথমিক একটি শর্ত। এই ভালোবাসা আর দুঃখ পাওয়াটাই হোসেনকে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ করে তুলেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাই হোসেন মিয়ার কাব্যশক্তির পরিচয়। লেখক সে জন্যে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছেন আগের থেকেই। এক বর্ষণ মুখরিত রাত্রিতে আকস্মিক ভাবে হোসেনকে কুবেরের ছিন্ন শয্যায় বাস করতে হয়। সে জন্যে মনে তার কোনো ক্ষোভ-খেদ নেই। পরদিন প্রভাতে হোসেন ফিরে চলেছে তার গৃহে, নির্জন পথে একমাত্র সঙ্গী কুবের। বর্ষণক্লান্ত রাত্রিশেষে, প্রভাতের যে দীনা মূর্তি তার চোখে ধরা পড়েছে, সেই দীনা মূর্তিই তার মনে ক্ষণেকের মধ্যে কাব্যসৌরভ এনে দিয়েছে:

> এখন বৃষ্টি নাই কিন্তু মেঘে মেঘে প্রভাতের রূপ অস্বাভাবিক থমথমে। হোসেন একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। ইয়া আল্লা, নামাতো আকাশের তলে কি দীনা এই পৃথিবী! ভিজিয়া চুপসিয়া চারিদিক সকাতর হইয়া আছে।...ফুটা চালার নীচে ময়লা চাটাইয়ের বিছানায় উদরে উপবাস লইয়া

তেমনি ভাবে কাল রাতটা কাটাইয়া আজ আবার হোসেনের মনে গান ভাসিয়া আসিতেছে।

কুবের, গাহান বাইন্ধবার পার ?···
···আমি বাইন্ধবার পারি।

যে প্রতিবেশটি হোসেনের সুপ্ত সঙ্গীত রচনার ক্ষমতাটিকে জাগিযে দিয়েছে, সেটিই এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করবার : পৃথিবীর দীনা মূর্তি। যেন এই দীনা মূর্তির এক বিকাশ কেতুপুরে, অন্য বিকাশ ময়নাদ্বীপে। পৃথিবী সেখানে সত্যিই দীনা। সে দীনত্ব ঘোচাবার ভার স্বেচ্ছায় মাথায় করে নিয়েছে হোসেন। ময়নাদ্বীপের দীনা মূর্তিকে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলতে হবে। একদিকে উদরে উপবাসের কঠিন বাস্তবতা অন্যদিকে সকাতর পৃথিবীর 'দীনা' মূর্তি ঘুচিয়ে তাকে ঐশ্বর্যময়ী কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা।

ছয়

এইবার হোসেন মিয়ার গানটির পরিচয় দিই।

হোসেনের চরিত্রের মধ্যে যে বিরুদ্ধতা ও বৈপরীত্যের কথা বলেছি, গানটিতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এক হিসেবে এই গানটি তার চরিত্রের সূচক। 'বন্ধু', 'মিয়া' এবং 'মাঝি' রূপে কোনো একজনকে সম্বোধন করে, তারই উদ্দেশে গানটিতে বিশেষ বক্তব্য তুলে ধরা হযেছে। সেই বন্ধু-মিয়া-মাঝি একজন গৃহস্থ, যেন ঘরের পোষা মুক্ত পাখী : 'খাঁচার চিড়িয়া'। যেন রবীন্দ্রনাথের দুই পাখী আর বনের মুক্ত পাখীর সকরুণ সংলাপ। খাঁচার পাখীরূপী সেই বন্ধু-মিয়া-মাঝি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখের, লাভ-ক্ষতির বাঁধনে বাঁধা না থাকে। সে জগতের সঙ্গে বন্ধু-মিয়া-মাঝি যেন আর এক ভিন্ন জগতের খবরও রাখে। এই দুই জগৎ—দুই বিপরীত জগৎ। যেমন, হোসেন মিয়ার আছে দুই বিপরীত মানসভঙ্গি। গানে সে তাই দুই বিপরীত জগতের সমন্বয় করতে চায়।

গানের প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিতেই যে 'আশমান-জমিনের' 'ফারাক' বা পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে, তাতেই মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। জমিনের দাবী মিটিয়েও আশমানের রোমান্টিকতাকে অতন্দ্রভাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী পুত্র নিয়ে যে রাতের সুখশয্যায় পারিবারিক সুখশান্তি আছে, সেখানেই যেন বন্ধু-মিয়া আটকে না থাকে ; এর বিপরীতে আছে কঠোর কৃষিকর্ম, দিনের কর্ম। রাতের সুখের বিপরীতে দিনের কঠিন-কঠোর কর্ম। অতঃপর আঁধার রাতের বিপরীতে জ্যোৎস্না রাতের কথা। বন্ধু-মিয়া কি কেবল দাম্পত্য সুখেই ঘরের ভিতর বন্দী থাকবে ? 'কে একজন অলস জন চুপে চুপে জ্যোৎস্নাধারা ঢেলে দিয়ে আশা করেন ঘরের চালা' ; কিংবা; মানকচুর পাতায় জ্যোৎস্না ফেলে তাকে করে তোলে রৌপ্যময়,—বন্ধু কি তা উঠে দেখবে না তার খবর দিশা রাখবে না ? সেই তিনিই তো 'দিনজাগানি'। তোমার জন্য চাঁদ হয়ে যিনি রাতের বেলায়

আকাশে খেয়া দেন। 'চরাগ-নাও' অভিধাটি লক্ষণীয়। প্রদীপরূপী নৌকা—অর্থাৎ জ্যোৎস্নার উৎসরূপী চাঁদ। মাঝি হয়ে এই চাঁদ আকাশের নদীতে খেয়া বায়। নীচে খাঁচার পাখী তাকে শুধায়: ছেঁড়া মেঘের পাল তুলে সে মাঝি কোথায় যাচ্ছে? বাহিরের এই সৌন্দর্য ও তার আহ্বানে মাঝির ঘুম ভাঙল না, মন জাগল না, বিবির বুকে শির' দিয়ে আলস্যে কাল কাটাল। এই দুঃখ ও আক্ষেপে গান শেষ হয়েছে। প্রভাত হল গানটির রচনা কাল; কিন্তু এর বিষয়ের মধ্যে আছে জ্যোৎস্নাজড়িত রাত্রির সৌন্দর্যের আহ্বান।

এই বন্ধু-মিয়া-মাঝি কে? সে কি হোসেনেরই আন্তর সত্তা, নাকি কুবের তার লক্ষ্য? মনে হয়, দুটিই এখানে লেখকের উদ্দিষ্ট। হোসেনের আপন আন্তর সত্তার মধ্যে ব্যবসায়িক বুদ্ধির সঙ্গে কাব্য-বৃত্তির যে সংযোগ ঘটেছে, কুবেরের মধ্যেও সে যেন তা সঞ্চারিত করে দিতে চায়। কুবের এখনও বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা নিয়ে কিংবা 'বিবির বুকে শির' দিয়ে গার্হস্থ্য বসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এটুকু মালার সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবনের প্রতীক বলে এসেছি। সে চাঁদের উল্টো পিঠ—অন্ধকার। আর কপিলা হল চাঁদের উজ্জ্বল দিক, জ্যোৎস্না। আকস্মিকভাবে যে দিন কুবেরকে ময়না দ্বীপে রওনা হতে হল, সেদিন নদীর ঘাটে কপিলাকে সে মধ্য-রাত্রির জ্যোৎস্নাতেই দেখে:

> কেতুপুরের ঘাটে পৌঁছাইয়া কুবেরের বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপুনি ধরিয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল কুবেরের। স্পষ্ট সে দেখিতে পাইল সাদা কাপড় পরিয়া এতরাত্রে একটি রমণী ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। কোন দিকে মানুষের সাড়া নাই, পদ্মার জল শুধু ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আছড়াইয়া ভাঙা তীরকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, নদীর জোর বাতাসে সাদা কাপড় উড়িতেছে একাকিনী রমণীর।

পদ্মার এই ভাঙন কেতুপুরের মালার সঙ্গে দাম্পত্যসূত্র ছিন্ন করবার প্রতীক; কপিলার শাড়ীর উড়ন্ত আঁচল ময়নাদ্বীপে যাত্রাকারী নৌকোর পাল॥

পুতুলনাচের ইতিকথা : কাহিনী-নির্মিতি

অপূর্বকুমার রায়

কাহিনী-নির্মিতির প্রয়োজনে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিশেষ অধিকার প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অধিকাংশ সাহিত্যিক এবং সমালোচক স্বীকার করে নিয়েছেন। এই অধিকারের বিষয়ে যাঁরা বিশেষভাবে সরব তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ফ্লবেয়র, ফিল্ডিং, হেনরি জেমস, ফর্স্টার প্রমুখ ; আর, এই বিষয়ে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছেন সার্ত্র। দার্শনিক নীৎসে যখন ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করলেন, তখন থেকেই ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞতার অধিকার সম্পর্কে সংশয়ের সূচনা হল।[১] কিন্তু আধুনিক কালে কাহিনী-নির্মিতির ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলেও, উপন্যাস রচনার প্রথম কালের মতোই, একালেও অনেক ঔপন্যাসিকই উল্লিখিত অধিকারের সুযোগ নিয়েছেন। উনিশ শতকের কথা-সাহিত্যিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে মন্তব্য করেছিলেন,

> গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন: এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানদের অন্তঃপুর, বঙ্কিমবাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েষার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন?[২]

অনেক ঔপন্যাসিকের মতোই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনী-নির্মিতির রাজ্যে জীবন সম্পর্কে সর্বজ্ঞের দৃষ্টি (omniscient view of life) প্রয়োগ করেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জগতে এই শক্তিমান সাহিত্যিক জীবনবোধ ও জীবনের রূপায়ণে অভিনবত্বের সঞ্চার করলেও জীবনের আখ্যান পরিবেশণায় পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ

---

১. '....the convention of the omniscience and intrusive narrater in fiction (of which fielding was a supreme exponent) began to lose favour at about the time Nietzsche announced the death of God..'

David Lodge, The Novelist at the Crossroads, chapter 6 (The uses and Abuses of Omniscience), p. 119, Ark Paperbacks, London & New York, 1986.

[আধুনিক ইংরেজ ঔপন্যাসিক Angus Wilson ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'an unpleasant knowingness, a claim to wisdom which the independent reader refuses to accept']

Ed., Kerry Mesweany, Angus Wilson, Diversity and Depth in Fiction, Dilemma of the Contemporary Novelist, Secker & Wovebury, London, 1983.

২. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণলতা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

করেন নি। কাহিনী-নির্মিতির ক্ষেত্রে আধুনিকতা সঞ্চারে তিনি চেতনা প্রবাহ (stream of consciousness) এর সাহায্য নেন নি এবং প্লটবিহীন উপন্যাস বিবচনে উৎসাহিত হন নি। পুরাতনের অনুবর্তনের মধ্যে তিনি তাঁর নবীনতার পরিচয় কোন কোন ক্ষেত্রে রেখে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, প্রথম পর্যায়ে রচিত তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাসের মধ্যে 'দিবারাত্রির কাব্যে' সনাতন পন্থায় কাহিনী বিবৃত হলেও, এই উপন্যাসের তিনটি পর্বের শিরোনাম নির্বাচনে (দিনের কবিতা/রাতের কবিতা/দিবারাত্রির কাব্য) এবং পর্বনিচয়ের প্রস্তাবনা হিসাবে সংযোজিত তিনটি কবিতায় কাহিনীর 'সাংকেতিকতার সার-সংকলনের চেষ্টা'র[৩] মধ্যে তিনি অভিনবত্বের পরিচয় রেখেছেন। প্রায় একই সময়ে রচিত 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় এ ধরনের কিছু অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান উপন্যাসই আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সনাতন ও স্বকীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে রচিত।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কাহিনী-কথক তথা ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত পাত্র-পাত্রী ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন পাঠকের শ্রুতিযোগ্য করে তুলেছেন এবং কখনো তাদের মনোলোকের সংবাদ সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছেন। যাই হোক, কাহিনী পরিবেষণার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতোই, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কতিপয় প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি সাধারণভাবে অনুসরণ করেছেন। উপন্যাস রচনার আদি থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত কাহিনী-নির্মিতির ক্ষেত্রে কতিপয় পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়: বর্ণনা/কথোপকথন/মন্তব্য/বিবরণ। একমাত্র কথোপকথন ছাড়া অন্য সব পদ্ধতির ক্ষেত্রেই কাহিনীকথক তাঁর কর্তৃত্ব ত্যাগ করেন না। উপন্যাস-শিল্পের কোন কোন আলোচক মনে করেন যে, এই চার রকমের পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি চিত্রকরের, দ্বিতীয়টি নাট্যকারের, তৃতীয়টি প্রচারক, দার্শনিক, সাংবাদিক, সমালোচক প্রমুখের এবং চতুর্থটি ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় রাজ্য। এই শেষোক্ত রাজ্যের আধিপত্য ঔপন্যাসিকের সঙ্গে সাংবাদিক ও ঐতিহাসিকও ভাগ করে নিয়েছেন।[৪]

যুগের রুচি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী-নির্মিত বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির-প্রয়োগ-মাত্রারও পরিবর্তন ঘটে।[৫] গত শতাব্দীর অনেক ঔপন্যাসিকই বর্ণনার প্রতি আসক্তি

---

৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, অষ্টাদশ অধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৫১৪, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৭২।

৪. Helmut Bonheim, The Narrative Modes, p. 9, D. S. Brewer, Cambridge, 1982.

৫. উপন্যাসে কথোপকথনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক Helmut Bonheim, ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে প্রকাশিত ১৫০টি এবং বিশ শতকে প্রকাশিত ১৫০টি বিশিষ্ট ইংরেজি উপন্যাসের সমীক্ষা করে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রথম গুচ্ছের উপন্যাসগুলির মধ্যে ২২টি (১৪.৬%) এবং শেষ গুচ্ছের উপন্যাসগুলির মধ্যে ৪৮টি (৩২%) কথোপকথন দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

তদেব, পৃ ১৯২।

প্রকাশ করেছেন। বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্মরণ করতে পারি। বর্তমান যুগের গতিশীলতার সাথে বর্ণনা-বহুল শ্লথগতি কাহিনী বেমানান। 'কাদম্বরী'র চিত্ররস আস্বাদনের সময় ও মানসিকতা আধুনিক পাঠকের নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কোন উপন্যাসেই বর্ণনার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন নি। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র প্রথম পরিচ্ছেদে প্রারম্ভিক কয়েকটি নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদে বজ্রাঘাতে মৃত হারুর নির্জন পরিবেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বিশেষ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির প্রস্তাবনা অংশে, প্রথম পরিচ্ছেদে এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে আরো কয়েকটি জায়গায়। আর, অন্যান্য পরিচ্ছেদে বর্ণনার অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প। তবে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনার আপেক্ষিক আধিপত্য থাকলেও, এই পরিচ্ছেদেও বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কথোপকথন, মন্তব্য ও বিবরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, বর্ণনার একঘেয়েমি এড়াবার তাগিদে। কোন কোন অংশে ঔপন্যাসিক বর্ণনার সঙ্গে কথোপকথন মিশিয়ে কাহিনীর গতি বজায় রেখেছেন :

> বটগাছটার সামনাসামনি খালের পাড় অত্যন্ত ঢালু। বৃষ্টিতে পিছলও হইয়া আছে। গোবর্ধন লগি ঠেলিয়া নৌকা পাশের দিকে সরাইয়া লইয়া গেল। সাত মাইল তফাতে নদীর জল চব্বিশ ঘণ্টায় তিন হাত বাড়িয়াছে। খালে স্রোতও বড় কম নয়। হাওড়া গাছের একটা ডাল ধরিয়া ফেলিয়া নৌকা স্থির করিয়া গোবর্ধন বলিল, আপনি নায়ে বসবে এসো বাবু, আমি নাবাচ্ছি। শশী বলিল, দূর হতভাগা তোকে ছুঁতে নেই।
>
> গোবর্ধন বলিল, ছুঁলাম বা কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে নাবাতে পারবে কেন?
>
> শশী ভাবিয়া দেখিল, কথাটা মিথ্যা নয়। পড়িয়া গেলে হারুর সর্বাঙ্গ কাদামাখা হইয়া যাইবে। তার চেয়ে গোবর্ধন ছুঁইলে শবের আর এমন কি বেশি অপমান? অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে,—মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।

উৎকলিত এই অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ করা যায় যে, ঔপন্যাসিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে শুরু করে বর্ণনার শেষে এই একই অনুচ্ছেদে কথোপকথনের সূত্রপাত করেছেন গোবর্ধনের বক্তব্যের মাধ্যমে। ঠিক এর পরেই অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে, সর্বজ্ঞের বিশেষ অধিকার নিয়ে, শশীর মানসলোকের সংবাদ পরিবেষণ করেছেন। বর্ণনার জন্য ঔপন্যাসিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থেমে থাকেন নি, সামান্য দুয়েকটি রেখায় বর্ণনা শেষ করে আবার অন্য পদ্ধতিগুলির পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগে অগ্রসর হয়েছেন। নীচের উদ্ধৃত অংশটি এই প্রসঙ্গে লক্ষ করতে পারি :

তখনো আকাশে আলো ছিল। হারুর চারিপাশে কচুপাতায় আটকানো রূপালি রূপ একেবারে নিভিয়া যায় নাই। কাছে গিয়া হারুকে দেখিবামাত্র শশী চিনিতে পারিয়াছিল।

ওরে গোবর্ধন, এ যে আমাদের হারু। এখানে ও এল কি করে ?

... ...

উপন্যাসটির সব কয়টি পরিচ্ছেদেই এই একই পদ্ধতি অবলম্বনে কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।

কথোপকথন আধুনিক উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কাহিনীকথক এই ক্ষেত্রেই নিজের কর্তৃত্ব উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর উপর সাময়িকভাবে তুলে দেন। অবশ্য একমাত্র কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেষণের নজির নেই বললেই চলে। উপন্যাস রচনার প্রাথমিক যুগে স্পেনীয় সাহিত্যিক ফার্দিনান্দো ড রোজাস কথোপকথনের সম্পূর্ণ আশ্রয় নিয়ে ক্যালিস্টো ও মেলিবিয়ার কাহিনী রচনা করেছিলেন।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কাহিনী পরিবেষণের অন্যতম মুখ্য মাধ্যম হিসাবে কথোপকথন স্থান পেয়েছে। ঔপন্যাসিক কথোপকথনের উপস্থাপনায় মূলত দ্বিবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এই দুই পদ্ধতিতে রয়েছে প্রত্যক্ষ কথন, (direct speech) এবং পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক কথন (indirect/substitutionary speech)। প্রত্যক্ষ কথনের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক স্বভাবতই সাময়িকভাবে স্বসৃষ্ট চরিত্রগুলির স্বাধীন সঞ্চরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন এবং কাহিনী-কথক হিসাবে নিজেকে একটু অন্তরালে রেখেছেন। প্রত্যক্ষ কথনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, কিন্তু কোন সময়েই উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার করেন নি।

শশী নাড়ী ধরিয়া বলে, জ্বর আসেনি বৌ।
মাথা ধরেছে যে ?
কতক্ষণ জলে ডুবিয়েছ তুমিই জানো, মাথার দোষ কি ?
কুসুম মাথা নাড়িয়া বলে, উঁহু, আমার ঠিক জ্বর আসছে, আমি গিয়ে শুলাম। যা লো মতি, আজ তুই রাঁধবি যা।

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ৩)

এই কথোপকথনের প্রথম এবং শেষ অংশটিতে প্রধান খণ্ডবাক্যে কাহিনী কথক তাঁর অস্তিত্ব রেখেছেন আলোচ্য উপন্যাসের কথোপকথন অংশগুলিতে ঔপন্যাসিক ভাষাপ্রকার (register)-এর ভিন্নতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন চরিত্রের বাচনিক বিশিষ্টতা স্পষ্ট করেছেন। শশী যে ভাষায় কথা বলে, গোবর্ধন সে ভাষায় কথা বলে না, এবং নিতাইয়ের সঙ্গে নবীনের ভাষাব্যবহারের পার্থক্য রয়েছে :

শশী বলিল, নৌকা ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যা গোবর্ধন। ওই শ্যাওড়া গাছটার কাছে। এখান দিয়ে নামানো যাবে না।

…গোবর্ধন বলিল, আপনি লায়ে বসবে এসো বাবু, আমি লাবাচ্ছি।

… … …

মাগুরটাগুর পেলি নবীন? পেলে আমাকে একটা দিস। ছেলেটা কাল পথ্যি করবে।

নবীন মিথ্যা জবাব দেয়। বলে, জলে দেঁড়িয়ে কি মিছা কথা কইছি, এত জলে মাছ পড়ে না। ইদিকে তিন হাত ফাঁক রইছে দেখছ নি?

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ১)

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক কথনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত এ ধরনের কথনের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক প্রত্যক্ষ কথনের উক্তিধর্মী বাক্য ব্যবহার না করে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর উক্তি নিজের ভাষায় বিবৃত করে কাহিনী পরিবেষণায় আত্ম-কর্তৃত্ব অক্ষত রাখেন। যেমন,

নিমরাজী হইয়া সে বলিয়াছে, বাড়িতে আর শশীর মত থাকিলে সে আপত্তি করিবে না। (পুতুল নাচের ইতিকথা / ৩)

ব্যাকরণের নিয়মে এই বাক্যটি স্পষ্টত পরোক্ষ উক্তিধর্মী।

দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধিত্বমূলক কথনে সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক অনেক সময় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মনোলোকের সংবাদ বিবৃত মৌন স্বগতোক্তি (narrated interior monologue)-র আকারে পরিবেষণ করেন :

শশী ভাবিল, এই বেশ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। কুসুমের এই কথাটাকে পরিহাসে দাঁড় করাইয়া দিলেই সে হাসিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ৫)

এই ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক কথনে ঔপন্যাসিক বাক্য শুরু করেন অনুভূতি/উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত ক্রিয়াপদ দিয়ে। আলোচ্য উপন্যাসে এসব ক্ষেত্রে উল্লিখিত শ্রেণীর ক্রিয়াপদের ব্যবহার রয়েছে :

পরিচ্ছেদ সংখ্যা	ক্রিয়াপদ	পরিচ্ছেদ সংখ্যা	ক্রিয়াপদ
১	(শশী) ভাবিল…	৫	(শশী) ভাবে…
১	(শশীর) মনে হইল…	৬	(শশীর) মনে হইল…
৩	(শশী) ভাবে…	৬	(গভীর দুঃখের সঙ্গে শশীর) মনে হয়…
৫	(শশী এটা) বুঝিয়াছিল…	১২	(তবু শশী) ভাবে…

কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রতিনিধিত্বমূলক কথনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক অবয়বের উপন্যাসে ব্যবহৃত বিবৃত মৌন স্বগতোক্তি (narrated interior monologue)-র আভাস সৃষ্টি করেছেন।

> কি আজ বিগড়াইয়া গিয়াছে মন। বাসুদেব বাড়ুয্যের বাড়িটা অন্ধকার, সামনে সেই প্রকাণ্ড আম গাছটা, যার ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া একটা ছেলে মরিয়াছিল। মরণের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শশীর, তবু সেই ছেলেটাকে আজ ভুলিতে পারিল না। চিকিৎসায় ভুল হইয়াছিল কি? দেহের ভিতর কি এমন কোন আঘাত লাগিয়াছিল ছেলেটার, সে যাহা ধরিতে পারে নাই? আজ আর সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই। তবু শশী ভাবে। গ্রামের এমন কত কি শশীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। এজন্য ভাবনা হয় শশীর। গ্রাম ছাড়িয়া সে যখন বহুদূর দেশে চলিয়া যাইবে, গ্রাম্য জীবনের অসংখ্য ছাপ যদি মন হইতে তাহার মুছিয়া না যায়? চিন্তা যদি তার এই সব খণ্ড খণ্ড ছবি দেখা আর এই সব ঘটনার বিচার করায় পর্যবসিত হয়।

এই পদ্ধতির পরিপূর্ণ প্রয়োগ করে জেমস জয়েস ইংরেজি উপন্যাসের কাহিনী নির্মিতিতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছিলেন। গত শতকে এই পদ্ধতির প্রাথমিক প্রয়োগে ইংরেজ উপন্যাসিক জর্জ মেরিডিথ ও হেনরি জেমস এবং একজন স্বল্পখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক দুজার্দিন অগ্রসর হয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে এই পদ্ধতি প্রথমে প্রয়োগ করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসে এবং পুতুলনাচের ইতিকথায় এই পদ্ধতি কোন কোন অংশে আভাসিত হলেও, তিনি এই নব্যপন্থায় কাহিনী রূপায়নে অগ্রসর হন নি। তাই, এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন অবিরল চেতনাপ্রবাহ অনুপস্থিত। চেতনা-প্রবাহী আধুনিক উপন্যাসে চরিত্রের মানস-ক্রিয়ার পূর্ণ বর্ণালী ও প্রবাহের মাধ্যমে কাহিনীর অগ্রগতি ঘটে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ সৃষ্টির উপাদান হিসাবে চরিত্রের চেতন ও অবচেতন চিন্তার সঙ্গে স্মৃতি, অনুভূতি, যথেচ্ছ অনুষঙ্গ ও উপলব্ধি সক্রিয় থাকে। এবং এই ক্ষেত্রে চরিত্রের মানস-ক্রিয়ার স্বাধীন সঞ্চরণের সুযোগ দিয়ে ঔপন্যাসিক দূরে সরে থাকেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসে এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' ঔপন্যাসিকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে সাধু ভাষায়। একমাত্র কথোপকথনের অংশগুলিতে প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন; কিন্তু, উপন্যাসের পরোক্ষ ও প্রতিনিধিত্ব মূলক কথনে সাধুভাষা ব্যবহার করে তিনি তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করেছেন। চরিত্রের মানস-লোকের খবরও তিনি তাঁর নিজের ভাষায় পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন। চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মন্তব্যের সুযোগ নেই। এদিক থেকেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলির কাহিনী-নির্মিতির ক্ষেত্রে আধুনিকতা সঞ্চারে অগ্রসর হন নি।

কাহিনীকথক হিসাবে তিনি মাঝে মাঝেই মন্তব্য করেছেন, এবং মন্তব্যের মাধ্যমে কখনো কখনো তিনি চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র সম্বন্ধে প্রস্তাবনা অংশে মন্তব্য করে ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটির পরবর্তী বিকাশের রূপরেখা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছেন :

> শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ এবং রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। তাহার কল্পনাময় অংশটি গোপন ও মূক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে একথা কেহ টের পাইবে না যে, তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে। তাহার বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবী প্রকৃতির পরিচয়ই মানুষ সাধারণত পায়। সংসারে টিকিবার জন্য দরকারী এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে। শশীর চরিত্রের এক দিকটা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বাবা গোপাল দাস।
>
> (পুতুলনাচের ইতিকথা / ২)

উপন্যাসিক প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ অংশে ঔপন্যাসিক বর্ণনা ও বিবরণের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশনার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বন্ধনীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন : 'কিন্তু প্রণাম করিয়া (যে গাছের তলা বাঁধানো, সেটি দেবধর্মী) মুখ তুলিতেই সামনে এত বড় একটা পুতুল পড়িয়া থাকিতে দেখিলে এ কথা মনে হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে যে এ কাজ দেবতার, এই তাহার ইঙ্গিত।' কয়েকটি ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক কাহিনী-কথক হিসাবে নিজের অস্তিত্ব পাঠকদের সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত দুটি উদাহরণ উপস্থিত করছি :

> মতির কথা গোড়া হইতেই বলি।
>
> (পুতুলনাচের ইতিকথা / ১০)

> গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতিও আজ এলোমেলো পথের জীবনকে বরণ করিল—আমাদের গেঁয়ে মেয়ে মতি। হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া ওদের চলিবে না—জীবন-যাপনের প্রচলিত নিয়মকানুন ওদের পক্ষেও অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। আজ সে কথা কিছুই বলা যায় না। পুতুল-নাচের ইতিকথায় সে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত—ওদের কথা এইখানেই শেষ হইল। যদি বলিতে হয় ভিন্ন বই লিখিয়া বলিব।
>
> (পুতুলনাচের ইতিকথা / ১১)

উৎকলিত প্রথম পংক্তিটিতে মতি-কুমুদের কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে দশম অধ্যায়ের শুরুতে ঔপন্যাসিক তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করেছেন পাঠকের কাছে। আর উদ্ধৃত শেষ অনুচ্ছেদটি (এটা উপন্যাসের একাদশ অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক অনুচ্ছেদ) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উপন্যাসের কাহিনী থেকে মতি ও কুমুদকে বিদায় দেবার মুহূর্তে তাদের জীবন-স্রোতের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধে মন্তব্য করে শেষ দুটি পংক্তিতে ঔপন্যাসিক নিজের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন পাঠকের কাছে। কাহিনী পরিবেশনায় মাঝে মাঝে নিজেকে উপস্থিত করার রীতি উপন্যাস-শিল্পের সনাতন ধারায় স্বীকৃতি পেয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঔপন্যাসিক হিসাবে এই সনাতন পন্থারই অনুগামী। কিন্তু, নিজের মন্তব্য করার অধিকারের সুযোগ নিয়ে অতীতের কোন কোন ঔপন্যাসিকের মতো, তিনি নীতি প্রচারে অগ্রসর হন নি। আধুনিক উপন্যাসে কাহিনী কথকের মন্তব্য, বিশেষত নীতিধর্মী মন্তব্য মর্যাদা পায় না ; এমন কি কথোপকথনের আশ্রয়ে নীতিপ্রচারও আধুনিক উপন্যাসের রাজ্যে নীতিবিগর্হিত।[৬] ঔপন্যাসিকের নীতিধর্মীতার উদাহরণ হিসাবে জর্জপেটির Amphiarans and Eriphile এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' স্মরণ করিতে পারি।

সুতরাং, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করার সুযোগ নিয়ে নীতিপ্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি ; কিন্তু বর্তমান আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর প্রত্যক্ষ কথন ছাড়া অন্যত্র, তিনি কাহিনীকথক হিসাবে নিজেকে, কখনো পরোক্ষভাবে, আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে, উপস্থিত রেখেছেন। উপন্যাসের আধুনিক আলোচনায় ঔপন্যাসিকের অস্তিত্বহীনতার দিকটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। আর আধুনিক 'exit-author thesis'[৭]-এর আলোকে বিচার করলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সনাতন-পন্থী হিসাবেই চিহ্নিত করা চলে। বিভিন্ন দিক থেকে চির-প্রচলিত পথ অনুসরণ করলেও কাহিনী রূপায়ণে, সাংকেতিকতা সৃষ্টিতে ও প্রতীকী প্রয়োগে পুতুলনাচের ইতিকথা'য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। 'পুতুলনাচ' শব্দটির মধ্যেই তিনি জীবনধারার অনিবার্য সংকেত রেখেছেন। একজন অভিধানকার এই শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, উৎসবাদিতে পুতুলের নৃত্যরূপ তামাশা। ইহাতে মানুষ পুতুল নাচাইয়া পৌরাণিক বা সাংসারিক বিষয়ের অভিনয় করে।' আলোচ্য উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর জীবনের অভিনয়ে যে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছে ; ঔপন্যাসিক তাদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাদের পরিচালনার ভার রেখেছেন নিজের হাতে।

---

৬. তদেব, পৃ. ৮।

৭ 'The belief that the author should intrude on the reader as little as he possibly can (that is the exit-author thesis in modern criticism) means that everything not going in quotation marks is seen by some readers, as an ugly signal, 'Here I am, the author !'

তদেব।

ঔপন্যাসিকের হাতে তারা পুতুল মাত্র। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞের অধিকার নিয়ে যাঁরা সরব তাঁরা ঔপন্যাসিককে সৃজনশীল ঈশ্বরের সমকক্ষ বলে মনে করেন। কিন্তু এই আলোচনার শুরুতেই বলেছি, নীৎশে যখন ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করলেন তখন থেকেই কাহিনী-নির্মিতিতে ঔপন্যাসিকের এই বিশেষ অধিকারের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন উপন্যাসের কোন কোন আলোকে। যাই হোক, উপন্যাসকারের ঐশ্বরিক অধিকার নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বসৃষ্ট পাত্র-পাত্রীর 'পুতুলনাচের' আয়োজন করেছেন উপন্যাসের পাতায়। আর জীবনের রঙ্গমঞ্চে মানুষের ভূমিকা ঈশ্বর যে পূর্ব-নির্ধারিত করে রাখেন সেই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিই উপন্যাস-রচয়িতা পুতুলনাচের ইতিকথায় ব্যক্ত করেছেন।

শেক্সপীয়র গোটা পৃথিবীকে একটা রঙ্গমঞ্চ বলে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি নাটকে কখনো এ্যান্টোনিও (The Merchant of Venice)[৮] কখনো জ্যাকস (As you Like It)[৯] আবার কখনো ম্যাকবেথের (Macbeth)[১০] মুখে এই কথাটি বিভিন্ন নাটকীয় মুহূর্তে, ভাষার একটু রকমফের করে, আমাদের শুনিয়েছেন। নাট্যকার যেমন তাঁর নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেন, রঙ্গমঞ্চে তাদের প্রবেশ ও প্রস্থান যেমন তাঁরই নিয়ন্ত্রণের অধীন, তেমনি বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মানুষের ভূমিকা স্থির করে দেন ঈশ্বর। এই দর্শনে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা মনে করেন যে নিয়তি মানব জীবনের নিয়ামক,—মানুষ নিয়তির হাতে পুতুলমাত্র। টমাস হার্ডি তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই মানব জীবনের এই অনিবার্যতার দিকটি উদ্ভাসিত করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'পুতুলনাচের ইতিকথা' রচনা করেন তখন তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন নি। সুতরাং এই উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পনা ও পরিবেশনায় তিনি নিয়তিবাদের প্রশ্রয়দানে দ্বিধা করেন নি।

উপন্যাসটির শিরোনাম থেকে শুরু করে উপন্যাসের কাহিনীতে পুতুল/পুতুলনাচ শব্দটি কাহিনীধারার বিভিন্ন অংশে ব্যবহার করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানবজীবনের অসহায়তা ও অমোঘতার সংকেত দিয়েছেন :

৮. Antonio. I hold the world but as the world Gratians, A stage, where every man must play a part, And mine a sad one.
(The Merchant of Venice, Act I, Sc. I)

৯, Jaques. All the worlds a stage,
And all the men and women merely players ;
They have their exits and entrances.
(As You Like It, Act II, Sc. 7)

১০. Macbeth. Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more.
(Macbeth, Act V, Sc. 5)

[১]···ন্যাকড়া-জড়ানো একটা পুতুল আছে। পুতুলটা শশী চিনিতে পারিল। বৈশাখ মাসে বাজিতপুরের মেলায় শ্রীনাথের দোকানে বসিয়া এক ঘণ্টা বিশ্রাম করার মূল্যস্বরূপ তাহার মেয়েকে পুতুলটা কিনিয়া দিয়াছিল। বিকালে বৃষ্টি থামিলে এখানে খেলিতে আসিয়া শ্রীনাথের মেয়ে পুতুলটা ফেলিয়া গিয়াছে।

রাত্রে পুতুলের শোকে মেয়েটা কাঁদিবে। সকালে বকুলতলা খুঁজিতে আসিয়া দেখিবে পুতুল নাই। পুতুল কে লইয়াছে মেয়েটা জানিতে পারিবে না। শশীই কেবল অনুমান করিতে পারিবে যামিনী কবিরাজের বৌ ভোর-ভোর বকুলতলা ঝাঁট দিতে আসিয়া দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। যামিনী কবিরাজের বৌ চোরও নয়, পাগলও নয়; মাটির পুতুলে সে লোভ করেনা। কিন্তু প্রণাম করিয়া (যে গাছের তলা বাঁধানো, সেটি দেবধর্মী) মুখ তুলিতেই সামনে অত বড় একটা পুতুল পড়িয়া থাকিতে দেখিলে এ কথা মনে হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে যে এ কাজ দেবতার, এই তাঁহার ইঙ্গিত।

পুতুলটিকে আরও খানিকটা গাছের গোড়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া আলোটা তুলিয়া লইয়া শশী আগাইয়া গেল।

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ১)

[২]···গ্রামের জমিদার শীতলবাবুর বাড়ি তিন দিন যাত্রা, পুতুলনাচ···।

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ৪)

[৩] নীচে সিন্ধু পুতুলখেলা করে, খাটে বসিয়া শশী অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে সে খেলা চাহিয়া দেখে।

খুকী বড় হয়ে তুই কি করবি ?

পুতুল খেলব।

এই একটিমাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হাল্কা হইয়া যায়। জানালা দিয়া সে বাহিরের দিকে তাকায়।···

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ৬)

[৪] পুতুলনাচের ইতিকথায় সে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত—ওদের কথা এইখানেই শেষ হইল। যদি বলিতে হয় ভিন্ন বই লিখিয়া বলিব।

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ১১)

[৫] মানুষ সংসারে চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ১২)

উৎকলিত অংশগুলি অনুসরণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, আলোচ্য কাহিনীর প্রথম থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদের মধ্যে কাহিনীকার 'পুতুল' বা 'পুতুলনাচ' কথাটি কয়েকবার ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম অংশটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অংশটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে শীতলবাবুর বাড়িতে যাত্রা ও পুতুলনাচ অনুষ্ঠিত হবে, একথা পাঠককে জানানো হয়েছে। যাত্রার অনুষ্ঠানের সঙ্গে, কাহিনীর এই অংশে, কুমুদকে কেন্দ্র করে মতির প্রেমের পূর্বরাগ-পর্ব পরিবেষিত হয়েছে, কিন্তু পুতুলনাচ অনুষ্ঠানের বিষয়টি কেবলমাত্র উল্লেখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সুতরাং 'পুতুলনাচ' কথাটি উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে নি। আর চতুর্থ উদ্ধৃতিটিতে মতি-কুমুদের কাহিনীর সমাপ্তি ঘোষণা প্রসঙ্গে উপন্যাসের শিরোনাম উল্লেখের মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে। প্রথম উদ্ধৃতিটি উপন্যাসের প্রস্তাবনা (exposition) অংশের অন্তর্গত। গাছের গোড়ায় বাঁধা বেদির ওপর পড়ে থাকতে দেখলে সেনদিদির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'এ কাজ দেবতার, এই তাহার ইঙ্গিত।' মানুষের জীবন যে দেবতার ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে থাকে সে বিষয়ে ঔপন্যাসিক এখানে প্রাথমিক সংকেত দিয়েছেন। উদ্ধৃত তৃতীয় অংশটিতে কাহিনী-প্রবৃদ্ধি (growth of aotion)-র একটি বিশেষ পর্যায়ে ঔপন্যাসিক পুতুলখেলা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। কাহিনীর এই পর্যায়ে শশীর 'গ্রাম্যজীবনে বিতৃষ্ণা' এসেছে। এই বিতৃষ্ণার প্রধান কারণ, তার সযত্নলালিত কল্পনার 'মহামানবী'কে কুসুম মিথ্যায় পরিণত করেছে। এ ধরনের মানসিক অবস্থায় শশীর একমাত্র ভাল লাগে মতি আর সিন্ধুর সঙ্গ। শশী মনোযোগের সঙ্গে ছোট বোন সিন্ধুর পুতুলখেলা দেখে এবং বড় হয়েও সিন্ধুর পুতুলখেলার বাসনার কথা শুনে 'ক্ষণকালের জন্য শশীর মন একেবারে হাল্কা হয়ে যায়।' মানুষের জীবন যে পুতুল খেলারই প্রতিভাসমাত্র, মনে মনে এই প্রত্যয়ে পৌঁছে সে সম্ভবত হাল্কা বোধ করে। বাইরের দিকে তাকিয়ে সে লক্ষ্য করে, গোলাপের যে চারটি কুসুম মাড়িয়ে দিয়েছিল তার পরিচর্যায় সেটি আবার মাথা তুলেছে। প্রেমের পুতুলখেলায় একজন গোলাপের চারা মাড়িয়ে দেয়, আর একজন তাকে সযত্নে সজীব করে তোলে। পঞ্চম উদ্ধৃতিটি কাহিনীর অন্তিম-পর্বের অন্তর্গত। মানুষ যে নিয়তির হাতে পুতুলমাত্র সেকথা ঔপন্যাসিক এবার স্পষ্ট করলেন কুসুমের বাবা অনন্তর জবানীতে. মানুষ-পুতুলের 'নৃত্যরূপী তামাশা' আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে 'পুতুল'/'পুতুলনাচ' মানব/মানবজীবনের প্রতীক হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। বহুদিনের বহুমানুষের চিন্তা ও চেতনায় পুতুলের সঙ্গে মানবজীবনের ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি হয়ে সর্বসাধারণের প্রতীকে (ইংরেজিতে যে ধরনের প্রতীককে publio symbol বলে) পরিণত হয়েছে। এই ধরনের প্রতীকী প্রয়োগ করেছেন অনেকেই, যেমন করেছেন শেক্সপীয়র বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যাই হোক, আলোচ্য উপন্যাসের শিরোনামেই কাহিনীর সার্বিক প্রতীকত্ব প্রকাশিত। অনেক সময় কাব্যে-নাটকে-সাহিত্যে এমন এক ধরনের প্রতীক ব্যবহৃত হতে পারে যার তাৎপর্য রচয়িতার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি। 'গোলাপ' শব্দটি প্রেমের

সাধারণ প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, বার্নস, যেটস এবং আরো অনেক কবির প্রেমের কবিতায়। চারা বা চারাগাছ শব্দও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচনায় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু, 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' উল্লিখিত 'গোলাপ' এবং 'চারা' শব্দ দুইটি একসঙ্গে (গোলাপের চারা) ব্যবহৃত হয়ে শশী ও কুসুমের প্রেমের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। এই দুটি চরিত্রের প্রেম কাহিনীর ঘটনা-পরম্পরায়, তাদের প্রেমের প্রতীক-প্রকাশের মুহূর্তে, 'গোলাপের চারা'র অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে, ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের পক্ষে এক একান্ত প্রতীক সৃষ্টি করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক 'গোলাপের চারা' লালন করেন, আর তার কল্পলোকের 'মহামানবী' নায়িকার প্রতীক 'গোলাপের চারা' অনবধানে পদদলিত করে বাস্তবলোকের নায়িকা। কাহিনীর প্রবৃদ্ধি-পর্বে (growth of action), পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, নায়ক-নায়িকার বিশেষ দুটি মুহূর্তে, ঔপন্যাসিক 'গোলাপের চারা'র অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছেন।

> বাগান দিয়া আসিয়া ঘরের জানালার ফাঁকে ফিসফিস করিয়া কুসুম ডাকিল, ছোটবাবু শুনুন।
>
> শশী ঘুরিয়া বাগানে গিয়া ছাখে জানালার নীচে তাহার অত সাধের গোলাপ-চারাটি কুসুম দুই পায়ে মাড়াইয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছে।
>
> গাছটা মারালে কেন বৌ ? কিসে দাঁড়াচ্ছ দেখতে হয়।
>
> (পুতুলনাচের ইতিকথা / ৫)

অথবা,

> জানালার নীচে সেদিন কুসুম যে গোলাপের চারাটি মাড়াইয়া দিয়াছিল, শশীর যত্নে সেটি আবার মাথা তুলিয়াছে।
>
> (পুতুলনাচের ইতিকথা / ৬)

এই উপন্যাসে গ্রামের দুয়েকটি জায়গা, তালপুকুর / তালবন এবং টিলা (চতুর্থ / পঞ্চম / ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, কাহিনীর বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত হয়ে এই উপন্যাসের পক্ষে একান্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই তালপুকুর / তালবনে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর প্রেমের প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত। এই তালপুকুর / তালবনে মতি-কুসুমদের প্রেমের পূর্বরাগ পালা অনুষ্ঠিত হয়েছে (চতুর্থ পরিচ্ছেদ); আবার এই একই জায়গায় শশী সর্বপ্রথম তার প্রেমের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে (তবু কুসুমের হাতখানা সে ছাড়িল না। ...আমার সঙ্গে চলে যাবে বৌ ? —ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ), আর এখানেই কুসুম তার প্রেমের মৃত্যু ঘোষণা করেছে (কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে ? কুসুম কি বেঁচে আছে ? সে মরে গেছে। —ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)। 'টিলা'র সঙ্গে এই উপন্যাসের নায়ক শশীর এক অসহায়, অনির্বচনীয়, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি যুক্ত করা হয়েছে :

…তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যতও তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। …সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে শশী জানে না কিন্তু আর কখনো নিঃশ্বাস সে লইতে পারিবে না।

(পুতুলনাচের ইতিকথা / ৫)

প্রসঙ্গত এই উপন্যাসের শেষ দুই-একটি পংক্তিও লক্ষণীয় :

…তার ওপাশে তালবন। তালবনে শশী কখনো যায় না। মাটির ঢিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার সখ এ জীবনে আব একবারও শশীর আসিবে না।

পুতুলনাচের ইতিকথায় প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ইঙ্গিত ও সাংকেতিকতার সৃষ্টি করে ঔপন্যাসিক তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন। আর কাহিনী নির্মিতিতে, বিভিন্ন সনাতন-পদ্ধতির সংমিশ্রণের মধ্যেও তিনি তাঁর স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। তবে তাঁর মতো প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক কাহিনী নির্মিতিতে নতুন পন্থার উদ্ভাবন করলে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক সমৃদ্ধতর হয়ে উঠত।

রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনায় শিক্ষাচিন্তা ও আজকের ভারতবর্ষে তার প্রাসঙ্গিকতা

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। মহাকাব্য তিনি লেখেননি কিন্তু তিনি সেই মহৎ প্রতিভার অধিকারী বিরল মানবদের একজন মহাকবি আখ্যা যাঁদের সম্পর্কে সত্যই প্রযুজ্য হতে পারে। তাঁর প্রতিভার মহত্ব কোথায়? মহত্ত্ব তার সমগ্রতায়, তাব বিপুলতায়। পৃথিবীর অন্যান্য মহাকবিদের স্মরণ করলে—বাল্মীকি, হোমর, দান্তে, শেক্সপীয়রের মতো মহৎ কবিদের তুলনা করলেই তাঁর প্রতিভার এই মহত্বকে বুঝতে পারি। বিপুলতার সঙ্গে বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্যের সঙ্গে উৎকর্ষ, উৎকর্ষের সঙ্গে এমন সমগ্রতা পৃথিবীতে এমন লেখক দুর্লভ। রবীন্দ্র-রচনার অফুরন্ত প্রাচুর্য তাঁর মহত্ত্বের যেমন পরিমাপক তেমনি তাঁর সত্যকার পরিচয়ের পথে সর্বপ্রধান বাধা। স্বল্প পরিসরে তাঁর প্রতিভার যে কোনও একটি দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা বড় দুরূহ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান, গল্প-উপন্যাস, নাটক-প্রহসন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিঠিপত্র ও চিত্রাবলী নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, সেই তুলনায় তাঁর সমাজভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কম। অথচ বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাইরে যে পৃথিবী, সেখানেও রবীন্দ্রমানসের ব্যাপ্তি বিস্ময়কর, তাঁর কর্ম প্রেরণার অভিব্যক্তিও অপরূপ। এই পৃথিবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তন ও মননকে সংক্ষেপে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনা নাম দিতে পারি—সমাজ বিজ্ঞানের বহুতর বিভাগকে কেন্দ্র করে যা রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্র-সমাজ চিন্তার একটা দিক—'সমাজ-ভাবনায় তার শিক্ষাচিন্তা ও আজকের ভারতবর্ষে তার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আমরা এখানে সামান্য আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। তাঁর সমাজ-ভাবনার সামগ্রিক আলোচনা করা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

শিক্ষা বলতে আমরা সাধারণত স্কুল কলেজের শিক্ষাকেই বুঝি এবং বিদ্যা ও শিক্ষা —এই দুটি কথাকে আমরা সমার্থবোধক বলে মনে করি ও ব্যবহার করি। কিন্তু বিদ্যা ও শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কিছুটা পৃথক ছিল। তিনি বিদ্যাদানের কথা যৎ সামান্যই বলেছেন, সারাজীবন শিক্ষার কথাই বলে গেছেন। তার কারণ বিদ্যার চেয়ে শিক্ষা ঢের বড়ো জিনিষ। বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেই যেমন ধার্মিক হওয়া যায় না, বিদ্যালাভ করলেই তেমনি শিক্ষিত হওয়া যায় না। অধীত বিদ্যার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের যোগ নেই বলে দেখা যায় যেমন তেমন বিদ্বান ব্যক্তি মূলত অশিক্ষিত, মুখস্থ বিদ্যা যখন ধাতস্থ হবে তখনই তার নাম শিক্ষা। তথাকথিত স্কুলের বিদ্যা বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝতেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক—

"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে কল চলিতে আরম্ভ হয়। মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন। ছাত্রেরা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।"

এই 'মার্কা মারা' বিদ্যার প্রতি কবিগুরুর বরাবরই বিতৃষ্ণা ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনদিন বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মাঝখানে আবদ্ধ থেকে এই বিদ্যালাভ করতে পারেন নি। তিনি উপলব্ধি করেছেন আমাদের বিদ্যালয়গুলো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অসম্ভব বস্তু। প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ তাতে নেই; ছাত্র শিক্ষকের মধ্যকার সম্পর্কও সেখানে অস্বাভাবিক। ছাত্রেরা গুরুর হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ পায় না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের মাথার বিদ্যার বোঝা ছাত্রের মাথার মধ্য দিয়ে পরীক্ষার খাতায় স্থানান্তরিত হয়—হৃদয়ে হৃদয়ে যোগের কোনও প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। ছাত্র-শিক্ষকের এই কৃত্রিম সম্পর্ক তাঁর কাছে দুঃসহ বলে মনে হয়েছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে তিনি ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ককে সর্বাগ্রে স্বাভাবিক সহজ করে তুলতে চেয়েছিলেন। তারপর শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ করে তুলতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে শ্রীনিকেতনের কর্মমুখী শিক্ষা যুক্ত হয়ে তাঁর শিক্ষার আদর্শকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির শুধু চর্চা হয়ে থাকে তাই নয়, তার কোমলতর প্রবৃত্তি গুলিরও যাতে জাগরণ ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শিল্পচর্চা বিশেষতঃ ছবি ও গান শান্তিনিকেতনের ছাত্রজীবনের প্রধান অঙ্গ। সেই সঙ্গে কর্মমুখী শিক্ষাচর্চার ব্যবস্থাও আছে শ্রীনিকেতনে।

কবি বুঝেছিলেন, শিক্ষার অভাব দূর করতে না পারলে মানুষের সাহস বীর্যবত্তা কর্মৈষণা সব কিছুই নিষ্ফল হয়, তখন ভীরুতা আর গ্লানিভার-জর্জরিত জীবন সমাজ-কল্যাণ তথা মানব-কল্যাণের পথকে রোধ করে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে, মানুষের উন্নতি-প্রচেষ্টায় সমাজ-সংস্কারকের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার ও দেওয়ার জন্যে ভাবনা-চিন্তা করা। আর শোষণ-মুক্তির পথ হচ্ছে শিক্ষা, তাই তিনি বলেন—

> "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা। ডাকিয়া বলিতে হবে—মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে; যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে, যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে পথ কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে..."

একথা শুধু মুখে বলাই নয়, জনগণকে শিক্ষাদানের কাজেও তিনি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

জমিদারী পরিচালনার কাজ মন দিয়ে কবি বুঝেছিলেন—"হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষিত সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোন ভাল আইন বা অনুকূল রাজশক্তি দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না।" শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ ঘটলে মানবসমাজে নিষ্ঠুরতার অবসান ঘটবে এবং সকল সামাজিক অসঙ্গতি দূর হবে এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য।

তাই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য কবি নিজ জমিদারীতে দু'শর মতো অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ করেন। রাত্রির ও দিনের উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয়; শিশু এবং বয়স্ক সকলেরই জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শেষ হলেই পড়া লেখা এবং পাটিগণিত (Reading, Writing, Aarithmatic) শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হত। এই শিক্ষা কিছুদূর এগোলে বক্তৃতা দ্বারা ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির পাঠ দেওয়া হত। প্রধান লক্ষ্য থাকত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল, আনুষঙ্গিকভাবে পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোলও তাদের শেখানো হত। এর সঙ্গে মুখে মুখে আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্য (First aid), কৃষিকর্মের সুবন্দোবস্ত, আগুন নেভানো ও বন্যার সময় কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হত, অবসর সময়ে পৃথিবীর খবরাখবর শোনানোরও ব্যবস্থা ছিল।

গণশিক্ষার জন্য পরবর্তীকালে ১৯২২-২৩ সালে শান্তিনিকেতনেও তিনি লোকশিক্ষা সংসদ, ব্রতীদল গঠন করেন, শিক্ষাসত্র পরিকল্পনা করেন; বয়স্ক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয়, ভ্রাম্যমাণ পল্লী পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পরিকল্পনার মূলে নিহিত ছিল যে গণশিক্ষার আদর্শ তা সাক্ষরতার লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার লক্ষ্য ছিল সুসম্পূর্ণ সামাজিক শিক্ষা, সেই সব জ্ঞান- আদর্শ ও কর্মনৈপুণ্যের স্ফুরণ যার সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তি পল্লীসমাজের একটি সক্ষম ও সার্থক অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। আর এই গণশিক্ষার তথা সর্বব্যাপী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তিনি মাতৃভাষাকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মাতৃভাষায় শিক্ষা না হলে সে শিক্ষায় প্রাণের স্পর্শ থাকে না। তিনি বলেছেন "বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই।" তার প্রধান কারণ এখানে বিজাতীয় ভাষাকে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমরূপে এতদিন কর্তৃত্ব করেছে। তিনি বলেছেন যে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমরা উচ্চশিক্ষা হয়তো পাব কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া উচ্চাঙ্গের চিন্তা স্বাধীন চিন্তা করার শক্তি পাব না। দেশের বৃহত্তর জনসমাজের মন মেলে মাতৃভাষায়—তাই সার্বিক শিক্ষা দেওয়া দরকার মাতৃভাষায়। বাংলাকে শুধু শিক্ষাদানের ভাষা না, সবরকম ভাব আদান প্রদানের তথা শান্তিনিকেতনের জীবনেরই ভাষা করেছিলেন তিনি, এমনকি এখানে ইংরাজী পড়ানোর ভাষাও ছিল বাংলা।

কবি চেয়েছেন শিক্ষা হবে জীবন নির্ভর, পরিপূর্ণ শিক্ষা—যা বুদ্ধি হৃদয় ও কর্মের সম্মিলনেই সম্ভব, আর এই শিক্ষা হবে আনন্দের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীর সহজ বোধ বুদ্ধি ও স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করেই। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্রই স্বাবলম্বন নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে—তাকে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দময় করে তুলতে চেয়েছিলেন। যাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজের দৈহিক মানসিক আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কল্যাণ এবং অন্যের কল্যাণ ও উন্নতিকে প্রাধান্য দেয়। তাঁর সহানুভূতির বিস্তৃতি ঘটায়। অশিক্ষিত মন একান্তভাবে আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকে, শিক্ষিত মনের সহানুভূতি আপনাকে, আপন পরিবারকে অতিক্রম করে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীকে ছাড়িয়ে আসল সমাজ,—সমাজকে ছাড়িয়ে দেশ এবং দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিদেশ—এক কথায় সমগ্র মানব সমাজে পরিব্যাপ্ত। কবির বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই বোধ। বস্তুতঃ রবীন্দ্র কল্পনায় শান্তিনিকেতন শুধুমাত্র একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, তিনি তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটা জীবন পদ্ধতি হিসেবে।

শিক্ষাকে তিনি কেবল বৃত্তিমুখী করতে চাননি—শিক্ষা হিসাবেই দেখেছেন। যে শিক্ষা মনুষ্যত্বের শিক্ষা, চিত্তপ্রসারণের শিক্ষা, জীবিকা আহরণের শিক্ষা মাত্র নয়। আজকের দিনে শিক্ষার এ মৌলিক উদ্দেশ্যটি লুপ্ত হয়েছে। অথচ শিক্ষাকে জীবন যাত্রার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাক যন্ত্রের খাদ্য হয় না। মনকে গড়ে তোলার জন্য খানিকটা পুঁথিগত বিদ্যার দরকার আছে ; মনীষী ব্যক্তিদের মনীষা এবং মহৎ চিন্তার সঙ্গে পরিচয় মানসিক উৎকর্ষের জন্য অত্যাবশ্যক কিন্তু কেবল মাত্র পুঁথির জগতে আবদ্ধ থাকলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চারপাশের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হলে, দেশের মাটির সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় হলে, তবেই শিক্ষার মূলগত উদ্দেশ্য দেশকে জাতিকে গড়ে তোলা—সম্ভব হয়ে ওঠে। আত্মার বিকাশ এবং বন্ধনমুক্তি যদি শিক্ষার দ্বারা লভ্য না হয়, তবে সে শিক্ষা নিরর্থক।

এই সার্বিক শিক্ষা তথা সার্বজনীন শিক্ষা প্রতিটি অনগ্রসর দেশ এবং উন্নতিকামী দেশের পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন। দেশের সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতা মূঢ়তা অদৃষ্টবাদ হতে রেহাই দিতে পারবে যে শিক্ষা তাকেই কবি গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু তাই নয়—কবি বোঝাতে চেয়েছেন সার্বিক উন্নতি তথা সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন গণ শিক্ষার। তাই শিক্ষা মানে কেবল সাক্ষরতা নয়। তা জনসাধারণের দেহ মন সমাজ সব কিছুকেই যেন বিকশিত করে তোলে। এ কথাটা কবি ১৮৯৪ সালে শিলাইদহে জমিদারীর কাজে হাত দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগে কবি স্বচক্ষে দেখেছেন—

বড়ো দুঃখ—বড়ো ব্যথা। সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র শূন্য বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।

এই অন্ধকার দূর করতে পারে শিক্ষা—ব্যাপক শিক্ষাদান ছাড়া জনমন থেকে জমাট অন্ধকার দূর করার অন্য উপায় নেই। তাই ১৩০০ সালেই কবি নিজেকে কর্তব্যবিমুখ সংশয় পলাতক বালকের সঙ্গে তুলনা করে—কল্পনা ও সৌন্দর্যলোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আত্মধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছেন—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ আজি···

এটা একটা আঞ্চলিক বা সাময়িক ডাক মাত্র নয়, এর একটা নিহিতার্থ আছে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা গুরুদেব বলে থাকি অবশ্যই, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু হবার কারণ, তাঁর কাছ থেকেই বলতে গেলে আমরা ভাষা শিক্ষা করেছি। বাংলা ভাষা যে এত সুন্দরভাবে বলা বা লেখা চলে এ কথাটা তাঁর লেখা পড়েই আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। তিনি সুরের গুরু বাঙালীকে গানের সুরে দীক্ষা দিয়েছেন। বাঙালী আজ আনন্দ-বেদনায়, হাসি-কান্নায়, জন্ম-মৃত্যুতে তাঁর গানকেই শ্রবণ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত তাই আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তাঁর অকৃপণ লেখনীর অফুরন্ত বর্ষণে বাংলা সাহিত্য এতদূর উন্নত হয়েছে যে এই সাহিত্য যেন কৈশোর থেকে যৌবনে ; যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তাঁর এই বিরাট কীর্তির জন্যই তিনি জগদ্বিখ্যাত—আমাদের কাছেও, তাঁর এই কবি পরিচয়ের আবরণে আর এক পরিচয় যেন ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র কবি হিসাবেই আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক নয়। আমরা দেখলাম তিনি সমাজ-চিন্তাবিদরূপেও জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের পাশেই আপন করে নিতে পারেন এবং সে দিক থেকে তিনি আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। কোনো মতবাদের প্রভাবে পড়ে নয়। নিজের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারের মূল কথাটি যেভাবে ধরতে পেরেছিলেন এবং "ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা ও বাইরে কর্মযোগে তার প্রকাশ" যেভাবে দেখিয়েছেন তা ভাবলে আজও আশ্চর্য হতে হয়। তাঁর ঋষিদৃষ্টিতে ভবিষ্যত ভারতের উন্নতির পথ ধরা দিয়েছিল—আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে তিনি যে কথা বলেছেন যে কাজ করেছেন আজকের স্বাধীন ভারতেও তা কত মূল্যবান সে কথা একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারি। তাঁর সমাজ ভাবনা যে কতদূর পর্যন্ত মৌলিক ছিল তার প্রমাণ রয়েছে কবির এ'সব পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনায়। বর্তমান স্বাধীন ভারত সরকার যে সমাজ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাতে অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ভারত সরকার সমাজ উন্নয়নে যে সব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার অনেকগুলিই রবীন্দ্র আদর্শে গড়া—তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে কমিউনিটি ডেভলপমেন্টের উপদেষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রভক্ত লেনার্ড এলম্‌হার্স্টকেই ডেকে এনেছিলেন

জহরলাল। তাই পল্লী উন্নয়ন তথা সমাজ উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রেই পথিকৃতের মর্যাদা দাবী করতে পারেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হলে ভারতের সমাজউন্নয়নও ত্বরান্বিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তায় শিক্ষায় গুরুত্ব আমরা বিশ্লেষণ করে দেখলাম— "আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত।" (রাশিয়ার চিঠি, ১ম পত্র)

১৯৩০ সালে কবি রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার উন্নতি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। অনুসন্ধানে জেনেছেন সেখানকার আশ্চর্য প্রদীপটি যে জ্বালিয়েছে তার নাম শিক্ষা। ঐ শিক্ষা দিয়ে আমাদেরও উন্নয়ন সম্ভব।" রাশিয়া আরও প্রায় অর্ধশতক ধরে যে পথে তার উন্নতি ত্বরান্বিত করেছে, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল আগে যে পথের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন, আমরা কি আজও সে পথ ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছি। তাহলে স্বাধীনতা লাভের চুয়াল্লিশ বছর পরেও আমাদের দেশের এ হাল কেন? এদেশে এতো মানুষ এখনো এত নিঃসহায়, এমন নিষ্কর্মা হয়ে রয়েছে কিসের জন্য! কাগজে কলমে এদেশেও তো প্রচুর আয়োজন প্রচুর উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কাজের কাজ কতটুকু হয়? কবি গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে যে সব কথা ভেবেছেন ও তাকে কাজে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আজকেও তার বেশী কিছু আমাদের বলার বা করার নেই কেবল এর জন্য চাই শক্তি, চাই উদ্যম, চাই কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি ও শুভ ইচ্ছা। তা হলে কবির প্রায় প্রায় শতবর্ষ পূর্বে উচ্চারিত সেই আশা আমরা পূর্ণ করতে পারবো—সকলের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আনন্দ এই পরিকল্পনা সার্থক হয়ে উঠবে। কবি সেদিন বলেছিলেন—

> "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
> সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।"

কবি জন্মের শতোত্তর উনত্রিংশ বর্ষে আমরা সকলে আদর্শ গ্রাম সংগঠনের সংকল্প গ্রহণ করে কবির ভাষাতেই বলি—

> "আমরা যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতার অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতবর্ষের একটি ছোট আদর্শ তৈরী হবে।"

কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ-গঠনে যদি আমরা কিছুটা সফল হই, যদি শিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্র ভাবনার কিছুটা কাছে এসেও আমরা পৌছতে পারি, তাহলেই বুঝতে পারব রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনার শিক্ষাচিন্তা আজকের ভারতেও কতদূর প্রাসঙ্গিক।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় পত্রগুচ্ছের প্রয়োগ

মানস মজুমদার

এক

ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে অভিনব। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র অন্তত তিনটি গীতিকায় পত্রগুচ্ছের প্রয়োগ ঘটেছে। গীতিকা তিনটি হোল: চন্দ্রাবতী, কমলা ও দেওয়ান ভাবনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'কে মধ্যযুগের সাহিত্য-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন॥ 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর কোনো শাখায় পত্রের ব্যবহার চোখে পড়ে না। সেদিক থেকে ঐ তিনটি গীতিকার স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য।

স্বভাবতই পত্র-সন্নিবেশের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে এগুলির সার্থকতা সম্বন্ধেও।

দুই

'চন্দ্রাবতী' গীতিকায় মোট ছ'খানি পত্র রয়েছে। প্রথম পত্রটি জয়ানন্দের লেখা। চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে। চন্দ্রাবতীকে সে ভালোবাসে। কিন্তু চন্দ্রাবতীর কাছে তার ভালোবাসার কথা সংকোচহেতু নিজমুখে প্রকাশ করতে পারে না। সে তাই পত্রের সাহায্য নেয়:

কইতে গেলে মনের কথা কইতে না জুয়ায়।
সকল কথা তোমার কাছে কইতে কন্যা দায়॥
মাও নাই বাপ নাই থাকি মামার বাড়ী।
তোমার কাছে মনের কথা কইতে নাহি পারি॥
যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন।
সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন॥
তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই।
সর্বস্ব বিকাইবাম পায় তোমারে যদি পাই॥...
তুমি যদি লেখ পত্র আশায় দেও ভর।
যোগল পদে হইয়া থাকবাম তোমার কিঙ্কর॥

পত্রটি আত্মনিবেদনমূলক। চন্দ্রাবতীর প্রতি জয়ানন্দের ভালোবাসার অকপট প্রকাশ পত্রের প্রতিটি ছত্রে লক্ষণীয়। জয়ানন্দের মনোভাব প্রকাশে পত্রটি যে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে পত্রটির প্রয়োজন স্বীকার করতেই হয়।

জয়ানন্দ আলোচ্য গীতিকার নায়ক। পত্রটি নায়ক-চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটক। বাল্যেই সে মাতাপিতাহীন। স্নেহ-ভালোবাসার কাঙাল। তার সেই কাঙালপনাই পত্রটিতে অভিব্যক্ত। জয়ানন্দের এই স্বভাব-দুর্বলতাই তার পরিণতির হেতু। জয়ানন্দের আবেগপ্রবণতা ও স্পর্শকাতরতার পরিচয়ও পত্রটিতে লভ্য। পত্র-সহায়তায় স্বল্প পরিসরে জয়ানন্দ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। ঘন সংহত প্রকাশরীতিটি প্রশংসাযোগ্য। বলা বাহুল্য, পত্র-সন্নিবেশ হেতুই তা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম পত্রের সূত্রেই দ্বিতীয় পত্রের অবতারণা। জয়ানন্দের পত্রের উত্তরে চন্দ্রাবতীর পত্ররচনা। চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের পত্রপাঠে খুশি হয়েছে। তার চোখে দেখা দিয়েছে আনন্দাশ্রু। চন্দ্রসূর্যকে সাক্ষী রেখে মনে মনে জয়ানন্দকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করেছে। পত্রের উত্তরে কিন্তু তার প্রকৃত মনোভাবটুকু সে জয়ানন্দের কাছে প্রকাশ করেনি। নারীর স্বভাবসুলভ লজ্জা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। চন্দ্রাবতী কুমারী কন্যা। পিতা দ্বিজ বংশীদাস নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। অসাধারণ তাঁর কুলমর্যাদা। চন্দ্রাবতী পিতৃ অনুগতা। পিতৃআজ্ঞা তার কাছে শিরোধার্য। জয়ানন্দকে তাই সে পিতার শরণাপন্ন হতে বলে :

ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী॥

চন্দ্রাবতীর নির্দেশকে অবশ্যমান্য করেই জয়ানন্দের পক্ষ থেকে দ্বিজ বংশীদাসের গৃহে ঘটকের আবির্ভাব ঘটেছে। জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিয়ের প্রস্তাবে দ্বিজ বংশীদাস সম্মতি জানিয়েছেন। চন্দ্রাবতীর পত্রটি এভাবেই ঘটনার অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে। সেদিক থেকে পত্রটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। চন্দ্রাবতী চরিত্রের পরিচয়ও পত্রটিতে লভ্য। যে লজ্জাশীলা, সমাজভীরু, পিতৃ অনুগতা ও সংযমপ্রবণাশ স্বভাবে অন্তর্মুখী। জয়ানন্দের প্রতি তার প্রেম আন্তরিক। এ সমস্ত দিক থেকে আলোচ্য গীতিকার দ্বিতীয় পত্রটির প্রাসঙ্গিকতায় সন্দেহ থাকে না।

তৃতীয় পত্রটি জয়ানন্দের। সুন্দরী মুসলমান কন্যার উদ্দেশে এই পত্র-রচনা। রূপমুগ্ধ জয়ানন্দ তার প্রতি পতঙ্গবৎ ধাবিত হয়। সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয় চন্দ্রাবতীকে। মুসলমান কন্যাকে প্রেম নিবেদন করে তার উদ্দেশে পত্র লেখে :

নিতি নিতি দেখ্যা তোমায় না মিটে পিয়াস।
প্রাণের কথা কও কন্যা মিটাও মনের আশ॥
পরকাশ কইরা কইতে নারি মনেব কথা ধর।
তুমি কন্যা এই জগতে প্রাণের দোসর॥

পত্রের মাধ্যমেই মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়ানন্দের প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পত্রটি তাই গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রসূত্রেই একসময় মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়ানন্দের বিয়ে হয়। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ঘটনার অগ্রগতিতে পত্রটির ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। জয়ানন্দ আবেগপ্রবণ, দুর্বলচিত্ত, অস্থিরমতি। পত্রটি তার পরিচয়বহ। মুসলমান কন্যার

সঙ্গে জয়ানন্দের প্রণয়-সম্পর্কের বিস্তৃত কোনো বিবরণ আলোচ্য গীতিকায় অনুপস্থিত। একটি পত্রে শুধু প্রণয়-সূচনার ইঙ্গিতটুকু পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায়, এই একটি পত্র বহু বাকবিস্তারের সম্ভাবনা হ্রাস করেছে। পত্রপ্রয়োগের এই কৌশলটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়ানন্দের দাম্পত্য-সম্পর্কের কোনো বিস্তৃত বিবরণও আলোচ্য গীতিকায় নেই। অবশ্য চন্দ্রাবতীকে লেখা জয়ানন্দের একটি পত্রে তার কিছুটা আভাস আছে। জয়ানন্দের এটি তৃতীয় পত্র, গীতিকায় চতুর্থ পত্র। তুলনামূলকভাবে আয়তনে এ পত্রটি বেশ বড়ো।

চন্দ্রাবতীকে লেখা এ পত্রের ছত্রে ছত্রে জয়ানন্দের আক্ষেপ ও আর্তনাদ ধ্বনিত। মোহভঙ্গ ঘটেছে তার। মুসলমান কন্যার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের হয়নি। যন্ত্রণাদগ্ধ গ্লানিজর্জর জয়ানন্দ তাই অনুতপ্ত :

শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই ॥

জয়ানন্দের প্রেমপিপাসা অচরিতার্থ। দুঃখ বেদনা আর হতাশায় তার অন্তর পরিপূর্ণ। জয়ানন্দের স্বীকারোক্তিতে পাই :

অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল ॥···
জলে বিষ বাতাসে বিষ না দেখি উপায়।
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমার পায় ॥

অথচ এই চন্দ্রাবতীর ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেই মুসলমান কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে। জয়ানন্দ তার ভুল বুঝতে পারে। চন্দ্রাবতীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চায় :

একবার দেখিব তোমায় জন্মশেষ দেখা।
একবার দেখিব তোমার নয়নভঙ্গি বাঁকা ॥
শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের মালা।
তোমারে দেখিতে কন্যা মন হইল উতালা ॥

চন্দ্রাবতীর শৈশব সহচর সে। একদা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসা অত্যন্ত সত্য ছিল। সাময়িক ভুলবশত জয়ানন্দ সেই ভালোবাসার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, ভালোবাসাকে আঘাত করেছে। কুপিত ভালোবাসা প্রতিশোধ নিয়েছে। জয়ানন্দের দাম্পত্য জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দহনজ্বালায় দগ্ধ জয়ানন্দ ক্ষণিকের জন্য চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎপ্রার্থী, ক্ষমা প্রার্থনাই তার উদ্দেশ্য :

জলে ডুবি বিষ খাই গলায় দেই দড়ি।
তিলেক দাড়াইয়া তোমার চান্দমুখ হেরি॥…
একবার দেখিয়া তোমায় ছাড়িব সংসার।
কপালে লেখ্যাছে বিধি মরণ আমার॥

জয়ানন্দের এই অনুতাপ-পত্রটি তার ব্যর্থ দাম্পত্য-জীবনের কারুণ্যটুকুই যে শুধু আভাসিত করেছে তাই নয়, চন্দ্রাবতীর প্রতি তার গোপন ভালোবাসাটুকুও ইঙ্গিতগর্ভ হয়ে উঠেছে। পত্রটি জয়ানন্দের দাম্পত্য-জীবনের শোচনীয় পরিণতির ইতিহাস যেমন বহন করে চলেছে, তেমনি চন্দ্রাবতীর প্রতি তার প্রকৃত মনোভাবটিও প্রকাশ করেছে। পত্রটি যে তাৎপর্যপূর্ণ তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

চন্দ্রাবতীর চিত্তে এ পত্রের প্রতিক্রিয়া সুতীব্র। তার অন্তর-আলোড়নের প্রাবল্য জয়ানন্দের প্রতি তার অব্যাহত ভালোবাসার প্রমাণ :

একবার দুইবার তিনবার করি।
পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী নিজ নাম স্মরি॥
নয়নের জলে কন্যার অক্ষর মুছিল।
একবার দুইবার পত্র যে পড়িল॥

চন্দ্রাবতীর হৃদয়াকাশে জয়ানন্দই প্রেমের ধ্রুবতারা। তার প্রেমের ভুবনে জয়ানন্দ এক ও অনন্ত।

জয়ানন্দের পত্রপাঠে চন্দ্রাবতী তার সাক্ষাৎ অভিলাষিণী হয়। কাতর কণ্ঠে পিতার কাছে আবেদন জানায় :

শুন শুন বাপ আগো শুন মোর কথা।
তুমি যে বুঝিবে আমি দুঃখিনীর ব্যথা॥
জয়ানন্দ লেখে পত্র আমার গোচরে।
তিলেকের লাগ্যা চায় দেখিতে আমারে॥

কিন্তু দ্বিজ বংশীদাস আপত্তি প্রকাশ করেন :

শুনগো প্রাণের কন্যা আমার কথা ধর।
একমনে পূজ তুমি দেব বিশ্বেশ্বর॥
অন্যকথা স্থান কন্যা নাহি দিও মনে।
জীবন মরণ হইল যাহার কারণে॥

চন্দ্রাবতী তাই জয়ানন্দের উদ্দেশে পত্র লেখে :

পত্র লিখি চন্দ্রাবতী জয়ের গোচরে।
পুষ্পদূর্বা লইয়া কন্যা পশিল মন্দিরে॥

এ হোল আলোচ্য গীতিকার পঞ্চম পত্র। পত্রের বক্তব্য বিষয় অবশ্য অনুল্লিখিত। যদিও চন্দ্রাবতীর প্রতি দ্বিজ বংশীদাসের উক্তিতে তার ইঙ্গিত আছে।

পত্রটির গুরুত্ব কিন্তু অসাধারণ। জয়ানন্দের আচরণ থেকে বোঝা যায় চন্দ্রাবতীর প্রত্যাখ্যান তাকে আহত ও উন্মত্ত করেছে। আবেগপ্রবণ স্পর্শকাতর জয়ানন্দের আত্মহত্যার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে। চন্দ্রাবতীর এ উপেক্ষা জয়ানন্দ সহ্য করতে পারেনি। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে সে মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। চন্দ্রাবতী ধ্যান সমাহিত। জয়ানন্দের সমস্ত আহ্বান তাই নিস্ফলতায় পর্যবসিত হয়। জয়ানন্দ হতাশ বিষণ্ণ। আত্মহত্যার সংকল্পে অবিচলিত। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়। ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ ঘটে না।

মন্দিরের রুদ্ধ দরজায় মালতী ফুল দিয়ে জয়ানন্দ তার বিদায়পত্র রচনা করে। চন্দ্রাবতীকে সম্বোধন করে জানায়:

> শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী।
> অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী॥
> পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
> বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত॥

চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে জয়ানন্দের এটি তৃতীয় পত্র। আলোচ্য গীতিকার ষষ্ঠ ও সর্বশেষ পত্র। এ পত্রের প্রতিটি অক্ষর অশ্রুসিক্তি। অনুতাপদগ্ধ জয়ানন্দের আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ।

অনুতপ্ত জয়ানন্দের এই হাহাকার আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। শেষপর্যন্ত আমরা কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতিশীলই হয়ে উঠি। এখানেই জয়ানন্দের জয়। সে অপরাধী। তার অপরাধ সে অস্বীকার করে না। সেজন্য সে অনুতাপও প্রকাশ করে। ক্ষমা চায়। তার বিবেকতাড়না আমাদের কাছে গোপন থাকে না। পত্রটি তাই গুরুত্বপূর্ণ। জয়ানন্দের মনোলোক এ পত্রে স্পষ্ট। তাকে আমরা কিছুতেই ঘৃণা করতে পারি না।

জয়ানন্দের আত্মহত্যার কারণটিও এ পত্রে গোপন থাকে নি। আত্মগ্লানিই তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে। প্রেমের অভাবই তাকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। জয়ানন্দ প্রেমিক। কিন্তু প্রেম তার জীবনে অলভ্য থেকে গেছে। 'চন্দ্রাবতী' গীতিকার অন্তিম পত্রটি আমাদের তাই বিহ্বল করে। বিষণ্ণও।

তিন

'কমলা' গীতিকায় ব্যবহৃত পত্রের সংখ্যা চার। প্রথম পত্রটি কারকুনের লেখা। কমলার উদ্দেশে। কমলা মানিক চাকলাদারের রূপবতী কন্যা। কারকুন মানিক চাকলাদারের কর্মচারী। কমলার রূপমুগ্ধ কারকুন চিকন গোয়ালিনীর মাধ্যমে কমলাকে প্রেমপত্র পাঠায়। প্রেমপত্রের ভাষা আবেগ-ব্যাকুল:

কিবৃপা কইয়া কন্যা একবার চাও মোর পানে।
পরাণে বাচাও মোরে ভরা যৌবন দানে॥
তুমি আমার ধরম করম তুমি গলার মালা।
তোমারে না দেখলে আমার মন হয় যে উতালা॥

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে প্রেমপত্রটির ভূমিকা কম নয়। কমলা কারকুনের প্রণয় প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে দূতী চিকন গোয়ালিনীর শাস্তি বিধান করেছে। ক্ষুব্ধ ও অপমানিত কারকুন প্রতিশোধ-কামনায় জমিদারের কাছে পত্র-মাধ্যমে কমলা-জনক মানিক চাকলাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জ্ঞাপন করেছে। এই সূত্রেই আলোচ্য গীতিকায় দ্বিতীয় পত্রের অবতারণা। কারকুন জানায়:

চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়া।
শত ঘড়া মোহর কেবল গনিয়া বাছিয়া॥
না জানায় এই কথা মালিক গোচরে।
জমিদারের ধন আইন্যা রাখছে নিজ ঘরে॥

কারকুনের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। পত্র-প্রাপ্তিতে জমিদারের ঈর্ষা-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে:

পত্র পাইয়া জমিদার কোন কাম করিল।
চাকলাদারে আনিবারে পাইক পাঠাইল॥

চাকলাদার বন্দী হয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার পুত্রের দশাও হয়েছে অনুরূপ। কারকুন কৌশলে চাকলাদারী লাভ করেছে। কমলা তার জননীকে নিয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এসব কিছুই ঘটেছে জমিদারের কাছে কারকুনের পত্র পাঠানোর জন্য। আলোচ্য গীতিকার কাহিনী-ধারায় দ্বিতীয় পত্রটির গুরুত্বে তাই সন্দেহ থাকে না।

দ্বিতীয় পত্রের মতো তৃতীয় পত্রটিও চক্রান্তমূলক। এ পত্রের লেখকও কারকুন। কমলার প্রবাসী মাতুলের উদ্দেশে এ পত্র লিখিত। কারকুনের লক্ষ্য কমলার প্রতি তার মাতুলকে বিরূপ করে তোলা। কমলা কারকুনের প্রণয়-প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় ক্রোধান্ধ কারকুন কমলার সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। পত্রে তাই কমলা সম্পর্কে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করেছে। কমলার মাতুলকে লেখা পত্রে কারকুন জানিয়েছে:

শুন শুন শুন ওগো তোমার ভাগিনী।
পরপুরুষে মইজে হইল কলঙ্কিনী॥···
কলঙ্কিনী হৈল তার গেল কুলজাতি।
এই পাপের নাহি জান্য পরাচিত্তির পাতি॥
বাপের কুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী।
তোমার বাড়ী হইতে তারে খেদাও শীঘ্র করি॥

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে কারকুনের খল স্বভাবের পরিচয় পাই। পত্র দুটিতে কারকুনের প্রকৃতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কারকুনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কমলার মাতুল কমলার প্রতি বিরূপ হয়েছে। প্রবাস থেকে স্ত্রীকে পত্র লিখে সমস্ত জানিয়ে অবিলম্বে কমলাকে গৃহ থেকে বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছে :

বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইল।
ভাড়াই নাগর সঙ্গে ঘরের বাহির হইল॥
এমন কন্যারে তুমি ঘরে নাহি দিবে স্থান।
ঘরের বাহির কইরা দিবা কইরা অপমান॥

আলোচ্য গীতিকার চতুর্থ পত্র এটি। কমলার মাতুল এ পত্রের রচয়িতা হলেও এর পেছনে কারকুনের প্ররোচনা সুস্পষ্ট। কারকুনের চক্রান্তই এতে কার্যকর হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের মধ্যে সম্পর্ক যে সুদৃঢ় তাতে সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, কমলা মাতুলের পত্রটি পাঠ করে মাতুলের গৃহ ত্যাগ করেছে। এবং মৈষালের আশ্রয় নিয়েছে। কারকুনের চক্রান্তেই কমলার জীবন এভাবে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গীতিকার চারটি পত্রের প্রথমটি প্রেমপত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগ-পত্র। চতুর্থটি নির্দেশপত্র। সমস্ত পত্রের কেন্দ্রে রয়েছে কমলা, প্রকাশ্যে বা নেপথ্যে রয়েছে কারকুন।

'কমলা' গীতিকার আদি ও অন্তে কমলার অবস্থানের যে পার্থক্য তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এই সমস্ত পত্র। কারকুনের প্রেমপত্র কারকুনের প্রতি কমলাকে বিমুখ করেছে। কারকুনের অভিযোগপত্র এবং কমলার মাতুলের নির্দেশপত্র কমলার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। আলোচ্য গীতিকার প্রথম পর্বে পাই কমলার দুর্ভোগ-চিত্র। ঐ দুর্ভোগের সঙ্গে পূর্বোক্ত চারটি পত্রের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ। গীতিকার অন্তিমে পাই কমলার সৌভাগ্য-চিত্র — কমলার এই অবস্থা পরিবর্তনে কোনো কোনো পত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধর্মসভায় কমলা স্বীয় জীবনের যে বৃত্তান্ত শুনিয়েছে তার সমর্থনে সে প্রমাণ হিসেবে কোনো কোনো পত্র উপস্থিত করেছে। যেমন চিকন গোয়ালিনীর হাত দিয়ে পাঠানো কারকুনের প্রেমপত্র সম্পর্কে তার মন্তব্য :

না বলিব না কহিব পত্রে লেখা আছে।
এই পত্র রাখিলাম আমি সভার কাছে।

কমলার জবানীতে আর একটি পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যে পত্রটি সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্বে অনবহিত ছিলাম। পত্রটি জমিদারের। মানিক চাকলাদার জমিদার-গৃহে বন্দী হলে জমিদার একটি পত্র পঠিয়েছে। কমলা সে পত্র ধর্মসভায় তুলে ধরেছে :

এই পত্র সাক্ষী করি ধর্মসভার আগে।
আমার বাপ হইল বন্দী কোন অপরাধে॥

কমলার বিরুদ্ধে মাতুলানীকে লেখা মাতুলের পত্রটিও কমলা নিদর্শনরূপে ধর্মসভায় দাখিল করেছে:

এই পত্র সাক্ষী করি ধর্মসভার আগে।
ছাড়িলাম মামার বাড়ী মনের বিরাগে।

এভাবে দেখা যাবে, অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের সঙ্গে তিনটি পত্রের সাহায্যও কমলা নিয়েছে। কমলার উক্তি এই সমস্ত পত্রের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট। শেষপর্যন্ত কমলা যে তার পিতা ও অনুজকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে এবং জমিদার-তনয়ের সঙ্গে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে, তাতে ঐ পত্রগুচ্ছের সহায়তা স্বীকার করতেই হয়। আর এ সমস্ত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণে 'কমলা' গীতিকায় পত্রগুচ্ছ সন্নিবেশের যাথার্থ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

চার

'দেওয়ান ভাবনা' গীতিকায় রয়েছে তিনটি পত্রের উদ্ধৃতি। এ ছাড়াও আর একটি পত্রের উল্লেখ আছে, উদাহরণ নেই। প্রথম পত্রটি মাধবের, সোনাইর উদ্দেশে লেখা। মাধব আলোচ্য গীতিকার নায়ক, জমিদার-তনয়। সুন্দরী সোনাইর প্রণয়-মুগ্ধ সে:

তোমার লাগিয়া কন্যা হইলাম যে পাগলা।
তুমি আমার মুখের মধু গলার পুষ্পমালা॥

পত্রে সোনাইকে সে আত্ম-পরিচয় দিয়েছে, জানিয়েছে বিত্ত-সম্পদের কথা। সোনাইয়ের সামনে ভাবী সুখ-সমৃদ্ধির যে চিত্র সে রচনা করেছে তা যথেষ্ট প্রলোভনকর:

বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী।
তোমারে দিয়াম কন্যাগো অগ্নিপাটের শাড়ী॥···
বাহুতে পরাইয়া দিবাম রাজুবন্ধ তার।
হীরামতি দিয়া দিবাম তোমার গলার হার॥
বাপের বাড়ীতে আছেগো জলটুঙ্গীর ঘর।
সেই ঘরে বসিয়া তুমি করিবা পশর॥
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামাঙ্গীর বাসা।
রাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা॥

প্রত্যুত্তরে নায়িকা সোনাই মাধবের উদ্দেশে জীবন-যৌবন সমর্পণ করেছে:

যেদিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
সেইদিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে॥
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা।
অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথা॥

এদিকে দেওয়ান ভাবনা সোনাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সোনাইকে প্রাপ্তির জন্য সে সোনাইয়ের মাতুলকে প্রলুব্ধ করে। সোনাইয়ের মাতুল ভাটুক ঠাকুর সোনাইয়ের সঙ্গে দেওয়ান ভাবনার বিয়ের আয়োজন করে। সোনাই গোপনে দূতীর মাধ্যমে মাধবকে পত্র পাঠায়। আলোচ্য গীতিকার তৃতীয় পত্র এটি।

সোনাই জলের ঘাটে গেলে দেওয়ান ভাবনা তাকে অপহরণ করে নৌকায় তুলে নেয়। নদীপথে যাত্রাকালে মাধবের আবির্ভাব ঘটে। মাধব দেওয়ান ভাবনার কাছ থেকে সোনাইকে উদ্ধার করে। যথাসময়ে মাধবের সঙ্গে সোনাইয়ের বিয়ে হয়।

দেওয়ান ভাবনা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মাধবের পিতাকে বন্দী করে। মাধব পিতার উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। পিতা মুক্তি পায়, কিন্তু মাধব বন্দী হয়।

দেওয়ান ভাবনার কাছে উপস্থিত হয়ে সোনাই নিজের বিনিময়ে স্বামী মাধবের মুক্তি প্রার্থনা করে। দেওয়ান ভাবনা মাধবকে মুক্তি দেয়। সোনাই আত্মহত্যা করে। মাধবের প্রতি তার প্রেম অম্লান থাকে। প্রাণের বিনিময়ে সোনাই তার প্রেমের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করে।

গীতিকার সূচনায় মাধবের প্রেমপত্রের উত্তরে সোনাই যে প্রেমপত্র প্রেরণ করে তার আন্তরিকতা ও যাথার্থ্য এভাবেই প্রমাণিত হয়। সোনাই যে নিছক মাধবের বিত্ত-সম্পদের আকর্ষণে মাধবের আহ্বানে সাড়া দেয় নি, মাধবের প্রতি প্রেম-ভালবাসা যে নিখাদ, তার আত্মদানে তা প্রমাণ হয়। পরস্পরেব উদ্দেশ্যে প্রেরিত মাধব-সোনাইয়ের পত্র শেষপর্যন্ত তাই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পাঁচ

উপরিউক্ত ত্রয়ী গীতিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল পত্র-প্রয়োগের এই রীতিটি সাহিত্যিক কৌশল হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। পত্রসমূহ কখনো ঘটনার অগ্রগতির সহায়ক, কখনো বা চরিত্র-উদ্ঘাটক। পত্র-সন্নিবেশে পরিমিতি ও যাথার্থ্যবোধ রক্ষিত।

পত্র-সন্নিবেশের এই রীতিটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর কোনো শাখায় দেখা যায় না। সেদিক থেকে 'চন্দ্রাবতী', 'কমলা' ও 'দেওয়ান ভাবনা'র প্রাচীনত্বে কি সংশয় জাগে না? মনে হয় না কি এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা?

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নবপর্যায়ের ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

লোকশ্রুতি (Falklore) জাতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ। এর মধ্য দিয়ে লোকমনের (Folk Mind) একটি পরিচয় সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকশিল্পকলা, জনশ্রুতি, লোক-উৎসবানুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, লোকধর্ম, লোকাভিনয়, লোকনৃত্য ইত্যাদির পর্যালোচনাই লোকশ্রুতি আলোচনার অঙ্গ। আদিম মানুষের একটা নিজস্ব সাংস্কৃতিক জগৎ ছিল। তারা যখন গুহাতে বসবাস করতো, শিকার এবং ফলমূল আহরণ করে তারা যখন জীবন ধারণ করতো, তখন থেকেই তারা দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইতো, উদ্দাম ছন্দে নৃত্য করত, মনের ভাববিনিময় করার জন্য ছবি আঁকত। এই সমাজটিকে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা আদিম সমাজ নাম দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, Primitive Culture বা আদিম সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয় নিয়ে হেনরী লুকাস তাঁর 'এ শর্ট হিস্টরি অফ সিভিলাইজেশান' গ্রন্থে বলেছেন সংস্কৃতি বলতে বোঝায় (১) একই অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সামঞ্জস্য (২) ওই একই পরিবেশ থেকে উদ্ভূত একটি সাধারণ সংস্থা যা দ্বারা সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাগুলি পরিপূরিত হয় (৩) একটি ভাব ও কার্যকরণের একটি একত্রিত সংস্থা, এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আবিষ্কার, দর্শন এবং ধর্ম।[১] সুতরাং আদিম যুগের সংস্কৃতির মধ্যে একটি যৌথ ধর্মদর্শন এবং অর্থনৈতিক চাহিদা, শিল্প, সাহিত্য সব কিছুরই মধ্যে একটি তৎকালীন গোষ্ঠী জীবনের ভাল লাগা মন্দ লাগার ছায়াপাত ঘটেছে। তারপরে মানুষ যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়ে কৃষিকাজ শিখেছে, ঘর বেঁধেছে, স্থায়ী জীবন ও জীবিকার সন্ধান পেয়েছে, ততই নিজেদের গোষ্ঠীজীবন সংহত, সংযতও যেমন করেছে, তেমনি অন্যান্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকেও আত্মসাৎ করে সমাজজীবনকে উন্নততর করার প্রয়াস পেয়েছে—লোকায়ত জীবনের সূচনা হয়েছে। যাযাবর অরণ্যচারী ব্যাধ সমাজ যখনই ধীরে ধীরে স্থায়ী গৃহীজীবন ও কৃষি জীবনের দিকে অগ্রসর হয়েছে তখনই শুরু হয়েছে সমাজ জীবনের আর এক রূপান্তর—

১। "Culture comprises (1) a general adjustment to economic needs or to geographic surroundings (2) a common organization produced to satisfy social and political needs arising in their surroundings and (3) a common body of thought and achievement. This includes art, literature, science, inventions, philosophy and religion." [Henry Lucas—A Short History of Civilization. P-I]

আদিম সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে লোক সমাজে (Folk Society) এবং আদিম সংস্কৃতির রূপ বদলে হয়েছে লোকায়ত সংস্কৃতি। এই লোকায়ত সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে লোকশ্রুতিবিদ বলেছেন, সাধারণ ভাবে লোকসংস্কৃতি হচ্ছে আদিম লোক সমাজে তথাকথিত শহুরে, নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষ এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাস রীতিনীতি, সংস্কার-কুসংস্কার, প্রবাদ-প্রবচন-ধাঁধা, নৃত্য-গীত, নাটক, অভিনয়, পুরাকথা-ইতিকথা-লোককথা, আচার-অনুষ্ঠান, যাদুবিদ্যা-ডাইনীতন্ত্র, লোকশিল্প-কলাবিদ্যা—ইত্যাদি বিষয়ক অনুষ্ঠান।[২] এইসব লোকসংস্কৃতির উপাদান ও বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্র আছে উচ্চতর সংস্কৃতির।[৩] লোক-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান বলতে মানবিক জ্ঞানের সেই অংশকেই বোঝায় যেখানে বিভিন্ন যুগের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির বিচিত্র পর্যায়কে বোঝাতে গিয়ে লোকসমাজ থেকে বৈজ্ঞানিকভাবে উপাদান সংগ্রহ, শ্রেণীবিন্যাস এবং বিচার বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন, এর দ্বারা মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা হয়। লোকসংস্কৃতি অধ্যয়ন, সংস্কৃতির বিন্যাস ও রীতিটিকেই কেবল সুস্পষ্ট করে না বরং এর মধ্যে দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা বিষয় ও অভিপ্রায় এবং সংস্কৃতির প্রকৃত অর্থটিকেও উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোচনা ইতিহাস ও মানবজীবনের মূল্যায়নে বিশেষ সাহায্য করে। এটি এমন একটি সমাজবিজ্ঞান যার মধ্যদিয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে প্রকৃষ্টরূপে পর্যবেক্ষণ করা যায়।[৪] এই লোকসংস্কৃতি কিন্তু সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়। এই সংহত সমাজ বলতে বোঝায় এমন এক সমাজ যেখানে এর অন্তর্ভুক্তি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আছে, দেওয়া নেওয়া আছে, অথচ চিরাচরিত প্রথাগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি অটুট রেখে চলে। কিন্তু আদিম মানুষ সকলে নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলত। কিন্তু লোকসমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করেও অন্যান্য গোষ্ঠীও সমাজের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় দ্বারা নিজেদের ক্রমশ সমৃদ্ধতর করে তোলে। সেইজন্য লোকায়ত সংস্কৃতির পরিচয় অনুসন্ধানে মানব সভ্যতার বিচিত্রতর বিষয় আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। সুতরাং লোকসংস্কৃতি কিংবা

২। "Specifically, folklore consists of the belifs, customs, superstitions, proverbs, riddles, songs, myths, legends, tales, ritualistic ceremonies, magic witchcraft, and all other manifestations and practices of primitive and illiterate peoples and of the 'common' people of civilized society." [A. M- Espinosa, Standard Dictionary of folklore Mythology and Legend, Vol 1. Ed. by Maria Leach, P-399]

৩। "Folklore has very deep roots and its traces are even present even among peoples that have reached a high state of culture." [ibid]

৪। "The science of folklore is that branch of knowledge that collects, classifies and studies in a scientific manner the materials of Folklore in order to interpret the life and culture of the peoples across the ages. It is one of the social sciences that studies and interprets the history of civilization. Folklore perpetuates the patterns of culture and through its......we can often explain the motifs and the meaning of culture." [ibid]

লোকসাহিত্য বিচারে সংগ্রহ ও গ্রামসমীক্ষার একটা বিশেষ মূল্য আছে। এ প্রসঙ্গে আর, ডি, জেমসন বলেছেন যে 'ফোকলোর' শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। যথা প্রথমত যে আদিম হৃদয়াবেগ থেকে লোকসংস্কৃতিগুলি উদ্ভূত তার মধ্যে কোনরূপ অনুপ্রবেশ না ঘটিয়ে যথাযথভাবে সংগ্রহ করা, দ্বিতীয়ত: পরে সেই সংগ্রহগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে সংগৃহীত উপাদানগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য বৈশাদৃশ্য নির্ণয় করা। তৃতীয়ত: সংগৃহীত বিষয়গুলির মধ্যে লোকবিশ্বাসের স্বরূপ নির্ণয় করা। চতুর্থত কোন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর সৃষ্টি তা নির্ণয় করা। পঞ্চমত ব্যক্তি ও সমাজজীবনের উপর সংগৃহীত লোকসংস্কৃতির প্রভাব ও কার্যকারিতা কতখানি তা বিচার করা।[৫] সুতরাং গ্রামসমীক্ষার (village survey) মাধ্যমেই লোকসংস্কৃতি বা লোকসাহিত্যের পর্যবেক্ষণ যথার্থ বৈজ্ঞানিক রূপ পেতে পারে। কারণ কোন পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে একটি সমাজ বা সমাজমন গড়ে এবং কোন সমাজমনের মধ্য থেকে লোকসাহিত্য জন্মলাভ করে তা জানতে হলে গ্রাম সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। কোন উপজাতি বা কোন সমাজগোষ্ঠীর সাহিত্যের উৎসস্থল আবিষ্কার না করলে কেবল সংগ্রহই করা হয়, তার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভবপর হয় না।

আমার বর্তমান গবেষণায় পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত বঙ্গে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য গ্রামকে সমীক্ষা করে তারই প্রেক্ষাপটে সংগৃহীত লোকসাহিত্যের উপকরণগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতির পর্যালোচনায় যে গ্রাম সমীক্ষার একটি উচ্চতম স্থান আছে একথা সমস্ত নৃতত্ত্ববিদ্রাই স্বীকার করেছেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার নানাবিধ লোকাচার ও লোকবিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে বৃদ্ধের মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে লোকাচারের ও লোকসংস্কারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। লোকসংস্কার লোকাচার প্রধানত নিরক্ষর লোকসমাজে ও অল্পাধিক শিক্ষিত ও সভ্য সমাজে প্রচলিত সমস্ত বাহ্যিক কর্মকাণ্ড, যথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণাদি ও অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াদি যথা ধারণা, বিশ্বাস, প্রবণতা ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে এমন সব উপাদানের নাম যার মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা অযুক্তি ও বিশ্বাসের প্রাধান্যই বেশী।[৬] এই লোকাচার বা সংস্কার প্রসঙ্গে এ, এইচ, ক্রাপের একটি

৫। The methods of the study of folklore are : (1) collection of the data as they actually occur without, if possible, this intrusion of the folklorists own mythopocia, a primitive impulse which creates folklore ; (2) a comparison of the data to determine what are the similarities and differents of these phenomena in the several ethnic groups ; (3) an examination of the beliefs implicit in the data ; (4) of the social and psychological impulses which produce them and (5) the function of folklore performs for the individuals and the social groups through which they operate. (R. D. Jameson / S. D. F. M. L. page 400-1)

৬। লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ / আবদুল হাফিজ / ঢাকা ১৯৭৫ / পৃঃ ২

মন্তব্য স্মরণীয় : কুসংস্কার, সাধারণ সংলাপে অন্য লোকের বিশ্বাস ও আচার আচরণের সমাহারকেই বোঝায়। অন্তত যতটা পরিমাণে তা আমাদের থেকে ভিন্ন। যেটা আমরা নিজেরা বিশ্বাস করিও যাব চর্চা করে থাকি তা অবশ্যই আমাদের ধর্ম।[৭] ক্রাপের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আজও মানুষ স্বধর্ম ছাড়া অন্যের বিশ্বাস ও আচার আচরণকে অন্ধ কুসংস্কার বলে মনে করে। বাংলাদেশের হিন্দু কৃষক মনে করে অম্বুবাচীর দিনে মা বসুমতী রজঃস্বলা। সুতরাং তাঁরা ঐদিন জমিতে লাঙল দেয় না। অন্যদিকে মুসলমান কৃষকেরা জমিতে প্রথম বোয়া লাগানোর সময় গোচর নামক একটি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে। তাই ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ ও তার সমালোচনায় নৃতত্ত্ববিদ কীসিং যথার্থই বলেছেন ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে সংস্কৃতির অন্যান্য যে কোন দিকের চেয়ে নৃতত্ত্ববিদ ও অন্যান্যেরা অনুমানের পথ ধরে বিচিত্র তাৎপর্যময় তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে।[৮]

তার থেকে একথা উপলব্ধি হয় দেশে কালে কালে সংস্কার বা লোকাচার খুব বেশী ভিন্ন নয়। এক যুগে এক কালে যা ছিল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, পরবর্তীকালে যুগধর্মের দরুণই তা আর ব্যবহৃত হয় না। ফলে তাকেও আমরা কুসংস্কার বলি। এ প্রসঙ্গে পরম পণ্ডিত ডঃ শহীদুল্লা সাহেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করতে পারি : বিজ্ঞানের আলোয় আজ আমরা অনেক আচার ব্যবহার ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলি ধর্মকর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় সকলের শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল।[৯] সুতরাং বলা যায় প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের নরনারীর জীবন নানা আচার আচরণ, বার-ব্রত, উপবাস পাল-পার্বন ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। কাল যাছিল আচার ও বিশ্বাস পরবর্তী যুগেই তা অনেক সময় কুসংস্কারে পরিণত হয়। আজেকের কথা, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবন্ধ, গীতি এ সমস্ত কিছুই লোকসমাজের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সুতরাং লোকসাহিত্য এবং সামাজিক ভাবে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের সময় যে গ্রামসমীক্ষা হবে তখন তিনটি পর্বের প্রতি সজাগ থাকা প্রয়োজন :

প্রথম পর্ব : লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ উপাদান সমূহ সত্বর সংগ্রহ করতে হবে। গ্রামগুলি থেকে যাতে উপাদানগুলির ক্ষয়, অবলুপ্তি এবং রূপান্তর এড়ান সম্ভবপর হয়।

৭। Superstition, in common parlance, designates the sum of beliefs and practices shared by other people in so far as they differ from our own. What we believe and practise ourselves is, of course, Religion. [Alexander H. Krappe, The Science of Folklore, W. W. Norton and Co, New York, 1964 ; p-203.]

৮। Speculation by anthropologists and others, as to the origin of religion has produced a wider choise of distinctive theories than on any other aspect of culture. [Felix M. Keesing, Cultural Anthropology (The Science of custom), New York 1958, p-326]

৯। ডঃ আসরাফ সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য, ১৯৬০ ঢাকা [ডঃ শহীদুল্লাহ লিখিত-ভূমিকা] পৃঃ ২২।

দ্বিতীয় পর্ব : বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত উপাদান সমূহের শ্রেণীবিন্যাস এবং প্রণালীবদ্ধ করণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় পর্ব : লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের উপাদান সমূহের বিভিন্ন অবয়ব অনুযায়ী বিশ্লেষণ, প্রতিটি উপাদানের মৌলিক ভিত্তিভূমি বিশ্লেষণের জন্য তাদের জীবন ইতিহাসের মূলসূত্র উন্মোচন অবশ্য কর্তব্য।

তৃতীয় পর্বের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন ইতিহাসের মূলসূত্র উন্মোচন অবশ্য কর্তব্য হলে গ্রাম সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যেমন আর্চার একটি প্রবন্ধে সাঁওতালদের আনুষ্ঠানিক বন্ধুত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র রায়ের বীরহোড়দের গ্রাম সমীক্ষার থেকে উদাহরণ দিতে হয়েছে[১০] এবং তার থেকেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। গ্রাম সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে। 'লৌকিক শব্দকোষের প্রণেতা শ্রীকামিনী কুমার রায় এম. এ. যে কেবলমাত্র শব্দসংগ্রাহক নন, তিনি যে লোকসাহিত্যেরও গবেষক একথা বিশেষ ভাবে বোঝা যায় যখন তিনি বলেন : পথে চলিতে, হাটে বাজারে, ক্ষেতে খামারে, হেঁসেলে দরবারে, বেড়াইতে যখনই যেখানে কোনও নূতন শব্দ শুনিয়াছি, কোন নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি টুকিয়া লইয়াছি। * * * তাই প্রায়ই গ্রামে গ্রামে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া এক একটি বিষয় সংশ্লিষ্ট শব্দ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।' গ্রাম সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি তাঁর লৌকিক শব্দকোষ সমাজতাত্ত্বিকের মত সার্থক ভাবে কাজে লাগিয়েছেন তা উপলব্ধি করা যায় তাঁর শব্দবিন্যাসে শব্দের উৎস নির্ণয়ে শব্দের ব্যবহারে ও প্রয়োগ বা ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয়েই তিনি নিরস্ত থাকেন নি। তিনি বিশেষ শব্দ সম্পর্কে যে-সব বিশ্বাস ও প্রবাদ প্রবচন লোক-সমাজে প্রচলিত আছে তারও সংগ্রহ উপস্থিত করেছেন : "বহু অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে এইরূপ একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে বিবাহের প্রারম্ভিক কথাবার্তায় পাত্র বা পাত্রপক্ষের কাহাকেও ভাজাবড়া, ভাজাপোড়া খাইতে দিতে নাই। দিলে শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েকে জীবনভর সকলের উৎপীড়নে ভাজা ভাজা হইতে হয় পয়লা ভোগে জামাইর পাতে দিলে ভাজাপোড়া। হউর বাড়ী কুরীযাইয়া হয় আধমরা। জামাই ভাজে, হউরী ভাজে, ভাজে নোন্দগণ, দেওরে বেউরে ভাজে ভাজে ঐইক্ষণ।" [শ্রীকামিনীকুমার রায় এম. এ./লৌকিক শব্দকোষ, ২য়খণ্ড, ১৯৭১, পৃঃ ৩২] গ্রাম সমীক্ষাই লোকসাহিত্যে ও লোকসংস্কৃতি বিচারের প্রকৃষ্ট পথ।

১০। Similar unions are sanctioned by Birhors, 'when two boys perceive a story attachment for each other and desire to make them bond permanent, they enter into a form of artificial friendship with the approval of their parents.' [W.G. Archer, Ritual Friendship in Santal Society in India. Vol-27, March 1947 No 1. P. 57.]

দুই

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এম. এ. পরীক্ষার পাঠক্রমে 'লোক-সাহিত্য' একটি 'বিশেষ পত্র' রূপে গৃহীত হয় এবং ঐ লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের প্রথম ক্লাশেই এই বিষয়ের অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, লোক-সাহিত্য পাঠ সম্পূর্ণ করতে হলে এই সাহিত্যের উৎসস্থল বাংলাদেশের গ্রাম, গ্রাম্য মানুষ, তাঁর সমাজ, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও বিশ্বাস, জীবন ও জীবিকা, নৃত্যগীত ইত্যাদি তার জীবন ও সংস্কৃতির বিবিধ বস্তুকে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করতে হবে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনার দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয় এবং পল্লীর বিভিন্নমুখী জীবনের পরিচয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গরূপে গ্রহণ করবার যে মহান্ দায়িত্বের কথা রবীন্দ্রনাথের ১৩১২ খৃষ্টাব্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তার অঙ্কুর কিশলয় রূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'লোক-সাহিত্য' বিশেষ পত্রের একদল ছাত্রছাত্রী পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী থানার অন্তর্গত অযোধ্যা পাহাড়ে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের একটি শিবির স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ের সংগ্রহস্থল যেমন ছিল প্রধানতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রহস্থল হলো পশ্চিমবঙ্গ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নির্দেশে ছাত্রছাত্রীর দল অযোধ্যা অঞ্চলটিতে সপ্তাহকাল ধরে সমীক্ষা ও সংগ্রহকার্য চালান। ডঃ ভট্টাচার্য এই সংগ্রহ শিবিরের কেবলমাত্র পরিচালক ছিলেন না, তিনি নিজে সংগ্রহ ও সমীক্ষা কার্যে অংশ গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে সমীক্ষা কার্য পরিচালনার রীতিনীতি, দায়িত্ব ও কর্তব্য, বাছাই ও পর্যালোচনার পদ্ধতি সমস্ত কিছুই একক দায়িত্বে অভূতপূর্ব পরিশ্রমে শিক্ষাদানে সক্ষম হন। এ ধরণের প্রচেষ্টা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ক্ষেত্রে প্রথম। এমন কি, বলা চলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও অভিনব। কারণ, প্রথমত সাহিত্যের ছাত্রের সঙ্গে সাহিত্যের উৎসস্থলের সংযোগ সাধন, দ্বিতীয়ত দেশের মানুষের সঙ্গে একাত্মতার মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা, তৃতীয়ত লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ, চতুর্থত জ্ঞানকে কেবল পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের বৃহত্তর জনজীবনের মধ্যে তাকে উপলব্ধি করা, পঞ্চমত ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করে সাহিত্যের ছাত্রদেব প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ, বাছাই, বিচার ও পর্যালোচনায় শিক্ষাদান ও উৎসাহ দেওয়া, ষষ্ঠতঃ দেশের লুপ্তপ্রায় লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদানগুলি সংগ্রহের ও সংরক্ষণের একটি জাতীয় কর্তব্য পালন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা।

তারপর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রতি বছর বাংলা দেশের গ্রামে 'লোক-সাহিত্য' বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রীর দল সংগ্রহকার্য করে যে বিরাট লোক-সাহিত্যের নিদর্শন উদ্ধার ও সংরক্ষণ করেছেন তা বিস্ময়কর। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র

সেন, চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি মনীষিগণের প্রচেষ্টায় বঙ্গভাষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিলো তা আরো ব্যাপক ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংস্থাপিত হল। লোকসাহিত্য প্রেমিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের একক প্রচেষ্টাও তাঁর লোক-সাহিত্যের বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে।

সমীক্ষা-শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রেখেই তবে স্থান নির্বাচন সম্ভবপর। ডঃ ভট্টাচার্য তার প্রথম শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন হিসাবে পুরুলিয়া জেলাকেই গ্রহণ করেছিলেন। এর বিবিধ কারণ আছে। পরবর্তী শিবিরগুলিও পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের যথাক্রমে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। এই শিবিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে অনেকে অনুমান করেছিলেন যে ঐ অনুর্বর, শুষ্ক, কংকরাকীর্ণ অরণ্যভূমিতে বিশেষ করে যখন তার অধিকাংশ জায়গাই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানে বাংলার লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদান পাওয়া কি করে সম্ভবপর? কিন্তু ক্রমাগত প্রায় দশ বছর সমীক্ষা শিবির স্থাপিত হওয়ার পর একথা প্রমাণ হয়েছে যে পশ্চিম সীমান্তবর্তী এই গ্রামগুলিতে বঙ্গ-সংস্কৃতির এক বিপুল ঐশ্বর্য এখনও বিরাজ করছে এবং সেখানে বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রচুর উপাদান এখনও বর্তমান আছে, যার মধ্যে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার এই প্রান্তবর্তী গ্রামগুলি কি করে সংস্কৃতির সম্পদে প্রাণবান্ হয়ে উঠলো তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ডঃ ভট্টাচার্য যে স্থানগুলি নির্বাচন করেছিলেন তার পিছনে ছিল তাঁর বহুদিনের নৃতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগত একটি শৃঙ্খলা—যা তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ভেরিয়ার এলুইন-এর কাছে প্রাপ্ত।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের যে অংশ বিহারের অন্তর্গত ছিল, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার যে অংশ মূলতঃ প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই অঞ্চলে দীর্ঘকাল সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য সমন্বয় সাধনের প্রয়াস দেখা গেছে। ইতিহাসের কোন্ যুগ থেকে কিভাবে যে সে কাজ সম্ভবপর হয়েছিল তা অনুভব করা না গেলেও এর বিবর্তনের ধারাটি কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। বৌদ্ধ যুগে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত যে পথ বিস্তৃত ছিল, তা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল, তারপর মধ্যযুগের শেষ ভাগে এসে দেখা গেল চৈতন্যদেব নবদ্বীপ থেকে পুরীর পথে এই ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন। খৃষ্টপূর্ব যুগে মহাবীর এ অঞ্চলেই জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন, অথচ একথা সত্য, এ দেশে এমন লোক ছিলেন, যাঁরা তখন মহাবীরকে নানাভাবে অপমান করেছিলেন, তাঁরা যে সকলে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এমনও নয়। এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব স্তরে স্তরে এসে সঞ্চিত হয়েছিল, তারপর বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর এই সমগ্র অঞ্চলটি বৈষ্ণব

ধর্ম দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলো, কিন্তু এ অঞ্চলের জনসংখ্যার মৌলিক ভিত্তি আদিবাসী দ্বারা গঠিত। এই আদিম সমাজও যে একই মানব-গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত তাও নয়, এর প্রধান প্রমাণ এই যে, এই অঞ্চলের ভাষাতে দ্রাবিড় ও মুণ্ডা দু শ্রেণীর ভাষাই ব্যবহৃত হয় এবং এর অর্থ এই যে, এ অঞ্চলে দুটি ভাষাভাষী জাতির আবির্ভাব এবং শেষ পর্যন্ত তিরোভাব দুইই ঘটেছিলো। নিজস্ব ভাষার মধ্যে ঐ জাতিগুলি তাদের মৌলিক পরিচয় উপস্থিত করে পরবর্তী কালে পরস্পর পরস্পরের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাস্তবতঃ একত্রিত হয়ে গেছে। সেজন্যে এ অঞ্চল থেকে যে সকল লোক-কথা আজও আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে দ্রাবিড় এবং মুণ্ডা ভাষায় সংস্কারের পরিচয় এখনও উদ্ধার করা যায়। এ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবাসীর এবং অর্ধ-আদিবাসীর মধ্যে সর্বশেষ যে ঐক্য সূত্র রচিত হয়েছে, তার প্রেরণা বৈষ্ণবধর্ম থেকে যে এসেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ অঞ্চলের লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে নৃত্য গীত ও ঝুমুর গানের মধ্যে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার ব্যবধানকে দূর করে সামগ্রিক একীকরণের এক অভাবনীয় শক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যেমন ছিল, অন্য কোন ভারতীয় ধর্মের তেমন ছিল না, সেজন্য বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর তাদের রাজ্যের সীমায় বৈষ্ণবধর্ম ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ প্রচার লাভ করল এবং তাদের আকর্ষণে এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী এক অখণ্ড ঐক্য অনুভব করতে আরম্ভ করল। একদিন পরস্পর গোষ্ঠী বা শ্রেণীগত সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও এক ধর্মমতের আকর্ষণে এরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের নিয়মিত গোষ্ঠী সংগ্রাম, উৎসব অনুষ্ঠানের কৌতুক সংগ্রামের ক্রীড়া রূপ লাভ করলো। এ অঞ্চলের ছৌনাচে যে এত যুদ্ধ-নৃত্যের অভিনয় হয়, তার অর্থই এই যে একদিনের গোষ্ঠীসংগ্রাম বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের পর ধর্মীয় আনন্দানুষ্ঠানের রূপ লাভ করলো এবং এই প্রকার যুদ্ধ-নৃত্যে পরিণত হল।

এই অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোথাও শ্যামল বা ধূসর প্রান্তর, কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও বা গৈরিক বর্ণের প্রান্তর, কোন জায়গায় নাতি-উচ্চ পর্বত। এর অধিবাসীদের প্রকৃতি সে অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। এই সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে প্রকৃতির এই রূপ ছাড়া আর কোন বৈচিত্র দেখা যায় নি, সেজন্যে এর নরনারীও একই অভিন্ন ধাতুতে গঠিত। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা সৃষ্টির এটিও একটি প্রধান কারণ। আর এই সকল কারণেই পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সংস্কৃতির পটভূমিকাটি—এর বৈচিত্রপূর্ণ অথচ একটি অখণ্ড সত্তার সঙ্গে সংস্থাপিত হয়েছে। বহির্মুখী প্রাকৃতিক অখণ্ডতা এ অঞ্চলের মানবসমাজের অন্তর্মুখী অখণ্ডতা সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্য এর অন্তর্মুখী ঐক্যেরই সন্ধান দেয়। অপরদিকে মৌলিক আর্যেতর ধর্মের উপর বিভিন্ন উচ্চতর ধর্মের প্রভাবের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, আজ সেটি এ অঞ্চলে

জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা অনুসরণ করলে বোঝা যাবে না, বরং এ অঞ্চলের জনসমাজের অলিখিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে তার নিদর্শন সন্ধান করলে এ অঞ্চলের সামাজিক ও ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাসটি বুঝতে পারা যেতে পারে। কারণ, সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের বহির্মুখী পরিচয় কালক্রমে লুপ্ত হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে তার স্বাক্ষর কিছুতেই মোছা সম্ভবপর নয়। সুতরাং এ অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের উপকরণ বিশ্লেষণ করলেই নিরক্ষর জনসমাজের বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিলুপ্ত উপকরণসমূহ উদ্ধার করা যেতে পারে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ এ অঞ্চলের লোক-সাহিত্যেরই কোন কোন অংশে প্রস্তরীভূত রূপে অক্ষয় হয়ে আছে, সুতরাং উপরোক্ত কারণেই এই অঞ্চলটিকেই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমীক্ষা কার্যের উপযুক্ত হবে বলে অনুধাবন করেছিলেন এবং এও অনুমান করেছিলেন যে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের জাতিগত সংমিশ্রণে গঠিত জনসাধারণের মধ্যে কী ধরনের সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভবপর এবং তার ফসলই বা কী হতে পারে, তার সম্পূর্ণ পরিচয় ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে পারা সম্ভবপর হবে।

॥ তিন ॥

সংগ্রহ শিবির

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগ থেকে এপ্রিলমাসে প্রথম সংগ্রহ-শিবির স্থাপিত হয় পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে। এই প্রথম শিবিরের শিবিরাধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং পরবর্তী যে শিবিগুলি এই পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে স্থাপিত হয় এবং সমীক্ষা ও সংগ্রহ কার্য পরিচালিত হয় তার সমস্তগুলিতেই ডঃ ভট্টাচার্যই অধ্যক্ষ ছিলেন এবং নিজে সক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও সমীক্ষা পরিচালনা করে এই অঞ্চলের অনাবিষ্কৃত লোক-সাহিত্য ভাণ্ডার উদ্ধার করেন। এই প্রথম লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রথম সমীক্ষা-শিবিরে মোট ১৬ জন লোক-সাহিত্য বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও গ্রামসমীক্ষার প্রথম শিবিরটি যে অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিলো তা বিশেষ কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ইতিপূর্বে কোন সংগ্রহকার্য সম্ভব হয়নি, বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড়ে সরকারী বন বিভাগের সাহায্য ছাড়া কোন শিবির স্থাপন প্রায় অসম্ভব। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর অসাধারণ পরিচিতি এবং অনবদ্য কর্মপ্রচেষ্টায় বনবিভাগের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এমন একটি অঞ্চলে প্রথম সমীক্ষা শিবির স্থাপন করলেন যেখানে ইতিপূর্বে শিবির স্থাপন হয়নি, এমন কি, আজ পর্যন্তও যেসব অঞ্চলে দ্বিতীয়বার সংগ্রহ কার্য পরিচালনা করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এই

অঞ্চলটি আদিবাসীদের দ্বারা বিশেষভাবে পরিপূর্ণ। প্রায় দেড় হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত গভীর অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল এই অঞ্চলটি সভ্য জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই ছিল। তৃতীয়তঃ, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল চরমতম দরিদ্র ও রোগগ্রস্ত। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যে কি ধরণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতেন, তারও একটা পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই অঞ্চলে। সুতরাং বলা যেতে পারে এককালের একটি আদিবাসীর দল অরণ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষিকে অবলম্বন করে একটি স্থায়ী গ্রাম্য জীবনে রূপান্তর লাভ করেছিলো এবং ক্রমশঃ গ্রাম্য মানুষের রীতি নীতি, আচার ধর্ম ইত্যাদির সংস্পর্শে ক্রমে এক সংহত সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী হয়েছিলো, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান, অনাবৃষ্টি, জমির অনুর্বরতার জন্য তাদের চরম দারিদ্র ও মারাত্মক ব্যাধির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো বলেই তাদের সাংস্কৃতিক জীবনও শুষ্কপ্রায় হয়ে আসছিলো। ঠিক এমনি সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা দল উপস্থিত হল এই অবজ্ঞাত অঞ্চলটিতে। সেখানে এমন অনেক লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করা হোল, হয়ত আর দু-এক বছর পরে গেলে তা লুপ্ত হয়ে যেতো। অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে যে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ হয়েছিলো তা হচ্ছে ঝুমুর গীত। তার মধ্যে বেশীর ভাগই 'আদিবাসী ঝুমুর'। ছোটনাগপুর থেকে আরম্ভ করে মধ্যভারতব্যাপী গুজরাটের সীমান্ত পর্যন্ত যে আদিবাসী বসতি-সীমা (aboriginal belt) অগ্রসর হয়ে গেছে, তার সর্বত্র যে আদিবাসী সঙ্গীত প্রচলিত আছে তা সাধারণ ভাবে ঝুমুর নামেই পরিচিত। গভীর অরণ্যাবৃত, পার্বত্য ও নীরস প্রস্তরভূমি সমাকীর্ণ এই অঞ্চলে কৃষিকার্য ছিল অত্যন্ত দুরুহ। পশু শিকারই ছিল এককালে এ অঞ্চলের জীবিকা। প্রাকৃতিক জীবন সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপোষক। এই বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী তার অভিজ্ঞতা হেতু এই অঞ্চলে প্রায় এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত হয়েছে। এর একটি প্রধান অংশ অষ্ট্রিক শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করলেও দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর অভাব নেই। একই গ্রামে বা পাশপাশি গ্রামে প্রতিবেশী রূপে অবস্থানের দরুণ ভাষাগত ভিন্নতা সত্বেও একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত অঞ্চলে বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড়ে যে সমস্ত আদিবাসী বাস করে তারা প্রধানত সাঁওতাল বলেই পরিচিত। সেই সূত্রেই তাদের সঙ্গীও ঝুমুর। ক্রমে বাংলা ভাষার সান্নিধ্যে এসে আদিবাসীর ঝুমুর বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করেছে। আদিবাসী ঝুমুর তিনটি পদদ্বারা গঠিত।[১১] প্রথম পদটিতে সুর স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হয়ে এসে দ্বিতীয় পদটিতে একটু চড়ায় উঠে, তৃতীয় পদে খাদে নামে। এই সঙ্গীতের সঙ্গে মাদলের বাদ্য ও বাঁশির সুর সংযুক্ত হত। যে মাদল বাজাতো সে একক এবং যারা গান গাইতো তারা সমবেত ভাবে অর্ধবৃত্তাকারে পরস্পর হাত ধরাধরি ও কটি বেষ্টন করে নির্দিষ্ট পদক্ষেপে একবার পিছনে অগ্রসর হত ও পেছিয়ে যেত।

---

১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক-সাহিত্য, ৩য় খণ্ড,১৯৬৫ সং, পৃঃ ১০৩

সুতরাং অযোধ্যার অঞ্চলে প্রথম লোক-সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে ঝুমুর গানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। পরবর্তী অনেক শিবিরে বিশেষ করে বাঁশপাহাড়ীতে যে উচ্চপর্যায়ের রসমধুর ঝুমুর গান পাওয়া গেছে তার সাহিত্যগুণ উৎকৃষ্ট পর্যায়ের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে আমরা প্রথম যে ঝুমুর গানগুলি সংগ্রহ করেছিলাম তার মধ্যে ঝুমুর সঙ্গীতের আদি রূপ ও তার বিবর্তনের ধারাটি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগ্রহ কালে এবং সন্ধ্যাবেলায় সংগ্রহ পর্যালোচনার সময়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনার দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহকার্যকালে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে সংগ্রহ শিবির কি ভাবে পরিচালিত হতো তা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত করছি। প্রথমত ছাত্র-ছাত্রীদের দলটি সংগ্রহ ও সমীক্ষা কার্যের সুবিধার জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্রদলে বিভক্ত হতো। প্রত্যেক দলে ছেলে এবং মেয়েরা থাকতো এর ফলে সুবিধা হত :—(ক) তিনটি বা চারটি দল বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন গ্রামে যেয়ে সামগ্রিক ভাবে সংগ্রহ কার্যকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারতো। (খ) সব দলে ছেলে এবং মেয়ে থাকার জন্য এক একটি গ্রামে যেয়ে মেয়েরা বাড়ীর অন্দরে মেয়েদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সংগ্রহ কার্য চালাতে পারতো। লোক-সাহিত্যের অধিকাংশ উপকরণই মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অপরদিকে ছেলেরা বহিরঙ্গনে পুরুষদের সঙ্গে গল্পগুজব করে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ কার্য চালাতো। দ্বিতীয়ত সংগ্রহ কার্য সাধারণত শুরু হত প্রতিদিন সকাল ৬-৩০টা থেকে। তার পূর্বে অর্থাৎ সকাল ৬টার সময় শিবিরাধ্যক্ষ সব সভ্যসভ্যাকে নিয়ে নিকটস্থ কোন একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করে প্রার্থনা করতেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে শিবিরাধ্যক্ষও কর্মসূচনা করতেন এবং সেই সভাতেই তিনি কর্ম নির্দেশ দিতেন। দল বিভাগ করতেন, দলনেতা নির্বাচন করতেন, এবং কোন দল কোন দিকে যাবে এবং কি ধরণের সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে, কোন কোন জিনিস পরিহার করে চলতে হবে তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তৃতীয়ত সামান্য জলযোগের পর খাতা, পেনসিল ও অন্যান্য সামগ্রী সহ দল-নেতারা তাঁর দলটি নিয়ে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তো। তা না হলে শিবিরাধ্যক্ষের মৃদু তিরস্কারের ভয় থাকত। এমন অনেক সময় দেখা গেছে জলযোগের সময়াভাবে কোঁচড়ে মুড়ি তেলেভাজা নিয়ে সভ্যসভ্যারা রাস্তায় রাস্তায় খেতে খেতে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। বেলা ১২টা পর্যন্ত প্রায় ৬/৭ ঘণ্টা ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সংগ্রহ ও সমীক্ষা কার্য চালাতো। শিবিরাধ্যক্ষ এক একদিন একটি বিভাগের সঙ্গে গ্রামে যেতেন এবং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহের পদ্ধতি, গ্রাম সমীক্ষার রীতিনীতি সমস্ত কিছুই হাতে কলমে শিখিয়ে দিতেন। কোন একটি বিশেষ গ্রামে কোন একজন বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত গায়কের সন্ধান পাওয়া গেলে শিবিরাধ্যক্ষ নিজে পায়ে হেঁটে দীর্ঘমাইল অতিক্রম করে ছাত্রছাত্রীসহ সেখানে উপস্থিত হতেন, ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে গান লিখিয়ে নিতেন, নিজে টেপ রেকর্ডে গান সংগ্রহ করতেন এবং প্রয়োজন

বোধে সেই গায়ককে সঙ্গে করে শিবিরে নিয়ে আসতেন। পশ্চিম সীমান্তের এই পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে রৌদ্রের উত্তাপ খুব বেশী। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রখর থেকে প্রখরতর হতে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা এপ্রিল-মে মাসের ঐ অঞ্চলের অসম্ভব গরমেই সংগ্রহ কার্য চালাতো। এমন কি, শিবিরাধ্যক্ষের বয়স ও শারীরিক অসুবিধা থাকা সত্বেও ঐ সূর্যতাপকে উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করেছেন। রৌদ্রদগ্ধ ভূমির এই সীমান্ত প্রদেশগুলিতে সমীক্ষা ও সংগ্রহ কার্য শিবির স্থাপনকালে প্রতিদিন এভাবেই প্রায় ছ-সাত ঘণ্টা ছাত্রছাত্রী ও শিবিরাধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হত। সংগ্রহকার্যকালে যেমন আমাদের মূল লক্ষ্য লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ, লোকগীতি, লোককথা ধাঁধা প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করা হত, ঠিক তেমনি গ্রামের সামগ্রিক পরিচয় তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কেও একটি পরিপূর্ণ সমীক্ষা করা হোতো। সেখানে মন্দির, দেবস্থান, গেরাম দেবতা, দেওয়াল চিত্র, হস্তশিল্প, জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন রীতিনীতি, সামাজিক সংস্কার, লৌকিক বিশ্বাস, ধর্মীয় আচরণ সমস্ত কিছুই সাধ্যমত পরিবেশন করা হোত। তৃতীয়ত শিবিরের এক দিনের এই তৃতীয় পর্যায়ে যা করা হোত, তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত বিষয়গুলি বাছাই করা এবং বিভিন্ন পর্যায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং সেগুলি ফুলস্কেপ কাগজে বিভিন্ন বিভাগে দল নেতার নেতৃত্বে বিষয় ও শ্রেণী অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে অনুলিপি করে ফেলা। এটাও ছিল ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একান্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু শিবিরাধ্যক্ষের নির্দেশে ছাত্রছাত্রীরা সারাদিনের সংগ্রহের কঠিন পরিশ্রমের পরও এই যে সংগ্রহগুলির লেখার কপি করার কাজ করতো তাব দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা লোকসাহিত্যের ছাত্র হিসাবে লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজ ত শিখতোই, উপরন্তু লোকসাহিত্যের বাছাই, শ্রেণীবিন্যাস, বিষয়বিভাগ ইত্যাদি কঠিনতম শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেত। লোকসাহিত্য যে কেবলমাত্র শুষ্ক পুথিপাঠ বা পুস্তক পাঠ নয়, তার জীবন্ত বিষয়বৈচিত্রেব মত শিক্ষাপদ্ধতি ও যে হাতে নাতেই (practical) সম্ভব পর এইসব সংগ্রহ ও সমীক্ষা শিবিরেই হাতে কলমে তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যেত। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মতে লোকশ্রুতি পর্যালোচনার পাঁচটি দিক আছে। প্রথমতঃ যথাযথ সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, তৃতীয়তঃ সংগৃহীত বিষয়গুলির মধ্যে লোক-বিশ্বাসের স্বরূপ নির্ণয় করা, চতুর্থত কোন সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক দিক থেকে এর সৃষ্টি, তা নির্ণয় করা, পঞ্চমত ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের উপর সংগৃহীত লোকশ্রুতির প্রভাব কতখানি তার বিচার। লোকসাহিত্য সংগ্রহ শিবিরের প্রত্যেকটি শিবিরেই প্রত্যক্ষ সংগ্রহ, নির্বাচন শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদির দ্বারা লোক-সাহিত্য সংগ্রহের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতেন এবং ছাত্রছাত্রীরাও কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা সেগুলি আয়ত্ত করতো। তাই তৃতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত বিষয়গুলি নকল করার সময়েই এই শিক্ষার অনেকটাই আয়ত্তে এসে যেত। চতুর্থতঃ একটি

সংগ্রহ শিবিরের চতুর্থ পর্যায়ে যে কর্ম অধ্যায়টি অনুষ্ঠিত হত সেটি হচ্ছে সান্ধ্য অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের শিবিরাধ্যক্ষের সামনে সারা দিনের সংগ্রহের তালিকা ও সংগ্রহগুলি পেশ করা হত। দ্বিপ্রহরে সংগ্রহগুলির বাছাই ও বিন্যাস পর্ব সমাপ্ত করে বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রহের বৈশিষ্ট্যসহ সংগ্রহগুলির তালিকাবদ্ধ একটি বিবরণ প্রত্যেক দলের নেতাকে পেশ করতে হত, এই বিবরণীর মধ্যে যে সমস্ত গ্রাম থেকে সংগ্রহ কার্য হয়েছে সেই সমস্ত গ্রামের একটি সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সমীক্ষা উপস্থিত করা হতো। কোন বিশিষ্ট ধরণের সংগ্রহ থাকলে তার একটি বিশদ বিবরণ দিতে হোত সেই সঙ্গে শিবিরাধ্যক্ষের নির্দেশ মত কিছু কিছু সংগৃহীত লোক-সাহিত্যের উপকরণ পড়ে শোনান হত। শিবিরাধ্যক্ষ প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য, ভুলত্রুটি ও গুণাগুণ বর্ণনা করতেন। এই সময় লোকসাহিত্য সম্পর্কিত বিচারের পদ্ধতিটি ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হত। লোক-সাহিত্য যেহেতু মৌখিক সাহিত্য, লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে এর অবস্থান সেইজন্য লোক-সাহিত্য দেশে দেশে চিরপরিবর্তনশীল। তাই লোক-সাহিত্যের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, রূপান্তরের প্রক্রিয়া ও তার রূপ সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রত্যেক লোক-সাহিত্য গবেষকের একান্ত কর্তব্য। কারণ এর দ্বারাই লোক-সাহিত্য সৃষ্টি উৎসে কোন্ কোন্ সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদান বর্তমান সমাজ পরিচয় লাভ সম্ভবপর হয়। শিবিরের চতুর্থ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা শিবিরাধ্যক্ষের কাছ থেকে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারতো। ফলে পরবর্তী জীবনে তারা এর দ্বারা বহুভাবে উপকৃত হয়েছে এবং নিজস্ব অভিযানে একক সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

পঞ্চমত শিবিরের পঞ্চম অধ্যায়ে হত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এটি ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। তারাই নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করে, অনুষ্ঠানলিপি তৈরী করে অনুষ্ঠান পরিচালিত করত। এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীরাই দর্শক হিসাবে থাকতো তা নয় গ্রামের অধিবাসীরাও উপস্থিত থাকত। সকালে যে সমস্ত সভ্যসভ্যা বিভিন্ন গ্রামে যেত সেখানকার সকলকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসতো, সন্ধ্যাবেলায় গ্রামবাসীরা শিবিরে আসতো এবং অনুষ্ঠানটি দেখত। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটিকে শিবিরের ক্ষেত্রে 'গ্রাম সংযোগ' পর্যায়ে ফেলা চলে। গান, নাচ, আবৃত্তি, মূকাভিনয়, নাটিকা নানা ধরনের বিষয় উপস্থিত করা হোত। কয়েকটি শিবিরে যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হয়েছিল। কয়েকবার, এমন কি, স্বয়ং শিবিরাধ্যক্ষ যাত্রগানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য এতে গ্রামবাসীরা এত উৎসাহিত বোধ করতেন যে তাদের নিজস্ব যাত্রাদলের সাজসজ্জা আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করতেন। গ্রামের লোক-শিল্পীরা তাদের লোক-সঙ্গীত, লোক-কথা দিয়ে কখনও এই অনুষ্ঠানের আসরকে জমজমাট করে তুলতেন। এইভাবে শহরবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের এমন একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হত যে পরবর্তী ক্ষেত্রে সংগ্রহ কার্য আরও সার্থক হয়ে উঠতো, পরস্পরের চেনা জানার পরিধি এত বেড়ে

যেত যে শিবিরশেষে ফিরে আসার পরও চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বহুদিন পর্যন্ত সংযোগ থাকতো। স্কুলের ছেলেমেয়ে তাদের নিজস্ব গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়েও দিত এবং এইভাবেই এক একটি শিবিরের দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও শিক্ষণীয় ও আনন্দময় হয়ে উঠতো।

অযোধ্যা অঞ্চলের সংগ্রহ যে সমস্ত গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিলো তাদের মধ্যে অযোধ্যা, মাঝিডি, সাহেবডি, ইত্যাদি গ্রামই অন্যতম। এই গ্রামগুলি সমীক্ষা করে সেখানকার অর্ধ-আদিবাসী অধিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সংগ্রহ করা হয়। লোক-সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে এই অঞ্চলে সর্বাধিক সংগৃহীত হয় ঝুমুর-গান। এই ঝুমুর গানগুলির মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণলীলার ঝুমুর, ভারত-পালা ঝুমুর, লৌকিক ঝুমুর, কাঠিনাচের ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর, দাঁড় ঝুমুর, নাচনী নাচের ঝুমুর, পাতা নাচের ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর, সাঁওতালী ঝুমুর। তাছাড়া টুসুগান। অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু ছড়া ও ধাঁধা উল্লেখযোগ্য। ঝুমুর গানের আদি সুর এবং আদি রূপ বাঙালী সাঁওতাল জাতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছে, সাঁওতাল জাতিও ক্রমে বাঙলা ভাষা শিখে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে প্রচলিত ঝুমুর গান রচনা করেছে। লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ছাড়াও এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিকভাবে পরিচিত হয়। পুরুলিয়া থেকে কিছু দূরে নিমডি গ্রামে একটি সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ছৌ-নৃত্য দেখা হয় সারা রাত জেগে। পরের দিন পুরুলিয়ার অনতিদূরের একটি গ্রামে গাজন পরব ও চরকের মেলা দেখতে যাওয়া হয়। এ ছাড়া বহু মন্দির, দেবস্থান, গেরাম দেবতার থান ঘুরে ঘুরে দেখা হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা কেবলমাত্র লোক-সাহিত্যই নয়, লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও রীতির সঙ্গে পরিচিত হয়।

উনিশশো বাষট্টি সাল থেকে উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বাংলা এম.এ-র 'লোক সাহিত্য' বিশেষ পত্রের ছাত্র-ছাত্রীরা যে ক্ষেত্রানুসন্ধানের শিবির স্থাপন করে প্রত্যক্ষ থেকে লোক সাহিত্য সংগ্রহের যে ভূমিকা পালন করেছিল তা এককথায় লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠানিক পর্বের একটি গৌরবময় ইতিহাস। সে গৌরবময় ইতিহাসের সূচনায় যাঁরা প্রথম অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা রায়, দীপালী ঘোষ, কমলা পেরেরা, সাধনা লাহিড়ী, শকুন্তলা দেবী, সুমিত্রা দাশগুপ্ত, তাপসী বসু, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দুলাল চৌধুরী, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত চক্রবর্তী, পার্থ ঘোষ, সুধাংশু পাসমস, নারায়ণ ইন্দ্র, অমর আদক, বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক এবং পক্ষী-তত্ত্ববিদ প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত। এই প্রবাহ এবং লোকসাহিত্য সংগ্রহের কর্মধারা উনিশশো একাত্তর সালের পর একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় পঁচিশ বছর পরে উনিশশো ছিয়াশী সালে ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ষোলজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে চোদ্দই এপ্রিল থেকে সতেরোই এপ্রিল লোক-সাহিত্য সংগ্রহ শিবির স্থাপিত হয় পুনরায় পুরুলিয়ার সেই অযোধ্যা পাহাড়ে। সেখানে পয়লা বৈশাখ তেরোশো

তিরানব্বই প্রাতঃকালীন সভায় ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাবটি এই :

আজ ১লা বৈশাখ ১৩৯৩। আজ থেকে পঁচিশ বৎসর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের লোকসাহিত্য বিশেষ পত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি দল ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্মের জন্য পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত অযোধ্যা পাহাড়ের এই বনবিভাগের বাংলোয় এসেছিলেন। সেই দিনটির স্মরণে আমরা আজ পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য বিশেষ পত্রের এম.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এখানে ক্ষেত্রানুসন্ধানে এসেছি—আমরা সানন্দে উদযাপন করছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য বিশেষ পত্রের ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্মের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উৎসব।

আমরা এই ঐতিহাসিক দিনে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, স্মরণ করছি প্রথম বৎসরসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্যের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কথা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির ছাত্র-ছাত্রী গবেষকদের কথা।

আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে লোকসংস্কৃতি স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং অদীক্ষিত, সৌখীন ও ব্যবসায়িক লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বস্তু ও বিষয়নিষ্ঠ লোকসংস্কৃতির যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পথ প্রশস্ত হবে। এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিম্নলিখিত ছাত্র-ছাত্রীদের দল—

অশোক আচার্য, অমৃতরঞ্জন পর্যা, অরুন্ধতী চ্যাটার্জী, তপন কর, শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, জয়ীতা দে, সুতপা দত্ত, শুক্লা সাহা, বলরাম নাথ, অপর্ণা দে, গৌরী তালুকদার, দিলীপকুমার ভাদুড়ী, হরেকৃষ্ণ মাহাতো, কৃষ্ণা ভাদুড়ী, রীতা চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় সরদার—তিনটি দলে ভাগ হয়ে এই ছাত্র-ছাত্রীরা অযোধ্যা পাহাড় ও তৎসন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ করে এবং গত পঁচিশ বছরে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়। নানা বৈশিষ্ট্যগুলিকে তথ্যসংগ্রহের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। এরই ঠিক চার বছর পরে একটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ইতিপূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা উপাদান সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু উত্তরবঙ্গের যে বিস্তৃত অঞ্চল এখনও অবজ্ঞা এবং অবহেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে—সেখান থেকে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির তথ্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সেই সূত্রে পশ্চিম দিনাজপুর ডালখোলা অঞ্চলটিকে উনিশশো নব্বই সালে সংগ্রহ-শিল্পের শিবিররূপে স্থির করা হয়। এই শিবির স্থাপনটি নানাদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথা :

প্রথমতঃ উত্তরবঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্যের বিশেষ পত্রের ছাত্র ছাত্রীদের লোকসাহিত্যে সংগ্রহ শিবির স্থাপন এই প্রথম। দ্বিতীয়তঃ এই শিবিরটি স্থাপিত হয়েছিল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ডালখোলা সৎসঙ্গ আশ্রমে। একটি প্রতিষ্ঠানের পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে শিবির পরিচালনা এই প্রথম। তৃতীয়তঃ এই প্রথম ছাত্র ছাত্রীদের শিবির পরিচালনার ক্ষেত্রে রান্না-বান্না, খাওয়া, থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার করতে হয়নি, ফলে ছাত্র ছাত্রীরা অধিক সময় সংগ্রহ কার্যে ব্যস্ত থাকতে পেরেছে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সেগুলি সুবিন্যস্ত করা, রিপোর্ট তৈরী করার ব্যাপারে-বহু সময় দিতে পেরেছে। চতুর্থতঃ এই প্রথম প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে স্থানীয় একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং সংগ্রহ কার্যের গাইড হিসাবে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পনের থেকে বিশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে বিভিন্ন গ্রামে সংগ্রহকার্য চালাতে পেরেছে এবং অতিরিক্ত সময় দিয়ে সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। পরে দেখা গেছে, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে শহুরে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে লোকায়ত গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ, গৃহবধূ, বালক বালিকা, গায়ক গায়িকা, গল্পকথক ইত্যাদিদের সঙ্গে একটি প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণে লোকসাহিত্য সংস্কৃতির যে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে সেগুলির মধ্য থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ছাত্রছাত্রীদের রিপোর্টগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উনিশশো নব্বই সালে উত্তরবঙ্গের ডালখোলার শিবিরে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের বিভাগ অনুযায়ী নামের তালিকা।

'ক' বিভাগ

১। সুদেষ্ণা রায় (নেত্রী)
২। সুলেখা ঘোষ
৩। ভাবতী সাহা
৪। সুভাশীষ ভুক্তা
৫। সুরজিৎ বসু

'খ' বিভাগ

১। সুপর্ণা দে (নেত্রী)
২। প্রণব সরকার
৩। সুপর্ণা ঘোষ
৪। মীণাক্ষী দত্ত
৫। মীনা পাণ্ডে

'গ' বিভাগ

১। সুব্রত নারায়ণ মজুমদার
২। সুপ্রিয়া নায়েক
৩। রুবি ভট্টাচার্য
৪। লিপি সরকার
৫। ইরা সরকার

'ঘ' বিভাগ

১। নিশীথ মাহাতো
২। পারমিতা চৌধুরী
৩। সাহেরা তরফদার
৪। যশোদা ঘোষ
৫। অখিল বিশ্বাস
৬। মধুমিতা মজুমদার

পরিচালক হিসাবে ছিলেন—

১। ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়

এছাড়া আরও কয়েকজন শিবির পরিচালনায় সাহায্য করেছেন, শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, শ্রীমতী জয়শ্রী ঘোষ ও শ্রীপ্রভাস চক্রবর্তী। এছাড়া সৎসঙ্গ আশ্রমের পক্ষ থেকে ছিলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ, যজ্ঞেশ্বর রায়, পরিমল ঘোষ।

নবপর্যায়ের এই শিবিরটিতে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ কি ধরণের অভিজ্ঞতার শরিক হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে পরবর্তী অধ্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত প্রতিবেদনে এবং সংগ্রহ তালিকায়। যে শিবিরটি উনিশশো নব্বই সালের পাঁচই মে থেকে নয়ই মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডালখোলা সৎসঙ্গ আশ্রমে। এই শিবিরটিও যথারীতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের শিবির পরিচালনার ধারায় পরিচালিত হয়েছিল। প্রাতঃকালে প্রার্থনা অনুষ্ঠান এবং দিনের কর্ম নির্দেশ, পরে সংগ্রহের কার্যে বিভিন্ন গ্রামে পরিভ্রমণ, প্রাতঃকালীন আহারের পর দুপুরে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরিপাটি তৈরী, সংগ্রহের বিষয়গুলির শ্রেণীবিন্যাস ও অনুলিখন করা, বিকালে আশ্রমের বিনতি-প্রার্থনা করার পর প্রত্যেকটি গ্রুপের দলনেতার প্রতিবেদন পেশ এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগ্রহগুলি পাঠ এবং পরিশেষে পর্যালোচনা এবং সভার শেষে ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় ভাওয়াইয়া শিল্পী পরিমল ঘোষ, যজ্ঞেশ্বর রায়, পরিমল সিংহ ইত্যাদিদের দ্বারা এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পরিসমাপ্তিতে সৎসঙ্গের শিল্পী অমিতাভ ঘোষের ঠাকুরের ছড়াগান—সব জড়িয়ে সংগ্রহ, বিন্যাস ও পর্যালোচনা সাংস্কৃতিক, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে প্রতিটিদিন জমজমাট হয়ে উঠতো।

॥ চার ॥

প্রথম দিবসের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের বিবরণ

বিভাগ—'ক'

১। সুদেষ্ণা রায়
২। ভারতী সাহা
৩। সুলেখা ঘোষ
৪। সুরজিৎ বসু
৫। সুভাশীষ ভুক্তা

আজ 6th May, রবিবার আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লোক-সাহিত্য বিশেষপত্রের ক্ষেত্রকার্যের জন্য পশ্চিমদিনাজপুরের ভালখোলা থেকে রওনা হলাম।

আমাদের প্রথমদিনের ক্ষেত্রে শিবির টুঙ্গীদীঘি গ্রাম। মৌজা জুকারপুর, পোষ্ট অফিস—করণদীঘি, পঞ্চায়েৎ ২নং আলতাপুর, জিলা—পশ্চিমদিনাজপুর।

গৃহকর্তা সাধুচরণ দাস।

তাঁর কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম—

এই অঞ্চল রাজবংশী প্রধান। বেশ কিছু সাঁওতাল পরিবারও এই অঞ্চলে আছে। এটি প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান এলাকা। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা মাটির কাছের মানুষ, এদের ভাষা-সংস্কৃতি সমস্তই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ সংস্কৃতি বা শহুরে সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র।

অঞ্চলটি বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের সীমান্ত অথবা সংযোগস্থল বলে এখানে তিনটি প্রদেশের সংস্কৃতি জীবনযাত্রার মান মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় মানুষ অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ হওয়ায় আমাদের কাজ করতে কোনরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। এমনকি জনপ্রিয় টি. ভি. সিরিয়াল 'মহাভারত' দেখার সুযোগও আমরা হারাইনি। এখানকার বহুলোক বর্ত্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী, মৈমনসিংহ জেলা থেকে আগত। তাই সেখানকার সংস্কৃতি, রীতিনীতি ইত্যাদিও এখানেও এসে মিশ্রিত হয়েছে।

এই অঞ্চলের আদিবাসীদের সাংগীতিক পরিমণ্ডল—এরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে নাটক গান রচনা করে। যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলে পুলিয়া এই গানে কোন কোন সময় সংলাপও থাকে। বিশেষ বিশেষ দিনে এরা কোন এক জায়গায় সমবেত হয়ে এই অনুষ্ঠান বা নাটকগান করে। ঐতিহাসিক কাহিনীভিত্তিক এই নাটকগুলি রচিত। যেমন মুর্শিদকুলি খাঁর হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারটা।

(২) এছাড়া প্রেমজ ঘটনাকেন্দ্রিক গান, যাকে এখানে বলে বুদাইসোরী গান তাও উল্লেখযোগ্য। বুদাইসোরী গান সমসাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক, যাকে 'বাউদিয়া' গানও বলে। —এর একটি গান, আমরা সংগ্রহ করেছি। যেমন—বিয়েব পর বউ মারা যাবার পর বিপত্নীক স্বামী আক্ষেপ করে গান গাইছে—

'ঢ্যানার মন কান্দেরে দারুণ বিধুতা
আর কতদিন হবে ঢ্যানার শুভ লক্ষণা ব্যাহা।

তারপর মা বলছে—

বেটা শুনবো বে কথা
কাল না হইতো পরশু দিন দিব
তোমাকে বেহা।

(৩) সাধুতত্বের গান—সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম কালে এই গান গাওয়া হয়। এরকম একটি গান হল—

'গুরু আমায় উপায় বল না
জনম দুখী কপাল পোড়া আমি একজনা।
শিশুকালে মৈল মাতা, গর্ভে রেখে মৈল পিতা,
চোখে দেখলাম না।
কে করবে লালন পালন, কে করবে জীবের সান্ত্বন
গুরু আমায় উপায় বলো না।

(৪) চোরচুন্নী—চোরচুন্নী সাধারণতঃ কালীপূজাব সময় গাওয়া হয়। চোরচুন্নী গানের মধ্যে আলোমতী—প্রেমকুমার গান বিখ্যাত। প্রশ্নোত্তরমূলক গান।

সংগৃহীত একটি গান হল :—

ছায়ার জন্য বিরখে গেলাম
বিরখে নাহি পাতা
হায় দারুণ বিধুতা।
মুই অভাগিনী ডোর
মরণ হইল না।
হায় দারুণ বিধুতা।
আজি হামন সুন্দর নারী মরিবেরে কি তার
হায়, দারুণ বিধুতা।

আজি মরণের সময় রে মন কে দিলে বাধা
ও মোর খাবে রে মাথা
বিধি রে, হায় দারুণ বিধি
মুই অভাগিনী তোর
মরণ হইল নি।

পূজা-পার্বণ :—আষাঢ় মাসে রাজবংশীরা আষাঢ়ী পূজা করে। আষাঢ়ী পূজা হলো বিষহরি মনসার পূজা। এই প্রতিমা সোলার তৈরী। পূজো একদিন ধরে হয়। পুরোহিত লাগে না। মেয়েরা মনসার পূজা করে। মনসার পূজাতে চিনি ছাড়া দুধ ও আতপ চাল এবং কলার ছড়া ও কবুতরের বাচ্চা লাগে।

ক্ষেত্রপূজা সাধারণতঃ বৈশাখের সকালে হয়। মাঠের থেকে নতুন ধান নিয়ে ঢেঁকিতে ধান ছেটে সেই খুদ দিয়ে তুলসীতলায় এই পূজা হয়। ফসল ভালো হওয়ার জন্যই এই পূজার প্রচলন।

ভাষারীতি :—রাজবংশীদের ভাষারীতির নিদর্শন :—

যেমন—তোক কি নাম ?
মোর নাম নিত্য।
তোর ঘর কুনতি ?
মুই সাদীপুরের।
কোন থান যাবো রে ?

টুঙ্গিদীঘি ব্যাসান করতে যাম।

মোরও একখানি সামান লিয়াসিস তো ?

মুই যে ফের দেরী হবে। মোর দেরী হবার পর যদি থাখা পারিস তাহলে মুই লিয়া আসা পারিস।

এই ভাষার মধ্যে হিন্দীর প্রভাব ও বহু হিন্দী শব্দ রয়েছে। প্রাকৃতিক অবস্থিতির জন্যই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

আমাদের প্রথম দিনের এই সংগ্রহকার্যে গ্রামের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সংসঙ্গের প্রতিটি মানুষের, বিশেষতঃ চিত্তবাবুর প্রভৃত সহযোগিতা আমাদের অপরিসীম সাহায্য করেছে। এজন্য তাঁদের কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

লোকসংস্কৃতি : ক্ষেত্র গবেষণা
খ বিভাগ

আজ ৬ই মে রবিবার ১৯৯০ সাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সংস্কৃতি বিভাগের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম দিন। কালের নিয়মে সময় পেরিয়ে যায় পড়ে থাকে ইতিহাস। আর ৬ই মের ইতিহাস আমাদের নূতন তাৎপর্যের বাহক। বাহক মানুষজনও। যুগ যুগ ধরে তারা বয়ে চলে সংস্কৃতি যার অন্য নাম লোকসংস্কৃতি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের অস্থায়ী শিবির শুরু হয়েছে আজই। পশ্চিমদিনাজপুর জেলার সীমান্ত শহর ডালখোলায়। সেখান থেকেই সকাল নটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম ক্ষেত্র গবেষণার কাজে। শিলিগুড়িগামী দূরপাল্লার বাস শিবশক্তিতে উঠে বসলাম খ বিভাগের পাঁচজন কর্মী। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে ৩৫ মিনিট চলার পর আমরা নেমে পড়লাম অসুরাগড় নামক স্থানে। সেখান থেকে প্রায় ৩০ মিনিট হেঁটে আমরা পৌছলাম ঝিটকিয়া নামক সীমান্তবর্তী গ্রামে।

মাথার উপরে খাঁ খাঁ রোদ্দ র, পায়ের নীচে উত্তপ্ত বালুরাশি, এইভাবেই পথ ভেঙ্গে পৌছে গেছিলাম সাধারণ মানুষের কাছে। আসলে গ্রামের মানুষগুলোই তো লোক-সংস্কৃতির মণি। তাদের আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ ও ভাষায় তা প্রতিমুহূর্তে প্রকাশমান।

এখানে সব থেকে বড় পরব দুর্গাপূজা। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে পাঁচালীগান, রামায়ণী গান, তর্জা গান, অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বেশীর ভাগ মানুষই অন্ত্যজ শ্রেণীর। বিশেষতঃ তপশিলী জাতি ও উপজাতি অন্তর্ভুক্ত বাগদী, বুনো, হাড়ি, সাঁওতাল প্রভৃতির বাস। এখানের মানুষ কৃষিকাজ, ভানকি ব্যবসা করে জীবন কাটায়। এখানে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। সদর হাসপাতাল ৩০ মাইল দূরে। সুতরাং হাতুড়ে ডাক্তার, ফোক্-মেডিসিন, ওঝা, বদ্যির প্রভাব প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। এখানকার লোকজন হাঁড়িয়া, মদ, গাঁজা, তাড়ি প্রভৃতির নেশা করে থাকে।

গ্রামজীবনে হরিঠাকুর, পিয়ার ঠাকুরের প্রভাব আছে। পৌষমাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এখানের অধিবাসীরা সবাই মিলেমিশে হারাম গান বা হারান নামের একজাতীয় নৃত্যসহযোগে গীত করে থাকে। যার মূল উদ্দেশ্য ফসল কাটার আনন্দ উপভোগ করা। পৌষমাসজুড়ে ছোটরা করে থাকে এসড়া পূজো। এখানকার বয়স্ক লোকেরা ধাঁধা এবং কবিগানের ভক্ত। কেউ কেউ গেয়ে শোনালেন। কিন্তু পরবর্তী সন্তান সন্ততিদের মধ্যে এ জাতীয় লোকসঙ্গীত এমন কি লোকক্রীড়াও দেখা যায় না। পাশাপাশি এসেছে আধুনিক টিভি কাল্চার। এভাবেই মানুষ ও তার সংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করতে করতে একসময় পশ্চিমে ঢলে পড়ছে সূর্য। গ্রামের মানুষই পৌছে দিয়ে গেছে অসুরাগড় বাসস্টপে। রায়গঞ্জগামী সোনা (সনা) নামক গাড়িতে চড়ে ডালখোলা সৎসঙ্গ বিহারের অস্থায়ী শিবিরে পৌছলাম দুপুর ২-৩০মিনিটে।

সংগ্রহ বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য

আমাদের 'খ' বিভাগের কর্মীদের নাম যথাক্রমে (১) সুপর্ণা দে, (২) প্রণব সরকার, (৩) মীনাক্ষী দত্ত, (৪) মীনা পাণ্ডে এবং (৫) সুপর্ণা ঘোষ।

তারিখ—৬। ৫। ২০ স্থান—ঝিটকিয়া

সংগ্রহের নাম—হারান গান

পৌষমাসে ফসল তোলার ১৫ দিন আগে থেকে ছেলে-মেয়েরা এই গান গেয়ে থাকে। কৃষ্ণের সখীদের সঙ্গে লীলা থেকে শুরু করে যাবতীয় কৃষ্ণকথা এবং রামায়ণের বিষয়কে কেন্দ্র করে এই গানের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। শেষে পৌষ সংক্রান্তির দিনে বাস্তুপূজার মধ্যে দিয়ে এই হারান গান পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

গাযকেব নাম—নগেন্দ্রনাথ বল। বয়স—৫০ বছর।

গ্রাম—ঝিট্‌কিয়া।

॥ রামায়ণ বিষয়ক ॥

(১) মনে দাগ লাগালে
রাজা হব রাজ্য পাব
এই ভাবিলাম মনে।
কৈকেয়ী মায়ের কুমন্ত্রণা
আমায় পাঠাইল বনে রে
আমায় পাঠাইল বনে।
রাম বনবাসে রাজ্য নাসে
দেশে মৈল পিতা।
মনে দাগ লাগালে ॥
সীতা মৈলে সীতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে
গুণেব ভাই লক্ষ্মণ মৈলে আমি ভাই বলিব কারে।
উঠ উঠ ভাই রে লক্ষ্মণ উঠে কথা বল রে।
অভাগা রাম ডাকে তোমায়
একবার নয়ন মেলিয়া দেখ রে।

॥ কৃষ্ণ বিষয়ক ॥

(২) ওরে সুন্দর নায়ের মাঝি
পার কর পার কর রে নাইয়া
বেলার দিকে চাহিয়া রে
ওরে সুন্দর নায়ের মাঝি ॥
বেলার দিকে চাহিয়া ॥
রাধিকারে পার করিতে আমার বেলা গেল বইয়া
ওরে সুন্দর নায়ের মাঝি।

আগা দিয়া উঠ লো রাধে পাছে এসে বস রে
ওরে সুন্দর নায়ের মাঝি
পাছে এসে বস
ফুটে ফুটে ফেলো জল রাধে
লজ্জা কেন করো রে
ওরে সুন্দর নায়ের মাঝি ॥

এইগুলি ছাড়া স্থানীয় অধিবাসীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিগান গেয়ে থাকেন। নীচে কয়েকটি সংগৃহীত কবিগানের তালিকা দেওয়া হল।

গায়ক—কার্তিক চন্দ্র বাড়ুই। বয়স—৭৪ বছর।
গ্রাম—ঝিট্‌কিয়া।

(১) বন্ধ হোল ধর্মের গুদাম / পিতায় খাটে পুত্রের গোলাম
কুলুকে পায় হাজার সেলাম / গোকুলের মাথায় ভুজঙ্গের নৃত্য
বাবু এ কথা সত্য ॥
মশার পেটে শুলের আণ্ডা / মক্কা গেল গয়ার পাণ্ডা
ওরা বৈরাগী, যায় মদিনায় / একথা জানিবে নিশ্চয়
বাবু এ কথা সত্য ॥

(২) কারো শালা শালী আসলে বাড়ী / ভোজনে আয়োজন ভারি
জল খাওয়ায় খাস্তা কচুরি
ইষ্টি বাক্যে বলে ইষ্টি দেবতার ঠাঁই / মুখে মিষ্টি নাই
ও কারো মাতা পিতায় পিণ্ড দেয় না
ও শালার নামে হয় বিশ্ব শ্রাদ্ধ
বাবু এ কথা সত্য ॥

(৩) সাধন করে যদি মুক্ত হই
তবে কেন তোকে বলবে দয়াময়ি।
ওমা তোমার হেমন কাঁচা ছেলে নই
আমার নরকে উৎপত্তি নরককুণ্ডে স্থিতি।
ওমা না তড়াইলে তড়াব ভাবি নে।

গায়কের নাম—গুরুপদ মণ্ডল, বয়স—৭৮ বছর, গ্রাম—ঝিট্‌কিয়া

(১) উজান জলে কল চালাইয়া হওনারে মন পার
সেই নদীতে সান করিলে জন্ম মৃত্যু হবে না আর।
উজান জলে সান করিয়া হও না রে মন পার ॥

॥ ধাঁধা ॥

বক্তা—যোগেন চন্দ্র মণ্ডল, বয়স—৫০ বছর এঁরা ধাঁধাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলে পোঅল বা শোলোক।

(১) ওরে পক্ষী ঝন্‌ঝন্ করে / পরে পক্ষী স্তাদা
আদার (মাছ) খাইতে যায় / ন্যাজ থাকে তার বাঁধা।

উত্তর—মাছ ধরা জাল।

(২) চৌপায়ার উপরে লিপায়া নাচে / দোপায় নিচে জলে।
আসল কথা কইলে পরে / যাব তোমার দলে।

উত্তর—নদীতে ভাসমান মৃত গরুর উপরস্থিত মাছকে পাখির শিকার করা।

ক্ষেত্র গবেষণার প্রথম দিনে ক্ষেত্র ছিল সীমান্তবর্তী গ্রাম ঝিটকিয়া। ঝিটকিয়ার অধিবাসীদের জনজীবনে বিশেষ কতকগুলি দিক আজকের ক্ষেত্র গবেষণায় সংগৃহীত হল। যা আগামী দিনে লোকসাহিত্যের জগতে শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই কাজের মধ্য দিয়ে যে আনন্দ ও শিক্ষা যা আমরা পেলাম তা আগামী দিনে আরও কিছু ভাল কাজ করবার উৎসাহ ও প্রেরণা জাগাবে। পরিশেষে, সৎসঙ্গ বিহার-এর ভালখোলা আশ্রমের শ্রদ্ধেয় কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম পরামর্শ আমাদের চলার পথকে সুগম করেছে। তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাইনা।

তত্ত্বাবধায়ক : প্রতিকুল সরকার, রঞ্জন মুখার্জি

বিষয় :—উত্তরবঙ্গ ও বিহার প্রদেশের রাজবংশী নামক তপশিলী সম্প্রদায়ের জীবনে বিবাহ পদ্ধতি ও বিবাহের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের গান, প্রাত্যহিক জীবনে প্রবাদ ও ধাঁধাঁর প্রভাব, বিভিন্ন পালাগানের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের নানা কথা।

উ :—বিশাল ভারতবর্ষের গুটিকতক অঞ্চল জুড়ে রাজবংশী নামক তপশিলী সম্প্রদায়ের বাস। বিশেষ করে প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গ ও বিহার প্রদেশের বিশাল অঞ্চল জুড়ে এরা বসবাস করে। তাদের জীবন যাত্রার উপর আলোকপাত করার অভিপ্রায়েই আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা (লোকসাহিত্য) বিভাগের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী মিলিত-হয়েছিলাম আজ ৬ই মে ১৯৯০ পশ্চিমদিনাজপুর জেলার দো-মোহনা বাসষ্ট্যাণ্ডে নেমে পায়ে হেঁটে চৌনগড়া গ্রামে। অসংখ্য গ্রাম্য শিক্ষার আলোকবর্তিকাহীন মানুষের সাথে মিশে আমরা বুঝলাম এই পিছিয়ে পড়া তপশিলী সম্প্রদায়ের করুণ জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী।

আমরা চৌনগড়া গ্রামের ক্ষিতীশ সিনহার বাড়ীতে প্রথমে হাজির হয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের মাধ্যমে বিভিন্ন কথা জানতে পারলাম। বিবাহের পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে তারিণীবাবু বললেন যে বিয়ের আগের দিন কনে ও বরকে অধিবাস নামক মঙ্গল আরাধনার

কাজ সমাপ্ত করতে হয়। অধিবাসের অর্থ হল কনে ও বরকে সাবান দিয়ে মাথা ও গা, হাত, পা, পরিষ্কার করে স্নান করে, নূতন বস্ত্র পরিধান করে মিষ্টি মুখ করাতে হবে। এই ভাবে শুরু হবে বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠান। পরের দিন বিবাহ। অধিবাসের পর বর এবং কনেকে খালি পায়ে হাটতে দেবেন। এটা এই সম্প্রদায়ের রীতি। বিবাহের আসর হবে বাড়ীর উঠোনে। উঠোনের মধ্যে চারটি কলাগাছ পুঁতে মণ্ডপ তৈরী করতে হয়। এই বিবাহের মণ্ডপে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুযায়ী কিছু কিছু উপকরণ, যেমন—কোষা-কুষি, গঙ্গাজল, জলন্ত প্রদীপ ইত্যাদি থাকে। এছাড়া চালন, জলপূর্ণ ও আম্রশাখা দেওয়া ঘট থাকে। এই কলস বিবাহের দিন সকালে পাঁচজন এয়ো-স্ত্রী মিলে কুয়ো থেকে জল তুলে পূর্ণ করে এবং নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। একে পাণিসাজ বলে। বিবাহের দিন ছেলের মেয়ের বাড়ীতে যাত্রা করবার সময় মাকে সম্বোধন করে গান গেয়ে সিঁদুর এবং দই, চিঁড়ে এই সব সাজিয়ে দিতে বলে এবং তারপর মা ছেলেকে বলে এসব জিনিস কি হবে।

ছেলে— সাজায়ে দেগে মাও ভার ভারতী (দই চিড়া)।
সাজায়ে দেগে মাও সিন্দুরে পুড়িয়া ॥
মা— ভার ভারতী বেটা কিয়া করিবন রে ?
ছেলে— ভার ভারতী রে মাও দশক খিলাবো।
সিন্দুরে পুড়িয়া মাও বিয়া করিমু ॥

এরপর ছেলে বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করতে চলে যায়। মেয়ের বাড়ীর কাছাকাছি বাজনা পৌছালে মেয়ের বোন বৌদি, বা ঠাট্টার সম্পর্কীয় মেয়ে বৌ মিলে গায়—

নদীয়ার তীরে তীরে কিসের বাজন বাজে গো,
বাজন বাজে বহুত শুমানো গো।
বাজনের বোলি শুনে কান্দে কইন্যার মাও গো॥

এই সময় কনের মা কনেকে নিয়ে ঘরে দুয়োর দেয়। মেয়েরা গায়—
বেটিক লয়ে ভিরে গেল কেওয়ার (দরজা)।

এরপর বর কনের বাড়ীতে পৌছে কনের মায়ের বন্ধ দরজার সামনে গান গেয়ে চলে অনবরত।

খুল খুল শাশুড়ি বোজোর কেওয়ার গো।
শাশুড়ি নাহি খুলবো জামাই পঁচিশ জোওয়ান।
আমার মায়ের জামাই আড়াই বছর
নাহি দিম জামাই বালাহিক (মেয়েকে) বেহাইরে।

জামাই তখন শাশুড়ির মন ঘোরাতে বিনয়ের সঙ্গে তার এত বয়সে বিবাহ করতে আসার কারণ বলে—

ছোটইতে গিয়েছিলাম রাজার চাকরি।
হাউসতে রাখিয়াছিলাম এ দাড়ি॥
নাপিত মাঙ্গায় শাশুড়ি এ দাড়ি কামাহু।
ব্রাহ্মণ মাঙ্গায়ে শাশুড়ি এ বেদ পড়াহু।
দেহো শাশুর বালাহিক বেহাই।

এরপর শাশুড়ি দরজা খুলে জামাইকে মিষ্টিমুখ করায় ও বরাসনে বসায়। বরের বসার পর কনের বোন কিংবা বোন বা বৌদি স্থানীয় মহিলারা বরকে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে বিয়ের মণ্ডপে নিয়ে যায়। এই সময়ও তারা গান গায়। এই সময় কইন্যার আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথাকাতরা মা কান্নাভরা গলায় গান গেয়ে মেয়েকে বলে—

এ্যগেনা কা ধুপু ধুপু লহুত বরণ।
কাহা পরে কাহার রক্তুর পাণি।
আপুনারি মায়ো পড়ে গেলি মনে
পড়ে গেলি তুই দুই নয়নের পাণি।
যাজন গো বেটি দুরে শশুরালি।
কেনা দেগে মাও বলে ডাকো।

ক্রন্দনরতা কন্যা যদিও তার চিরপরিচিত পরিবেশ এবং সমস্ত আপনজন ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে নতুন মানুষদের মধ্যে গিয়ে ভীত হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে গেয়ে ওঠে—

আসিমো কো মাও বছর ছয়ো মাসো।
তেনা দিম গে মাও বুলে ডাকো॥

এরপর পাত্রকে ঘিরে পাত্রীকে একটা পিঁড়ির উপর বসিয়ে ভায়েরা পাঁচ পাক ঘোরায়। তারপর পাত্র পাত্রীর শুভ দৃষ্টি হয় ও কন্যা বরের গলায় মাল্য দান করে।

এরপর বর ও কনেকে বিবাহ মণ্ডপে বসিয়ে সিঁদুর দান ও বাসি বিবাহ হয়ে থাকে। বিবাহের এই সব অনুষ্ঠানের শেষে বরকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বাসরে বসানো হয়। বাসরের মধ্যে চলে নানা রঙ্গ রসিকতা। নানা গান।

ভাঙ্গা পালকি আনিছে ভাদের গাড়ি ঢুকাইছে
টিয়া নাকার ধিয়ার বেটি ভিতি দেখেছে।
ছিকো ছিকো মা মারিয়ো না যায় ইও দুলা কেমন গে।
ছিয়া ছিয়া ইও দুলার মাথায় ঠাট খুয়া বাসার
ছিয়া ছিয়া ইও দুলা কেমন গে॥
ইও দুলার হাতখান খার কয়া মুগদর খান।
ছিকো ছিকো ইত দুলার কেমন গে।

ইও দুলার পিঠিখান ধার করা পিড়া খান
ছিকো ছিকো মা ইওদুলা কেমন গে।

তারপর মেয়ের বিদায়ের মুহূর্তে সবার কান্না—

অভাগিনী বাযু ভরা গে করলা লাগাইনে।
করলার ভবক শুনাইয়া রয়ে গেলি রাতি।
অন রাহিবে পরে মো ধন সে রাহিবি।
ঘরের শোভা বেটি চলিয়া সে যাবে।

জামাই কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ী পাড়ি দেয়। বাড়ীতে পৌছবার পর বউ বরণের গান যা বোনেরা গেয়ে থাকে।

ঝিলিমিলি ঝিলিকিতে রে বাবা
কাজিয়া লাগি মঞ্জরীতে আসরে বাবা,
কাজিয়া লাগি বেরি উসপাস করিসলোরে।
কাজিয়া লাগি না পুরিবে আশা॥

বিয়ের মণ্ডপে দাঁড়ানো ছেলেকে উদ্দেশ্য করে যা ভবিষ্যৎ বাণী করে গায়—

দিন গোয়ালন রে বেটা অরণে বরণে।
রাত্রি গোয়ালন রে বেটা দুরে শশুরাজে॥
তুই চাইতে গো মইও শোশুড়ি তৈয়ারী।
সগো রাত্রি সে মাও *খিড়সা পাকাচে॥

*খিড়সা=পায়েস।

এই সমস্ত গানগুলিই বর্তমানে বর ও কনের উভয় বাড়ীতেই পাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত উভয় ক্ষেত্রেই এদের বোন বৌদি সম্পর্কিত আত্মীয়রা গেয়ে থাকে।

রাজবংশীদের এই বিবাহ সম্পর্কিত গানের মধ্য থেকে ছেলেদের বেশী বয়সে, এবং মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ের কথা জানা যায়।

গানগুলি সংগ্রহ করেছি রূপালী সিন্‌হা (বিবাহিতা), নিদানী, অরিলা (উভয়ই অবিবাহিতা) এদের কাছ থেকে। রূপালীর দুই ছেলে এক মেয়ে, স্বামী সরকারী চাকরি করেন।

প্রবাদ এবং ধাঁধা হল মানুষের জীবনপথের নানা ঘটনা। যার মধ্য দিয়ে রাজবংশী পরিবারের সাধারণ মানুষেরা নানা কষ্টের মধ্যেও আনন্দে স্ফূর্তিতে কাটাতে পারে। জীবনের একঘেয়েমী নামক অসারতার মধ্যে আনে বৈচিত্র্যের সম্ভার। আমরা কয়েকজন ওই গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখের ধাঁধা, প্রবাদগুলি একত্রে জড়ো করেছি। —ধাঁধাকে এরা ফাঁকরি বলে।—

প্রবাদ

মুখে সে হলভ্জল বচনে মধু
দেখালো মোখসিবাদ খিলালো কদু।
(মাংস)

(সুধাংশু সিন্‌হা)

দিন্ গেল আলে ঢালে জোনাকে শুকাল্ ধান
আনগে বেটি ছাম গাহিন লা।
তোব চাপে কুটুক ধান। (পবন সিন্‌হা)

ধাঁধা (ফাঁকরি)

দিলে দিবেনা নিদিলে দিবে (উঃ মই)
(যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা)

"খোকত পাসু আছড়ায় মাসু।"
(সর্দিতে নাক ঝাড়া—মণীন্দ্র সিন্‌হা)

"ভাঙ্গা ঘরে দেউরি নাচে।"
(মুড়ি ভাজা—ধীরাজ সিন্‌হা)

"চিরে চিড়িয়া চার রং খোঁপায় ঢুকলে এক রং।"
(পান)

এই সমস্ত নানা কথাই আমাদের সংগ্রহের তালিকায় আছে। এরপরে নানা গীতিকাও আমাদের সংগ্রহের তালিকায় আছে।

এরপরেই আসে আমাদের সংগ্রহের তালিকায় পালা গান। মানুষ নিজেদেরকে বিশেষ করে রাজবংশী সম্প্রদায়রা তাদের জীবনে নানা আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে ঋতু অতিক্রম করে থাকে। বারো মাসে নানা পালা পার্বণের মধ্যে কেটে যায় তাদের আদিবাসী জীবনের কষ্টের দিনগুলি। তাই আমরাও সেই নানা কষ্টের দিনগুলির কথা, যার মধ্য দিয়ে রাজবংশীরা মেতে ওঠে। বিভিন্ন পালা গান অভিনয়ের মাধ্যমে এরা মঞ্চে উপস্থাপনা করে থাকে। বাওদিয়া হল এমনিই একটি গান। এই পালা গানটি গাওয়া হয় সাধারণত কার্ত্তিক মাসে কালী পুজোর আগে। এ গানের বিভিন্ন পালার কথা আমরা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দো-মোহনা গ্রামের ছোট্ট বাজারে বসে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি।

এই পালা গানের মধ্যে "কারেন শরি" "পদ্মমাল শরি" হল দুটি পালা গান। এ গানটি কাহিনীমূলক নাটকের মতো। এই পালাটি এরা দল বেঁধে বাজনা সহযোগে নৃত্য সহকারে করে থাকে। মূলত অবসর বিনোদনই হল এদের মূল লক্ষ্য। এ গান শুধু ছেলেরাই করে থাকে, মেয়েরা অংশ নেয়না। ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে।

এই পালার কাহিনী বিষয়ে রামলাল সিন্‌হা নামে এক যুবকের কাছ থেকে কারেন শরি গানের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ গানের এক জায়গায় বলা হয়েছে যেমন—

যতই দেখি মিয়ের মধ্যে
লিখা পড়া শিখে কেবা চাকরি করে
লিখা পড়া পুতুল তোর হবে না তো ভাগ্যে।

এখানে পুতুলের মায়ের মনের খেদ প্রকাশ পেয়েছে। মা লক্ষ্য করেছে যে সে মেয়েকে লেখা পড়া শিখাতে চাইলেও মেয়ের সেদিকে লক্ষ্য নেই।

এখানে পুতুল অবস্থাপন্ন ঘরের একটি মেয়ে। এই পুতুলকে তার মা পড়াতে চায় এবং পুতুল পড়াশোনা করতে থাকে। কিন্তু বাবার জমি vested হয়ে যাওয়ায় পুতুলের পক্ষে পড়াশোনা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু পুতুলকে জীবন নামে একজন মুসলমান ছেলে ভালবাসত, তাই সে তাকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে বললো। জীবনের কণ্ঠে একটি গানে পুতুলের জন্য জীবনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়—

আজি ক্যানে ওরে পুতুল দুঃখ তোমার অন্তরে
ওরে পুতুলরে।—
দুঃখের কথা পুতুল বলোনা আমারে।
ওরে পুতুলরে—
নিত্য দিন ওরে পুতুল দেখি তোমার হাসি
আজি ক্যানে ওরে পুতুল দুঃখ দেখি
তোমার অন্তরে।

(গানটি গাওয়া হয় করুণ স্বরে)

এরপর পুতুল জীবনের সাহায্য নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পুতুলের বাবা মা বুঝতে পারে যে পুতুলকে জীবন ভালবাসে। কিন্তু জীবন মুসলমান বলে পুতুলের বাবা মা লেবরু নামে একটি যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেন। এতে জীবন মর্মাহত হয়। এদিকে একদিন পুতুল ও লেবরু যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাজার করতে যাচ্ছিলো তখন জীবন ডাকাত সেজে লেবরুকে খুন করে এবং পুতুলকে হরণ করে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সেই সময় জংলী সর্দার এসে পুতুলকে উদ্ধার করে এবং জীবনকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয় এবং কারেন বা পুতুলের বাবা মাকে খবর দিয়ে আনায় এবং বিজয় নামে এক যুবকের স ঙ্গে বিয়ে দেয়। অন্য দিকে জীবনের হয় জেল। এখানেই কাহিনীর শেষ।

এমনই একটা পালা হল "পয়মল শরি"। কারেন শরির মতই একই রীতিতে পয়মল শরি গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন—পয়মাল অবস্থাপন্ন ঘরেব মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে হল-এক গরীব ছেলের সঙ্গে। পয়মালের স্বামীর রোজগার তেমন নেই। গ্রামের (জিয়ার) বিলি করেন তুখর চেয়ারম্যান। তিনি পয়মালের স্বামীকে ঠিকমত জিয়ার দেননা—কারণ চেয়ারম্যান জানেন তার ঘরে সুন্দরী বউ পয়মাল আছে। তখন পয়মালের

স্বামী পয়মালকে পাঠায় জিয়ারের গম আনতে। তুখার চেয়ারম্যান পয়মাল দেখে বেশী গম দিতে চায়। কিন্তু এতে পয়মালের আত্মসম্মানে ঘা লাগে এবং গম না নিয়েই বাড়ী চলে আসে। এদিকে সংসারেরও কোন উন্নতির লক্ষণ না দেখে পয়মালকে তার স্বামী বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয় কিছু ধন অর্থ আনবার জন্য।

এদিকে নানাভাবে চেয়ারম্যান পয়মালকে চুরি করবার চেষ্টা করছিল। সে পয়সা দিয়ে গুণ্ডা লাগায় পয়মালকে পাওয়ার জন্য। বাপের বাড়ী যাওয়ার পথে পয়মাল নদী পেরোতে কোন নৌকা পায়না। তখন তুখর চেয়ারম্যান পয়মালের ছেলেকে বেঁধে রেখে পয়মালকে নিয়ে পালাল। পয়মাল নিজের ছেলেকে ছেড়ে চলে যাবার সময় হাহাকার করে বললো—

বাছা শোন মোরে কথা
যাছুরে চলিয়া ওমুই যাছুরে চলিয়া।
যাবার কালে ডাকার বাছা
মা মা বলিয়া।
একি ছিল কপালে লিখা
ওমুই যাছুরে চলিয়া।
জন্মের মত ওরে বাছা না হবে দেখা।

এদিকে পয়মালের স্বামী পয়মালের খোঁজে বের হল। পয়মালের খোঁজ করতে গিয়ে হঠাতই তার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছেলে তখন সব বৃত্তান্ত বাবাকে বললো। পয়মালের স্বামী সব শুনে থানায় খবর দিল। ইতিমধ্যে পয়মালকে চেয়ারম্যান বিয়ে করতে চাইলে পয়মাল চেয়াম্যানের সব সম্পত্তি নিজের নামে লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল। চেয়ারম্যান তাই দিল। কিন্তু বিবাহ হলনা। কারণ পয়মালের স্বামী থানায় খবর দেওয়ায় থানা থেকে লোক এসে তুখর চেয়ারম্যানকে ধরে নিয়ে গেল। এইভাবে পয়মাল চেয়ারম্যানের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হল। এখানেই কাহিনী শেষ।

এইভাবে আজ আমাদের সংগ্রহের কাজ শেষ করলাম। বুঝলাম গ্রামীন যে লোককথা তা শহুরে জীবনের পক্ষে প্রয়োজন যাই থাকনা কেন—গ্রামীন জনসাধারণের কাছে তা অপরিহার্য। এবং আরও বুঝলাম এই ভাষার বিকৃত রূপই হল বর্তমান অত্যাধুনিক রূপ। আমাদের গ্রুপে ছিল আমি, সুব্রত নারায়ণ মজুমদার, সুপ্রিয়া নায়েক, রুবি ভট্টাচার্য, লিপি সরকার, ইরা সরকার। এবং যিনি আমাদের সর্বক্ষণ সঙ্গে করে ঘুরিয়েছেন তিনি হলেন আমাদের সবার প্রিয় অজয়দা (অজয়কুমার ঘোষ)। সবার প্রতি থাকল অসংখ্য ধন্যবাদ।

শ্রী সুব্রত নারায়ণ মজুমদার
গ্রুপ লিডার (৩)

কার্য-গবেষণা (লোকসাহিত্য)

বিভাগ : 'ঘ'

(১) নিশীথ মাহাতো (নেতা)।
(২) অখিল বিশ্বাস।
(৩) পারমিতা চৌধুরী।
(৪) মধুমিতা মজুমদার।
(৫) যশোদা ঘোষ।
(৬) সাহেরা তরফদার।

রবিবার ৬. ৫. ৯০ এর শুভ সকালকে সাক্ষী করে, মাননীয় শিক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুগভীর অভিজ্ঞতার ছত্রছায়াকে অবলম্বন করে আমরা ক্ষেত্র-গবেষণার জন্য পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত করণদিঘি (করণদিহি) থানার ভুসামনি গ্রামে উপস্থিত হই ঠিক আটটা তিরিশ মিনিটের সময়। ডালখোলা 'সৎসঙ্গ বিহার' থেকে পায়ে হাঁটা পথে, দুপাশে সোনালী ধানের নরম স্পর্শ অনুভব করতে করতে, শহরে বিষাক্ততা নয়, নরম মাটির সোঁদা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলি গ্রামের দিকে। গ্রামের প্রবেশ দ্বারেই দৃষ্টিগোচর হয় কয়েকটি তেল চকচকে শরীর। পরিচয় করতে উৎসাহ প্রকাশ করতেই এগিয়ে এলেন হাজি ইসাহাক। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। নামোৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর ভেসে এলো আধো বাংলা আধো হিন্দী উচ্চারণে—"কত জমানা আগে এই নামের সৃষ্টি তা আমরা জানি না।" কি সহজ সরল উক্তি—সহজেই হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। এ গ্রামের চারি দিকে ঘিরে রয়েছে—আম-কাঁঠাল ও লিচু শ্রেণী। এখানে দুটি সম্প্রদায়ের লোকের বাস। হিন্দু ও মুসলমান, মুসলমান অর্থে শরীয়তী সম্প্রদায় ভুক্তদেরই বসবাস এখানে। তাদের কথায় এখানের হিন্দুরা 'বাঙ্গালী' বলে পরিচিত। কারণ তাদের বাংলাদেশ থেকে আগমন ঘটে বলে। মুসলমান-প্রধান গ্রাম। মোট মুসলমান পরিবারের সংখ্যা প্রায় একশত। জনসংখ্যা প্রায় ২০০০ জন। গ্রামে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ৬০:৪০। গ্রামের মধ্যে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সম্প্রতি গড়ে ওঠা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে রাত্রে বয়স্কদেরকে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে। অধিকাংশ লোকই চাষ-বাসের উপর নির্ভরশীল। অনেকে আবার ছোটখাটো ব্যবসায় নিযুক্ত। বাকি লোকেরা জিবিকা অর্জনের জন্য—জনমজুরিকে বেছে নিতে বাধ্য হয়।

হাজি ইসাহাক মহাশয়ের মুখ থেকে লোক ঔষধের চাহিদা বিভিন্ন ছোটখাটো রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে শুনে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনি। শরীয়তী মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে সবেবরাত, ঈদ, মহরম উল্লেখযোগ্য। মহরমকে কেন্দ্র করে এক সপ্তাহ ধরে এখানে লাঠি খেলা চলে। উৎসবের সময় পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করে খাওন দাওন হয়। লৌকিক যাত্রা পালা, নাটক প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয় না কারণ এগুলো শরীয়তী প্রথার বিরোধী।

এবার আসা যাক আমাদের মূল প্রসঙ্গে। আমরা যা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি তার একটা লিপি বিশ্লেষণ করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

সূচনার পূর্বে যাদের অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহযোগিতা আমাদের মুগ্ধ, অভিভূত ও সমৃদ্ধ করেছে সেই লোক সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ গ্রামবাসীদের জানাই আমাদের বিভাগের তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

হাজি মহাশয়ের পর দেখা হয় মহম্মদ সফরুদ্দিন মহাশয়ের সঙ্গে। বয়স—৬২ বৎসর, পেশা—ঝাড়ফুঁক করা। গ্রাম—ভুসামনি, পঃ দিনাজপুর। তাঁর কাছ থেকে লোক সংস্কৃতির যে বিশেষ দিকটি কিছুটা আবিষ্কৃত হলো তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি—

দেহবন্ধ—

সাত বহিন শুন মন্তরী
সাত বৈঠা আঙ্গাজুড়ি
মাইকে পুছে এ শুন মন্তরী
কুন বীরকা মন্ত্র হ্যায়
দেবের কাঠ বৈঠে
বইঠা আসল লাল
মোর গুণ তিন লিল্গিক্কা
আপন গুণ সামার
সামার কে বাবা চোদ
আপন গুণ সামার
ওস্তাদ কা বাবা
জীন পীরকা দোহাই
কামরূকা মছপ দোহাই।

বিষ ঝাড়ার মন্ত্র—

দাহিনে হনুমান বান্ধি
বাঁয়ে দামদল
চারকোন পিখিমি
না সহে টান
আঁচল চলে নিচল চলে
আটন বাঁশলী চলে
চল চল হাত চল
বরমহ চল বৃষ্টি চল

যেখানে কালকূট নাগের বিষ থাকে সেখানে চল
বিষ থাকে তো কপট করিস
ধ্যাৎ তোর পূজা বাভড়ে ঠেলিস্
গরু মরে গোবরধন লাগে
বামন মরে সত্যনাশা
আষাঢ় মাসে বালু পঞ্চমী
মাঘের তল দিয়ে যাইস
বিষ থাকে তো সামনে যাইস
বিষ না থাকে তো ডাহিনে বাঁয়ে যাইস
দোহাই আল্লা জী দোহাই বিষ জী।

ভূত ছাড়ার মন্ত্র

বন্দ্ বন্দ্ মহা বন্দ্
চারিদিকে চাব রাম চাঁদ
মইদ থানে ক্ষেত্র চাঁদ
ক্ষেত্র চাঁদকে থুইয়া
নিজের দেহ বন্দ্ করলাম
লোহার শিকল দিয়া
শিবগুরু ওস্তাদের পা
কামরে কামরে রক্ষা মান
হাতজোড়কি দোহাই মা কালী।

কু-বাতাস তাড়ানোর জন্য বন্দ্

ঝুলুক মনির ঝুলুক লাচে
কাহে গৌরীতক কচকচে
আউল ডাকলি কাঠচেরা
সহিতে না পারে সরিষা ঘা
সরিষা করে ফট্ ফট্, পালা দূর্
শিরামের সংকগানে
সরিষা হলো চুরে।

বদ্ধ বাতাসের প্রকোপ থেকে মুক্ত বাড়ীতে সেই বাতাসের যাতে পুনরাগমন না ঘটে তারজন্য বন্দ্

শিকড় শিকড় বাজরে শিকড়
বাজরে বন্দ্ দশ দুয়ার

আট বন্দ, বাঠ বন্দ, মাইয়া ঝিয়া ডাহিন বন্দ,
বাপে পুতে ওঝাই বন্দ,
ওঝাইকে ওঝাই বন্দ,
ছত্রিশ ওঝা বত্রিশ দানো
তার বিদ্যা কার ফের
মোর বিদ্যা লিল পেশকার
ছার খার ভাবে।

হাজি ইসাহক মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা প্রবেশ করি জরিনা খাতুন—স্বামী মহম্মদ নেসুর বাড়ী। তার বাপের বাড়ী বারাম। তার সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, ভাষায় একটা ভাটিয়া টান আছে। প্রতিদিনের কথাবার্তা শুধু নয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন গানেও সেই টান লক্ষণীয়—

জোড়ে কদমে গাছি মারে রে
সোনা কদম ধরে যারে রে—
কোথায় আয়ো খোকা রে মা ভরে রে পানি
সোনা মারে গাসে মাসে গায়ো মালো রে
সোনা মারা গাথে মারে বায়ো মাসে গাঁথো মারে
মালা গলায় দিয়ে মালো গা থাকো নদীর ধারে রে
মা ভরে রে পানি।

উপরিউক্ত বিবাহ উৎসবের গানটি দুল্‌হা অর্থাৎ বর এবং দুল্‌হন অর্থাৎ কনেকে বিবাহের রাত্রে গাওয়া হয়।

ঐ পরিবারেরই আর এক সদস্য আরমানি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার ধাঁধাঁর ডালি নিয়ে হাজির হয়ে আমাদেরকে উপহার দেয় বেশ কয়েকটি লৌকিক ধাঁধাঁ। চোখ মেলে তাকানো যাক্ সেই ধাঁধাঁগুলোর দিকে—

(১) আইলের উপর আইসের আল
যে না বলতে পারবে তার বাপ মরবে কাল।— উঃ মাটির দেওয়াল।

(২) কাঠের গাই
মাটির বাছুর
ওরে চান্দ, দুধ খাবিত বাছুর বান্দ।— উঃ খেজুর গাছ, ভাঁড়, রস।

(৩) ঘাটার কোলে গাছটা
ফল ধরেছে বারোটা
পাকলে হয় একটা।— উঃ বারোমাসে এক বছর।

(৪) আইল কাগা বসন ডালে
কাহুর বাপের সাধ্য নেই যে
উড়াইতে পারে।— উঃ রাত।

(৫) একগাছে সাজন সাজে
একগাছে বাজন বাজে
একগাছে ছ্যাড়া কাঁথা
একগাছে মুদ্দরের যাথা— উঃ শিমূল, পিপুল, কলাগাছ, বেল।

উপরিউক্ত ধাঁধাগুলিতে বৃক্ষ, সময় প্রভৃতি বিষয় গুলো ফুটে উঠেছে।

ক্রমে ওখান থেকেও আমাদেরকে উঠতে হয়। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা বেশ কিছুটা গ্রাম্যপথ অতিক্রম করে প্রবেশ করি ভুসামনির পার্শ্ববতী গ্রাম ভগবানপুরে। গ্রামের প্রবেশ পথেই দেখা হয় আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি শ্রীপরিমল বিশ্বাসের সংগে। পূর্বেই আমরা জ্ঞাত হয়েছিলাম স্থানীয় জনসাধারণ মারফৎ যে উক্ত পরিবারটি লোকসংস্কৃতির চর্চার সংগে দীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় সম্পৃক্ত আছেন। তাঁর পরিবারের অতীত ইতিহাসের সুন্দর পাতাগুলো উল্টে দেখা যাক।

প্রপিতামহ ৺রামসুন্দর ছইয়াল (বিশ্বাস)—এর পেশা ছিল মাটির ঘরের কাজ। অর্থাৎ ঘরামীর কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি তাঁর যুগটাকে কাটিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, ভালো গৃহশিল্পী হওয়ার জন্য তৎকালীন স্থানীয় জমিদার তাঁর পদবি 'ছইয়াল' থেকে 'বিশ্বাসে' পরিবর্তিত করেন।

তাঁর পুত্র ৺হরিমোহন বিশ্বাস আদি নিবাস ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, মহকুমা—বৈদ্যের বাজার, থানা—গাবতলী। পেশা—ঘরামী (ঘর নির্মানের শিল্পী) এছাড়াও তাঁর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের উক্ত সমাজের একজন বিখ্যাত খোল-বাদক। ঐ বংশে সূচিত হলো এক নব অধ্যায়ের। শিল্পের বীজ স্থাপিত হলো উর্বর মৃত্তিকাতে।

৺হরিমোহনের পুত্র শ্রীমান হরচন্দ্র বিশ্বাস। পেশা—হস্তশিল্পী (তাঁতশিল্প) এবং সংগীত শিল্পী। যে শিল্পের বীজ বপন করেছিলেন তাঁর পিতা সেই শিল্প এখানে এসে যেন ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে শুরু করে। অবসর সময়ে পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যকে নিয়ে তিনি মেতে উঠেন গানের বর্ণাধারায়। উত্তর বংগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাওয়াইয়ার সুর মূর্ছনায় মেতে ওঠে প্রত্যেকটা সদস্য। সংক্রামক রোগের মতো সমস্ত পরিবারটাকেই গ্রাস করে এই নেশা। যার ফল-স্বরূপ আজ আমরা পেয়েছি শ্রীমান পরিমল বিশ্বাস মহাশয়কে। পরিমলবাবু একজন প্রকৃত সংগীত প্রেমী, নিরহঙ্কারী শিল্পী, যার কাছে ভাওয়াইয়া শুধু আনন্দ দানের মাধ্যম নয়, মানসিক খাবারও বটে। সংগীতচর্চা ছাড়াও

তিনি পাম্পসেট, ইলেকট্রিক মেসিন, পাওয়ার টিলার, ট্রাকটর প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। শুধু কি তাই? তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো দুটো অধ্যায়—কৃষিকাজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ তিনি করে থাকেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়,—একটা ব্যক্তিত্ব কিভাবে নিজেকে এত ভাগে বিভাজিত করেন। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাঁর যে শুধু আগ্রহই আছে তা নয়—প্রত্যেকটা ব্যাপারে তিনি রীতিমত সিদ্ধহস্ত।

উঁকি মেরে দেখি তাঁর শিল্প-সত্তাটির দিকে। হয়তো অনাবিষ্কৃত কিছু থেকে যাবেই—তবুও চেষ্টা করতে অসুবিধা কোথায়? যা আবিষ্কৃত হলো—সেটাই বা কম কিসে? দেখুন না ঐ পরিমল বাবুই বাজাতে জানেন হারমোনিয়াম, দোতারা, গীটার, খমক, খোল, একতারা, তবলা, বাঁশের বাঁশি, করতাল। একটা গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে ৩০ বৎসর টিকিয়ে রেখে এই প্রতিভার উন্মেষ ঘটালেন কিভাবে তা অভাবনীয়। বেশ কয়েকটি ভাওয়াইয়া গান উপহার দিলেন আমাদেরকে, যা তিনি লাভ করেছেন বাবা এবং দাদার কাছ থেকে। বেশ কিছুক্ষণ সম্বিতহীন অবস্থায় গিলে চলে ছিলাম তাঁর গানের কথাগুলো। হারিয়ে গেছলাম জরাজীর্ণ বাস্তব থেকে অন্য জগতে বেশ কিছুক্ষণের জন্য। মর্মস্পর্শী কয়েকটা গানের নমুনা নেওয়া যাক্।

কোচবিহারী ভাওয়াইয়া

মোর বন্ধুডার নাগাল পাইলে
    ঝাঁপ দিমু দরিয়ার জলে
    না করি মুই কোলার ছোওয়ার আশা।
কোলার ছোওয়া কোলাত মারিম
    ঘর খসুরা তেজি করিম
    যাইয়া করিম তেঁতুল তলায় বাসা।
ওরে ও……ও …কোলার ছোওয়া …..
    বন্ধুর বাড়ী যাত্রা গান
    শুনিবারে চাইছে প্রাণ:
    পানিয়া মোরা না শুনে মোর কহ্‌থা।
রাইতে দিনে মারিস তুই
    ছাড়িয়া ঢানা ধরিম মুই
    গোরা দেহা মারিয়া করলি কালা।
ওরে ও……ও……ও……বন্ধুরে …
    মোর বন্ধু আসিবার কথা
        সকালে ঘসিনু মাথা

লাল শাড়িখান উলটাইয়া পবিনু
সকালে সকালের কথা
বৈকালে ঘাসনু মাথা
হালুয়া খোঁপা উলটাইয়া বাঁধিনু।
ওরে……ও… · ও ……

ভাওয়াইয়া—উত্তরবঙ্গ

ওবে,
রুপার লাঙ্গল সোনার ফাল্
বাঘে মহিষে জুরিতেন হাল
ওরে কি দোষে না ছাড়িয়া গেলেন
ও ……ও……ওরে… · ।
কই গেলেন মোর মাহুত বন্ধুবে।
ভাত ওরে নান্ধিনু
ভাত ওরে বারিনু
খাওয়াইয়া নাই মোর ঘহুরে রে
ও মোর ঘহুরে রে—
ওরে কই গেলেন মোর মাহুত বন্ধু রে।
বিছানা করিনু
মশারীরে টাঙানু
শুয়োইয়া নাই মোর ঘহুরে
ও মোর ঘহ্রে বে।
কই গেলেন মোর মাহুত বন্ধু রে।

ভাওয়াইয়ার এক ভ্রাতা ভাটিয়ালীকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক্—

(১) লোকে মন্দ বলে বে
ঐ না কদম তলায় রে
রূপে পাগল হৈলাম রে
জলের ঘাটে গিয়া
ও সখি রে—।
কালার কাজল আঁখি
যার প্রাণে যা চাইয়ারে সখি
শুধু খাঁচা পড়ে রইলো
পাখি উড়ে যায়,
ও সখি বে—।

সাত গাঙের মোহার মাঝে
 কাল কুম্ভীরের বাসা
কত কুম্ভীর-বেশে ফিরে
 খায়না পাপী বলে রে,
 ও সখি রে—।

তোমরা যবে যাওগো সখি
 ভরা কলসী লইয়া
জিজ্ঞাসিলে কইয়ো খবর
 কুম্ভীরে যায় নিয়া ॥

(২) কোন্ বনে বসে কালা
 বাঁশরী বাজায়
কাঁখের কলসী আমার
 সেও ভেসে যায়।

ছাড়ো বন্ধু ছাড়ো
 বেলা বয়ে গেল
কাঁখের কলসী আমার
 সেও ভেসে গেল,
শাশুড়ী ননদী ঘরে
 কি দিয়ে বোঝায় ॥

আমি যখন রাঁধতে গো বসি
 কালা বাজায় বাঁশি
বাঁশির সুরে আমার
 মন হয় গো উদাসী।
বাঁশীর সুরে আমার
 মন যে আগায় ॥

এই মাত্র যে গানটির স্মৃতিচারণা করা গেল তার সংগে একটি বহুল প্রচলিত হিন্দী গানের সুরগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত হই। লক্ষণীয় যে লোক সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট শাখার (সুরগত মাধুর্যের দিক) প্রবহমানতা উচ্চ সাহিত্যের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং কোথাও বা মিলেমিশে এককার হয়ে গিয়ে তার মূলকেও বুঝি বা হারিয়েছে।

যদিও পশ্চিম দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী গান বাউল গান নয় তবুও এর আবেদন সর্বজন স্বীকৃত। যে গানের সুর আমাদেরকে নিয়ে যায় আর্থিক জগৎ থেকে এক

পারমার্থিক জগতে। আধ্যাত্মিকতার একটা সূক্ষ্ম বেড়াজাল রচনা করে আমাদের চারদিকে। বাউলে পাগল হতে এগিয়ে চলি—

ওরে ও,……ওরে ও,……
ভগবান পাবো বলে
পুতুল কিনে ঘর ভরেছি
আমি কি ভুল করেছি
হায় কি ভুল করেছি।
ফোঁটা তিলক তাও কেটেছি
কুণ্ঠি মালার পাশ এঁকেছি
ভগবান পাবো বলে
গেরুয়া তাও পরেছি।
চার আনাতে শিব কিনেছি
আট আনাতে দুর্গাকালী—দুর্গাকালী
বারো আনায় কিনে নিলাম
বৃন্দাবনের বনমালী, বনমালী।
শুনে নাও তার পরে
যখন গেলাম দেওঘরে
খুঁজে খুঁজে ভগবানের
চরণ দুটি ঠিক পেয়েছি, ঠিক পেয়েছি।

এই গানটির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সংশয় জন্মে। গানেব সুর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তোমাদের ভাবের জগতে। যেখান থেকে ফিরে আসতে মন চাইছিলো না। কিন্তু ফিরে আসতেই হবে বাস্তবের মাটিতে। এবার আর গানে গানে মন-মুগ্ধকর পরিবেশ রচনা নয়— অনুসন্ধান চালানো থাক্ লৌকিক নারীর অব্যক্ত জগতের ভেতর। যে জগৎটা নিতান্তই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি থাকতে বাধ্য হয়। বলতে চাইছি, লৌকিক নারীদের ব্রত উদ্‌যাপনের কথা।

ক্ষেত্র-ব্রত (অধিক ফসলের কামনায় যে ব্রত)

ব্রত উদ্‌যাপনের উপকরণ—(১) চালের ছাতু, (২) বিচি কলা, (৩) মুড়ির মোয়া, (৪) আখের গুড়, (৫) তেল, (৬) সিন্দুর, (৭) মালা, (৮) ধান-দূর্বা, (৯) বাদাম।

ব্রত উদ্‌যাপনের পদ্ধতি ঃ

একটি শ্যাওড়ার ডাল বাড়ির উঠানে পুঁতে তাকেই ঈশ্বর জ্ঞানে গৃহস্থ বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এই ব্রত পালন করে থাকে। ব্রত উপলক্ষ্যে একটি ব্রত কথাও প্রচলিত আছে। ব্রত কথাটি নিম্নরূপ ঃ

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র, ভিক্ষাবৃত্তি যার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র মাধ্যম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে চরম দুঃখ কষ্টের থেকে তাকে ত্রাণ করবার জন্য। ঈশ্বরের দয়ায় একদিন তার বন্ধ্যা জমিতে সোনার ফসল ভরে ওঠে।

ব্রতচারিণীদের প্রার্থনা তাদেরও যেন সেই ব্রাহ্মণ পুত্রের মতো ফসলের প্রাচুর্য ঘটে।

ব্রতউদ্‌যাপনের সময়ঃ অগ্রাণ মাসের ফসল কাটার পূর্বে মঙ্গলবার অথবা শনিবারে এই ব্রত উদযাপিত হয়। ব্রতশেষে রাখাল বালকদের ভুজ্জি দেওয়া হয়।

দ্বি-প্রহরের সূর্য যখন তার মধ্য গগনে অবস্থিতির কথা জানান দিচ্ছে—সময় কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই প্রাপ্তি যোগ ঘটে আর এক মূল্যবান জিনিসের। যা একান্তই লোকায়ত।

লোক চিকিৎসা

ভুসাবনির মহম্মদ ইস্‌মাইল হকের কাছ থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয় মাননীয় শ্রীযুক্ত সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লোক-চিকিৎসা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী সংগ্রহে সাহায্য করাতে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

(১) গরুর পাতলা পায়খানা হলে বাঁশপাতা খাইয়ে দিলে গরু সুস্থ হয়ে ওঠে।

(২) খোকসার পাতা ঘি দিয়ে সেঁকে গরুকে খাওয়ালে গরুর খুকি (কাশি) ভালো হয়ে যায়।

(৩) গরুর টোঁটা (গলা) ফুলে গেলে, সেখানে চুনের দাগ দিয়ে দিলে ভাল হয়ে যায়।

(৪) বাগলাল গাছের ছাল বেঁটে দবদের জায়গায় লাগিয়ে দিলে সেরে যায়।

(৫) গাভীন গরুর অরুচি দূর করার জন্য চুলার (উনুনের) মাটি গুঁড়ো করে গরুর মুখে দেওয়া হয়।

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদ যতই বাড়তে লাগলো—সংগ্রহের উৎসাহ ক্রমে কমে আসে। তাই ধীরে ধীরে আমরা ফিরে আসি আমাদের গন্তব্য স্থল—আশ্রয় স্থল আমাদের তাঁবু ডালখোলা সৎসঙ্গ বিহারে, গ্রামের ছেলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তোমাদের চলে আসার পথের দিকে তাকিয়ে তাদের অকৃত্রিম আন্তরিকতার শেষ রশ্মিটুকুতে যেন আমাদের হৃদয় সঞ্চারিত করে ছিল। অশ্রু—ভারাতুর চোখে, ছোটে খেতে খেতে আলস্য ও খর রৌদ্রকে সাথী করে পথ চলা শুরু করি।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় অমিতাভ ঘোষ, কল্যাণীয় অমল দাস ও বন্ধু-সদৃশ জগদীশ সিংহ-কে তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

॥ পাঁচ ॥

দ্বিতীয় দিবসের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের বিবরণ

বিষয় ঃ ক্ষেত্রকার্য

আজ ছিল আমাদের ক্ষেত্রানুসন্ধানের দ্বিতীয় দিবস। প্রথম দিবসের শারীরিক কসরতের ঝাঁকুনিতে রাত্রির অবস মুহূর্তগুলোতে অবিরাম কাজ করে চলেছিল শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—তথা হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তারগুলো। সঙ্গত কারণেই মন ছিল ক্লান্ত। তার উপর ভোর আকাশে বৃষ্টির ঝাপটা-এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ভাবছিলাম আজ বোধ হয় সমস্ত দিবস বিশ্রাম। কিন্তু না-তা বোধ হয় হলনা। আমাদের চালক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদ্বয় এবং পরিচালন সমিতির নির্দেশ অনুসারে ক্ষেত্রকার্য মানে কোন বাধা নয়। কাজ আর কাজ। তাই বেরুতে হল।

আমরা আমাদের গ্রুপ 'সি' যার সদস্য সংখ্যা পাঁচ এবং সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎসঙ্গে আমাদের সর্বক্ষণের ক্ষেত্রকার্যের সাথী অজয়দাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গতকাল যেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এসেছিলাম সেই দো-মোহনা গ্রাম এবং তার পার্শ্ববর্তী চৌন-গড়া, মন্দারগাছী গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রাণের কাছে। দেখা যাক উদ্দেশ্য আমাদের কতখানি সফল হয়।

প্রথমে আমরা আমাদের আবাসস্থল সৎসঙ্গ শিবির থেকে বাসে উঠে দো-মোহনা গ্রামের ছোট্ট বাজারে পৌছাই। বাজারের একটি জীর্ণ কাপড় কাটার মাষ্টার মুরলীমোহন সিন্‌হার কাছ থেকে একটা বিরাট অভিজ্ঞতা নিলাম। এখানে একটা শিল্প গড়ে উঠেছে যার নাম ধোকড়া শিল্প। এ শিল্প সংস্থার প্রধান শিক্ষকই হলেন এই মুরলীমোহন বাবু। এখানে এই শিল্প সংস্থার প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্য তৈরী হয়ে থাকে। এবং এটাই এই অঞ্চলের জনপ্রিয় শিল্প সংস্থা।

এরপর এই ঘরে বসেই একটু অন্য দিকে মন দিলাম। দেখলাম পাশেই বসে আছেন গতকালের পরিচিত ক্ষেত্রমোহন সিন্‌হা। যার কাছ থেকে গতকাল আমরা লোকনাট্য 'কারেন সরি' সংগ্রহ করেছিলাম। তাই ভাবলাম আজ আবার একটু বাজিয়ে দেখি কিছু পাই কিনা। ধারণা সত্যি হল। ক্ষেত্রমোহনবাবু আজও আমাদের কাছে যথেষ্ট সময় দিলেন এবং আজও আমরা একটা নূতন পালা পেলাম। যার নাম 'ইলম শরি'। এই শরি কথাটা এসেছে সায়েরী (উর্দু) শব্দ থেকে। এখানে শরি কথার অর্থ হল কাউকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া পালা গান। পালা গানের অর্থ হল কোন গ্রাম বা গ্রাম এলাকায় কোন বিশেষ ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই সব গ্রাম বা গ্রাম এলাকার গ্রামীন বুদ্ধিজীবি মানুষেরা নানা রকম নাট্যকাহিনী বা পালা গান রচনা করেন এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে তা বাঁচিয়ে রাখেন।

এবার দেখা যাক ইলম সরির প্রথম গানের কথা। এটি ইলম তার মাকে স্কুলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছে।—

কি করেছিস প্রাণের আয়া (মা)
ঘরে বসিয়া মোহে নাদে যাছু গে আয়া
কইনা জুরি বা।
খাওয়া দাওয়া হল গে সারা শুন মোর কথা।
মোহে নাদে যাছু গে আয়া কইনা জুরি বা।

ইলম্ গ্রামের চেয়ারম্যানের মেয়ে। ধনীর সুন্দরী মেয়ে স্কুলে পড়ে। গিরিলা নামক একটি ছেলেকে সে ভালোবাসে। তাদের এই প্রেম অতি গোপন। অন্য দিকে ইলমের মামাতো দাদা জুলুম বাউদিয়া ধনী লোক। সে ইলমকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু ইলম জুলুমকে পছন্দ করে না। ইলমের মা বাবাও এতে বিরক্ত। কারণ হিন্দু সমাজে ভাই-বোন সম্পর্কে বিবাহ বৈধ নয়। কিন্তু জুলুম নাছোড়বান্দা। সে ইলমের উপর যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে। ঈশ্বরের শুভ আশীর্বাদ ছিল ইলমের উপর। সেজন্য সমস্ত যাদু ব্যর্থ হয়ে গেল। এরপর ইলম্ "বাঘাপান" নামক যাদু ছাড়লো যা জুলুমকে অদৃশ্যভাবে লাঠিপেটা করতে লাগল। মারের চোটে প্রায় অর্ধমৃত হয়ে জুলুম ইলমের পা ধরে তাকে তার যাদু ফিরিয়ে নিয়ে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাতর মিনতি করতে লাগল। এবং ইলমকে আর বিরক্ত করবে না কথা দিল। ইলম যাদু ফিরিয়ে নিল। ইলম জুলুমের জুলুম থেকে পরিত্রাণ পেল এবং গিরিলার সঙ্গে তার প্রেম ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে এগিয়ে চললো।

একদিন গিরিলা ইলমকে বললো—
ইস্কুল পড়িবা চলগে যায় ইস্কুল পড়িবা চল।
বেশী দেরী হলে বেযায় মারিবে মাষ্টারে।
একেত বাঙ্গালের কানুন, কানুন হয়েছে জারী।
বেলা এগারটায় বসে ইস্কুল চারটায় দেয় ছুটি।
আধ স্বর্গেরই তারা বত্রিশটা দাঁত লড়েছে যে যায় আনারের দানা।
তোর বেটি দেখিয়া মনটা হরিণ কুঁদেছে।
বিম বাতাসে কদমিব ফুলট আপুনে হিলেছে।

এরপর ইলম এবং গিরিলা বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল বিয়ে করে ঘর সংসার করার জন্য। কারণ তাদের বিবাহ তাদের পরিবার বিশেষ ইলমের মা বাবা মেনে নিতে পারতেন না। এরপর তারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তারা ডাকাত দলের হাতে পড়ে। ডাকাতরা তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে সুন্দরী ইলমকেও হরণ করে নিয়ে যেতে চায়। এই সময় জঙ্গলের মধ্যে জংলী সর্দার ইলমের আর্ত চিৎকার শুনতে পায় এবং এসে তাদের

রক্ষা করে। এরপর তাদের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে সর্দার তাদের জেলে দেয়। জেল থেকে উভয়ের মা বাবা এসে তাদের নিয়ে যান এবং ইলমের বাবা অল্পকালের মধ্যেই লেবরু নামক একটি ছেলের সঙ্গে ইলমের বিয়ে দেন। এরপর তারা পরিস্থিতির চাপে পরে সব কিছু মানিয়ে নেয় এবং সুখে ঘরকন্না করতে থাকে।

এখানেই অন্য একজন যুবকের কাছ থেকে এরকম আর একটি পালাগান পাওয়া যায়। এই পালাগানটির নাম "কারেণ্টসরি"। এই পালাগানের একটি অংশে—

কারেন্টের তার সে দাদা
দেখেছেন গে দাদা শুনেকে
কারেন্ট দিয়া দাদা সব মেশিন চলে।
কারেন্টের মধ্যে আকর্ষন আছে,
তার ভিতরে লাইন চলে,
সেই কারেন্টের তার সে দাদা
সব মেশিন চলে।
কারেন্ট আছে জলঢাকাতে
সে কারেন্টের তার সে দাদা
সব মেশিন চলে।

এই গানের মধ্যে জলঢাকা কথাটি পাচ্ছি। অর্থাৎ এই গানটি যে উত্তর বঙ্গে রচিত তার প্রমান পাচ্ছি। এবং এই গানের মধ্যে গ্রামের মানুষের বিজ্ঞানের আশ্চর্য সৃষ্টি কারেন্টের দ্বারা চালিত মেশিনের প্রতি তীব্র মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে।

এরপর আমরা যাই চৌনগড়া গ্রামের দল্লু প্রসাদ সিন্‌হার বাড়ীতে। এখানে আমরা রজনীকান্ত সিন্‌হা (জেলার অফিসার, বয়স ৬৮) নামক এক গ্রামীন সংস্কৃতিবান মানুষের দেখা পাই। এর কাছ থেকে আমরা ক্ষেত পূজা ও ক্ষেত সংক্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছি।

ক্ষেত পূজা ও ক্ষেত সংক্রান্ত বিশ্বাস ঃ

১। প্রথম বীজ বপন করবার সময় এখানকার অধিবাসীরা ক্ষেতের উত্তরপশ্চিম কোনে দুধ, কলা, আতপ চাল, ইত্যাদি দিয়ে ক্ষেত পূজা করে। ক্ষেতের ওই উত্তর পশ্চিম কোণকে বলে লক্ষ্মী কোণ। এই পূজার পরই বীজ বোনার কাজ শুরু হয়।

২। প্রথম বীজ বোনার দিন ক্ষেতের মালিক, ক্ষেতমজুর এবং ক্ষেতের মালিকের বাড়ীর লোকেরা কেউ কোন টক জাতীয় জিনিষ খাবেনা।

৩। বীজ বপনের শেষের দিনকে বলে হাত ঝাড়ার দিন। বাড়ীর মালিক বা তার নিজের আত্মীয় বীজ বপনের শেষ কাজটি করে থাকে এবং ধুপ দীপ জ্বালিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলে। এর অর্থ হল ওই হাত দিয়ে আর কোন রোপনের কাজ হবে না।

৪। ধানকাটার প্রথম দিনের শুরুতেই ক্ষেতের লক্ষ্মী কোণাতে আতপ চাল কলা ইত্যাদি ক্ষেত লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়। পূজো দেয় ক্ষেতের নিজের লোক। দুচারটা ধানের গাছ কেটে নিয়ে এসে বাড়ীতে ঝুলিয়ে রাখে।

৫। ইসলামপুর, চোপড়া, গোয়াল পুকুর ইত্যাদি জায়গাতে প্রতিমা পূজা হয় না। মানত করলে প্রতিমা পূজা হয়। অন্যথায় ঘটপূজা হয়ে থাকে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ি ইত্যাদিতে প্রতিমা পূজা আছে।

ইসলামপুর অঞ্চলের এই রাজবংশীরা কাশীমত সম্প্রদায়ের লোক। কাশীমত অনুযায়ী প্রতিমা পূজা ছিল না। বৈষ্ণব প্রভাবে এখন কিছু কিছু জায়গায় প্রতিমা পূজার প্রচলন হয়েছে।

কাশীমত—মিতাক্ষরা, নদীয়ামত—দায়ভাগ। এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে লৌকিক চিকিৎসার একটি বিষয় ও মানুষের জন্মের সময়ে যেসব নিয়ম পালন করা হয় সেগুলোও জানতে পারি। যেমন—

১। হাঁপানি রোগ সারানোর ঔষধ (যে হাঁপানি রোগটি বর্ষাকাল থেকে শুরু করে শীতকাল পর্যন্ত থাকত ও গ্রীষ্মকালে থাকত না)—

ঔষধ—গুহি সাপ (গোসাপ) এর কলিজাকে অর্ধেক সেদ্ধ করে ও অর্ধেক কাঁচা রেখে দুটো জিনিষ মিশিয়ে তিনবার খাওয়ালে হাঁপানি সেরে যায় এটা এদের বিশ্বাস।

জন্মের সময়ের রীতিনীতি—ষষ্টিপূজা (ষষ্ঠীপূজা) এখানে নেই। সন্তান প্রসবের পর তিন চার দিন পর প্রসূতি আতুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এবং নাপিত বাচ্চাটার চুল নখ কেটে দিলে সব শুদ্ধ হয়ে যায় বলে এরা মনে করে। এছাড়া এ ব্যাপারে আর কোন অনুষ্ঠান নেই।

বিষহরি পূজার বরণডালা (এই অঞ্চলে যা প্রচলিত)—

বরণডালাতে বা কুলাতে থাকে হৈমন্তিক ধান, পান সুপারী, এক ছড়া কলা, আয়না, চিরুনি, মাটির প্রদীপ, পাথর, এবং এদের প্রত্যেকের উপরেই থাকবে পাঁচটি সিঁদুরের কৌটা। গোবরের চাকতি, কিম্বা অর্থাৎ সিঁদুরের কৌটা, নতুন সাদা কাপড়, ধুমনা, হরিতকী, কাঠ, তিল, মধু, গঙ্গাজল। এই সমস্ত উপকরণগুলোকে একত্র করে কুলার মধ্যে সাজানো হয়। এটাকেই এই সম্প্রদায় ডালি বলে থাকে। আমরা যে বিষহরি পূজার কথা বললাম তা মূলতঃ একটি চূড়াকরণ। ছোট বয়সে বাচ্চারা অসুস্থ হলে কর্তাব্যক্তিরা মানত করে থাকেন দেবদেবীর কাছে। যা হল চূড়াকরণ।

বিষহরি পালার গান

সন্ধ্যা থেকে সারা রাত জুড়ে ১০/১১ জন লোক মিলে আসর সাজিয়ে হাতে চামর, মাথায় টুপি, ধুতি পোষাক পরিধান করে এই গান গায়েনরা গেয়ে থাকে। ছোকরা

সাজানো হয়। গায়েনরা যেখানে বিছানা করে শুয়ে থাকে সেখান থেকে তারা যতদিন না গান শেষ করবে ততদিন তাদের বিছানা তোলা হবে না। এবং সব সময়ের জন্য যে কোন একজন বিছানায় থাকতে হবে। এটাই এই অঞ্চলের সংস্কার।

গান আকাশে পড়িছে জল কুসুম চন্দন
গোড়ীর জননীর কথা শুনুন সর্বজন।
সুগন্ধী শীতল জাত সুসজ্জিত বাও
পশু পক্ষী মৃগেরা আনন্দিত গায়।
তপ করে হেমন্ত ঋষি সাগরের ও কূলে বসি
সাগরেব এক কূলে গো মজি সজা ভাসে।
মজুস ধরিল ঋষি আনন্দিত মন
খসায় দেখিল কন্যা অতি বীর্বক্ষণ।

এই গানগুলো আমরা আলোচনা করে দেখেছি এখানে লখীন্দরের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু পর্যন্ত সবই আছে। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের মত।

মধুসূদন গোস্বামী—আলিয়া নগর

এই বিষহরি পূজা প্রসঙ্গে দন্নুকুমার সিং বললেন যে ভাড়ার ঘরের পুজোর জিনিষ পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ হাত দিতে পারবে না এবং ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে।

বিভাগ—'ক'

১। সুদেষ্ণা রায়।
২। সুলেখা ঘোষ।
৩। ভারতী সাহা।
৪। সুরজিৎ বোস।
৫। শুভাশিষ ভুক্তা।

আজ ৭ই মে সোমবার। আমাদের দ্বিতীয় দিনের ক্ষেত্রকার্যের শিবির আমরা করেছিলাম মোহনপুর গ্রামে। গ্রামটি করণদিঘি থানার অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমরা সতীনাথ সিং এবং ঝরু সিং-এর বাড়ীতে গিয়ে কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। ঝরু সিং এবং রাজান সিং আমাদের জানালেন তাদের কিছু গানের কথা। যার মধ্যে আছে মালা-মাধব। এটি প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ের উপর রচিত। কালীপূজার উপলক্ষ্যে এই গান গীত হয়। আর একটি গান বোলোসোরী। এটিও কালীপূজা উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়, এছাড়া চাষ করার সময় তারা যে গান গায় তাকে বলে লগ্নী, এটি খুব রোদের মাঠে গাওয়া হয়। রাতে গাওয়া হয় না। কিছু প্রবাদও আমরা পেয়েছি রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধুমনি নামের এক বৃদ্ধার কাছ থেকে। তার বয়স আনুমানিক ৭৮। তার কাছ থেকে কিছু ধাঁধাও পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়াও সাপ ধরা ও বিষ ঝাড়ার মন্ত্রও আমরা পেয়েছি। রাজবংশীদের বিবাহের বিধি ও অলংকার ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। বিয়েতে কনে পাড় ছাড়া সাদা কাপড় পরে কিন্তু সিঁদুর দানের তারা রঙীন শাড়ী পরে। এছাড়া বিবাহ আসর ও গৃহস্থালীর জিনিষপত্র সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। বাহেদের স্বহস্তে অঙ্কিত কিছু অঙ্কনও পেয়েছি।

সৎসঙ্গের অমিতাভ ঘোষের একান্ত সহযোগিতায় আমাদের এই সংগ্রহ সফল হতে পেরেছে। জগদীশ সিংহের সহযোগিতাও আমাদের কাজে প্রভূত উপকার করেছে।

ক্ষেত্র গবেষণা

বিভাগ—খ

দলের কর্মীদের নাম যথাক্রমে—

১। সুপর্ণা দে।
২। প্রণব সরকার।
৩। মীনাক্ষী দত্ত।
৪। মীনা পাণ্ডে।
৫। সুপর্ণা ঘোষ।

তারিখ ৭ই মে ১৯৯০

আজ ৭ই মে সোমবার। লোকসংস্কৃতি ক্ষেত্র-গবেষণা। কার্যের দ্বিতীয় দিবস। সকাল ৯টার শিবশক্তি প্যাসেঞ্জার বাসে চড়ে ডালখোলা শিবির থেকে ৪৫ মিঃ সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেলাম অম্বরাগড় বাসস্টপে। সেখান থেকে দু কিঃ মিঃ পথ পায়ে হেঁটে ঝিটকিয়া গ্রাম। সেই গ্রামের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লোক-সংস্কৃতির নানা উপাদান। এখান থেকেই সংগ্রহ করেছি বহু বিচিত্র বর্ণের উপাদান। এই গ্রামেরই আশি বছর বয়স্কা শ্রীমতী বারুই গভীর আন্তরিকতার সহিত গেয়ে শোনালেন অন্নপ্রাশনের গান। ঐ বাড়ী থেকেই আমরা লেবু কীর্তনীয়ার মুখে শুনলাম কার্ত্তীক পুজোর অভিনব বিবরণ। এই গ্রামেরই আরেক বিধবা কুন্তিসোনা মণ্ডল, তিনি শোনালেন শান্তিমায়ের ব্রতকথা হরি ঠাকুরের গান। এই গ্রামেরই বিমলা বিশ্বাস, গীতা মণ্ডল যুগ্মভাবে গাইলেন এওনড়া পুজোর গান যার মূল বিষয় কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার খেদ। ২৫ বছরের যুবক মণ্টুকুমার শীল সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র শোনালেন এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জানালেন। এখান থেকেই পেলাম সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গান অষ্ট গান ও নৌকা বিলাসের গান, চাকুলিয়া ব্লকেরই সৈয়দপুর বামুনটুসি গ্রামেই পেলাম মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎসবের নানান তথ্য ও গান। সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের এই গানের মধ্যেই আছে মহম্মদ মুসতফা সলাউল্লাহা সলিমের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান, কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান, মহম্মদ মস্তাফার স্মৃতিকে স্মরণ করে

উৎসব। চাকুলিয়া ব্লকের পোদমধারা গ্রামে পাওয়া গেল মাজার গান। কোন মহৎ মানুষের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে ঐ পীরের স্থানে এই কাওয়ালী জাতীয় গান পরিবেশিত হয়। নিয়ামতপুর গ্রামে পাওয়া গেল রাধা বিরহের গান, দেহতত্ত্ব ও মন শিক্ষাবিষয়ক গান। খোকসা গ্রামেই পেলাম সুর্যপুরী ভাষার সন্ধান যা নানান বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে একটা নতুনতম সংযোজন। মুসলমান অধ্যুষিত এই গ্রামকে লোক-সাহিত্যের স্বর্ণখনি বলা যেতে পারে। গ্রামের মানুষই জানে না যে তারা লোকসাহিত্যের কি অমূল্য সম্পদ ধারণ করে আছে। প্রত্যেকটি বাড়ীতে মাটির তৈরী কারুকার্য মণ্ডিত আসবাব, হাঁসের খোয়াড় থেকে শুরু করে রান্নাঘর, ঢেঁকিশাল, দালানবাড়ী সর্বত্রই বিভিন্ন প্রাচীনতম মসজিদের অনুকরণে ভাস্কর্যের আদল ফুটে উঠেছে। মন্দির, মসজিদের নানান কারুকার্য, নানান বর্ণে রঞ্জিত। বাইরে থেকে প্রতি বাড়ীকেই মনে হয় ইটের তৈরী।

এখান থেকে ৫ কি,মি, পথ পায়ে হেটে চড়া রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে অনুরাগড় বাসস্টপে পৌছতে প্রায় ১টা বেজে গেল। এরপর দু ঘন্টা দেরীতে যাত্রীবোঝাই একটি বাসে চেপে অতি কষ্টে ডালখোলা শিবিরে পৌছাতে প্রায় সাড়ে তিনটে। তখন আমাদের মনে পড়ছিল লোকসাহিত্যের সোনার মণি খোকচনা নামের সেই গ্রামটি।

খ—বিভাগ

কর্মশালার বিবরণী

দলের কর্মীদের নাম যথাক্রমে : (১) সুপর্ণা দে, (২) প্রণব সরকার, (৩) মীণাক্ষী দত্ত, (৪) মীনা পাণ্ডে, (৫) সুপর্ণা ঘোষ।

পথ নির্দেশক : রঞ্জন মুখার্জী, প্রতিকুল সরকার।

সংগৃহীত তথ্যাবলী

(১) অন্নপ্রাশনের গান : গায়কার নাম—শ্রীমতী বারুই, গ্রাম—ঝিটকিয়া, বয়স—৮০ বছর।

অন্নপ্রাশনের দিন শিশুকে হলুদ জল দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর শিশুটির মাথার উপর আত্মীয় স্বজনেরা ছাতা ঘোরায়। এই সময় গাওয়া হয় অন্নপ্রাশনের গান। উক্ত শিশুটিকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং যশোদা যেভাবে কৃষ্ণকে সাজাতেন এই গানের মধ্য দিয়ে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন এই গানটিতে—

বানিয়া খন চন্দনেরে কৃষ্ণ সাজাব ঘুরে ঘুরে
বিনা জলে চন্দন ঘষে কৃষ্ণেরে সাজাব মনের মতন।
বিনা দীপে কাজল পেতে কৃষ্ণেরে সাজাব মনের মতন
টেকিয়ার মালা এনে সাজাব কৃষ্ণেরে।

বানিয়ার ঝোরো (তাগা) এনে সাজাব কৃষ্ণেরে।
তাঁতিয়ার কাপড় এনে সাজাব কৃষ্ণেরে।
বিনা সোনায় চূড়া পড়ে দিব কৃষ্ণের মাথে
বিনা রুপোয় বাঁশি গড়ে দিব কৃষ্ণের হাতে।

এই গান গাওয়ার পরে শিশুটিকে বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পরে বেল কিম্বা তুলসী কাঠের মালা পরানো হয়, চন্দন দিয়ে সাজান হয়। এই সময়ে ঘরে যদি কেউ আয়না দিতে চায়-তবে তাকে বাজনা সহযোগে আয়না দিতে হয়। এবং এর পরে গাওয়া হয় প্রায় একই ধরণের গান যে গানে যশোদার মুখ দিয়ে কৃষ্ণকে সাজাবার কথা বলা হয়।

রাণী চন্দন লয়ে থালেতে দাঁড়ালেন রাজপথেতে
আমার গুণের গোপাল জাগায় কে।
বিনা জলে চন্দন ঘষে দিব হরির কপালে
বিনা দীপে কাজল পেতে সাজাব হরিকে।
ও তরে সাজিল মাগো ও নিশি রাতের কালে।
হেনকালে শ্যামের বাঁশি ও বাতাসে বাজিল রে।
বিনা জলে চন্দন ঘষে সাজাব রামেরে
বিনা তেলে কাজল পেড়ে ও দিব রামের মায়েরে।
চটকিয়ার মালা এনে সাজাব রামেরে।
বানিয়ার ঝোরো এনে সাজাব যতনে।

শ্রীমতী বারুই শুনালেন বিশকরম পূজার বিবরণ। ভাদ্রমাসে তিল, কলাই, ছোলা, ছাতু, আলোচাল, কলা প্রভৃতি যোগে বিশকরম পূজো হয়, আসলে বিশ্বকর্মাকেই এখানে বিশকরম বলা হয়েছে। এ পূজোর কোন মূর্ত্তী গড়া হয় না।

কার্ত্তিক পূজো :— ধান ও চালের ছাতু, চিনি দিয়ে প্রস্তত খেলনা হাতি, ঘোড়া এবং মিষ্টি নাড়ু দিয়ে নাচোলা পৈলা (হাড়ি) পূজোর ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এবং পূজোর স্থানে কমপক্ষে ৩০টি শ্রীঘট স্থাপন করা হয়। যাতে এই ঘটে একটি করে জলপাই দেওয়া হয়। এবং তারপর ঠাকুরের উদ্দেশ্যে সবকিছু নিবেদন করা হয়। এবং পূজো সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর ছোট ছেলের এই নাচোল। পৈলা ও শ্রীঘটগুলির খাদ্য খেয়ে থাকে।

শান্তি মায়ের ব্রতকথা : উৎস :— কুন্তিসোনা মণ্ডল (৩২), গ্রাম : ঝিটকিয়া। পূজার সময় প্রত্যহ সকলবেলা। উপাচার :— ফুল, চন্দন, ডাব, নারকেল নাড়ু, কেবল বুধবার ফল দেওয়া হয়। প্রতি বছর একবার ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আসলে

এই শান্তি মা হলেন শ্রীহরিরঞ্জনী লক্ষ্মী। যিনি এই বিশ্বের সমস্ত শান্তির মূল। প্রতিটি গানের সেই বিশ্বজননীর মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। গায়ক ভক্ত তাঁর চরণে গভীর আর্তি নিবেদন করেছেন।

ক্ষীরোদ বাসিনী যিনি শ্রীহরি রঞ্জিনী।
শান্তি রূপে মহাশান্তি বিশ্ব উদরীনি ।।
চরণ কমলে যাঁর ধনলক্ষ্মী বাস।
সুন্দর নয়নে যার ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ
বন্দনা করিছে যারে রবি শশী তারা
সাগর ধোয়ার পদ হয়ে আত্ম হারা
বাতাস ব্যঞ্জন করে দিবস রজনী
নমোঃ নমোঃ রাঙা পদে হে বিশ্ব জননী।

হরিঠাকুরের গান

হরিঠাকুরের গানের মধ্যে ভক্ত হৃদয়ের আর্তি প্রভুব মহিমা বর্ণনাই প্রধান।

(১)

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা আকাশ বাতাস,
তার মাঝে হাসে তব মহিমা প্রকাশ,
স্থাবর জঙ্গম আদি বিশ্ব পারাবার,
তোমার মহিমা ভরা সকল আধার,
তার মাঝে আমি মনা হীন জানি একজনা,
বুঝিব কেমন তব মহিমা নিনাদ।

(২)

ওরে মন পাখী উড়ে যা ছাখ ঠাকুর কোন্ ছাশে
যদি কান্দে পার যদি আনতে পাব
যদি রাখতে পার হৃদয় মাঝে,
যারতো উড়ে পাখি তুই চিনলিনা একদিন
ক্ষুধার অন্নজল পিপাসা কে জোগাছে তোরে
আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে পরাণ দিল পাঁশ মাসে
আজ মরিলে কাল হবে দুদিন শূন্য হবে ঘর
তোর মাসি কান্দবে পিসি কান্দবে
মা কান্দবে হা হুতাশে

দশমাস দশদিন ছিলি মায়ের উদরে
নরাঘরে বসে দেখেছিলি যারে
মায়ের উদরে, জঠর ঘরে বসে দেখেছিলি যারে
ওরে পাখি হরি চাঁদের রূপ সাগরে দিলিনারে ডুব
ভরে মন............

(৩)

জীবন থাকিতে মরিছে দয়াল, জীবন থাকিতে মরিছে
আমি জন্মে মায়ের কূলে রলেম মায়ে ভুলে
মানুষ হয়ে মানুষেরে আমি পবিত্রতা রাখিনি
আমি হরি বলে ডাকিনি,
এমন সুনির্মল তরী গড়ে ছিলেন হরি
আমিতো ভরিয়ে রেখেছি,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ তোমারে কি দেব
পিতৃ দোন হারিয়ে ফেলেছি,
আমরো বলিতে কিছু নাই জগতে।
খালিহাতে দাঁড়িয়ে আমি রয়েছি,
সুরযার মনের ব্যথা বলিব আমি কোথা
হরির নামের কলঙ্ক আমি করেছি।

হারানগান

সুবল মণ্ডল (৪০)

গ্রাম : মধু শিকড়ি।

এই গানে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনাই মুখ্য। এই গানের সাথে লোর চন্দ্র ময়নামতীর গানে সুরের সাদৃশ্য বর্তমান।

রাধে যমুনাতে রাধে—
রঙ্গিনী শ্যামলাগিনী ও রঙ্গিনী শ্যামলাগিনী
যমুনায় জল ভরে
এমন সময় নন্দের কানু বসন চুরি করে,
বসন দেরে ভরে কানু ননী দিমু তোরে
লজ্জা নারীর ভারে কানু লজ্জা নাইরে তোর

গলাতে কলসী বেন্ধে জলে ডুব্ব মর
কোথায় পাব কলসী গো রাধে—
কোথায় পাব দড়ি
তুমি হও প্রেম যমুনার জল আমি ডুবে মরি।

(২)

আমার কাছে আয়রে—
আয়রে উল্কুক (চক্ষে) দেখরে উল্কুক দেখরে আমার দশা
কিবা ছিলেম—কিবা হলেম জীবনের নাই আশা
যেদিন হতে প্রাণ বন্ধু আমার গিয়াছে ছাড়িয়া,
আহার নিদ্রা নাইরে আমার ক্যামনে রই বাঁচিয়া,
আবার যদি প্রাণের বন্ধু আবার আইসত্ ফিরিয়া
দুই চরণ বাঁধিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া।

এসরা পুজার গান

পুরো পৌষমাস ধরে গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা গ্রামের আঙিনায় একটি কলাগাছ পোঁতে এবং তার পাশে কতকগুলি মাটির সিঁড়ি তৈরী করে। সেই সিঁড়ির উপর সরা বসায়। ফুল দুর্বো দিয়ে সারা মাস পুজো করে। এবং পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন কলাগাছ ও সরাগুলি নিকটবর্তী পুকুরে বিসর্জন দেয়।

গায়েন—বিমলা বিশ্বাস, গীতা মণ্ডল।

গানের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি জোরালো খেদ, আক্রমণ প্রকাশিত।

(১)

লাল পাগড়ী বেঁধে মাথায়
কৃষ্ণ চলেছে বেজে পথে
কৃষ্ণ যদি সাপন সইতো
সাধের মালা পরে যাইত
কৃষ্ণ যদি সাপন সইত
সাধের তিলক পরে যাইত।

(২)

আকাশেতে উঠছে চন্দ্র-তারা
আজ বুঝি হইসেন কৃষ্ণ ছাড়া।

॥ সাপের মন্ত্র ॥

ওঝা—মণ্টুকুমার শীল, বয়স—৩০, গ্রাম—ঝিটকিয়া।

সাপের বিষ ঝাড়ার দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে জল পড়ে সাপেকাটা রোগীকে খেতে দেওয়া হয়। পরে তাকে ঝাড়া হয়। তবে এদের বিষ নামানোর পদ্ধতি হচ্ছে, যে পায়ে সাপে দংশন করে তার বিপরীত পা দিয়ে বিষ নামানো হয়।

জল পড়া

সাওতালী পর্বতে পান্তরে পাও
সব বিষ সর পানি খাও
নির্ণয় না জানি কামিরো না আয়লাম পানি ফটিক বরণ জল
মোর পানিভরা এলস ফেলস
দোহাই ঈশ্বর পদ্ম বুঝে বাং হালস
কালা কালা হয়ে কালা
কালা বিষরাণী
চাপটে ধরুম বিষ চিপটে করুম পানি,
যখন কালীধব রাণীর গর্ভ খুলল
বিষধরির ছয় পুত কপালে জন্মিল
কপালে জম্মিয়া পাইলরে টিকা
খোরাইজা খোরাইজা বিষ
নাম বিষ কাজনে কুন
যে নালে উঠেছিস বিষ সেই নালে নাম
দোহাই ঈশ্বর পদ্ম বুঝ বাং হালস।

মন্ত্র

কালা কবুলি হয়ের মুখে লাল
চৌদিক ঝাড়ুম বিষ চালাও লাল
ঘব ভাঙস দুয়ার ভাঙস ধারের বিচায়
শহীদ গুরুভাই সাপের কি কি নাম
গুইয়া গুপী বার মাস যাহে পানিতে পইড়া
যার উপরে পড়ে তার নাই নিস্তার
দুপুর যে ইস্তি সিদ্ধি করলাম ঘুরি

ধুপার কি জিদ কানে কিসের সনা
যাবে বলে উত্তরাদি উক্তি নানান দেশ
আহ্লাদে কটসে কুইদা ঝাড়সি
খয়ের বিষ ফল হস্কার।

৩

কুনেতে বইসা লখীন্দর
বেহুলা বইসা ঘরে
উভয় ঘরে চরকা টানে হাত পাও নাড়ে
বেহুলা বলে তার বিষ খেয়েছিস পতিকে মোর
যাই হোক তার করি নমস্কার বারবার গৃহবার,
কার আইজ্ঞা—মা মনসা ভাগ্য বিষ নাই বিষের আইজ্ঞা।
যদি বিষ শীর্ষে ছাইড়া উভয় নালে ধাস
দোহার তোর অকুমারী পদ্মার মাথা খাস।

মুসলিম সম্প্রদায়ের নানা উৎসব

গ্রাম—সৈয়দপুর, বামনটুলি, থানা—চাকুলিয়া, মৌজা কানকি, পোঃ—বামনটুলি।

(ক) মহম্মদ মুস্তাফা সালাউন লাহা সালিম-এর জন্মদিন উপলক্ষে গান।

আশ্বিন মাসে ১২ তারিখে তার জন্মদিন উপলক্ষে তার জীবনী ও ধর্মবিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিমরা এ উৎসব পালন করে থাকে এই উপলক্ষে যে গান হয়—

ওগো মুসলমান ঠিক রাখো ইমান
দীন ইসলাম যেন গো ভাবে না
একজন ছিলেত মুসা নবী তাহা ছিলেন কিরা পবি
সব নবী জলিয়ে গেল মুসা জ্বলল না,
খোদা তোমায় ডাকতে জানি না,
ডাকার মত ডাকলে খোদা কেমন শোমেন।

মজার গান

ইহা কাউয়ালী জাতীয় গান। এর মধ্যে দেহতত্ত্ব গানের ন্যায় রূপক আছে।

হাসান-হুসেন টিকিট মাষ্টার
হজরত আলি ডরাইবো
আমার নবী গাড়ীবালা
লাইলাহা ইল্লাহলাহা

কবর হতে কি হবে উপায় রে মবিন ভাই
যাহার জন্য চুরি কর যাহার জন্য পকেটমার
সে তোমার সঙ্গে যাবে নাবে মবিন ভাই
টাকা পয়সা জমিদারী পড়ে থাকবে ইটের বাড়ী
কবর হতে কি হবে উপায় রে মবিন ভাই।

রাধা বিরহ গান

গায়েন-মঙ্গল বিশ্বাস, বয়স-৩৫, গ্রাম- উঃ নিয়ামতপুর

(১)

কানু বলে ভাইরে সুবল
আর কত বাজাব বাঁশি,
আমার ভাগ্যে হয় কি না হয়
রাধা পূর্ণিমার ও শশী
আর কত বাজাব বাঁশি।
তোরা সবে যারে বনে
আমায় মন চলে না গোচারণে
ঘরে বসে রাই না দেখে
কেন্দে পোহাই সারা গো নিশি
আর কত বাজাব বাঁশি।
আমি জন্মিলাম দৈবকীর ঘরে
মা বললাম যশোদারে
ভক্তেব বাঞ্ছা পূর্ণ করব বলে
বাঁশি ছেড়ে লইলাম অসি
আমি আর কত বাজাব বাঁশি।

দেহতত্ত্ব ও মনশিক্ষা বিষয়ক গান

(২)

ভাইরে নিতাই বদন ভরে হরি হরি বল নিতাই
যে দেশে নাই জন্ম মৃত্যু সেই দেশে নিয়ে চল নিতাই
বদন ভরে হরি হরি বল·········
একে আমার জীর্ন তরণী ডরে কাঁপে প্রাণ
সাঁতার না জানি
হাল ছাড়া নাও ডুবে এল
নিতাই শীঘ্র এসে হাল ধরো
বদন ভরে হরি হরি বল·········

একে আমার আয়ু বেলা শেষ
চলছি আপন দেশে রে ভাই ছাড়িয়া বৈদেশ
আমার সঙ্গে নিবার কি ধন আছে রে
শুধু হরিনাম পথের সম্বল
বদন ভরে হরি হরি বল·········

(৩)

মধুর হরিনাম কর দুই বাহু তুলে
আমার অসাধনের দিন গেল ফুরিয়ে
ও মন রে জননী জঠরে ছিলাম
করাল কবিয়া আসিলাম
ও মন রে আয়ু সূর্য অস্ত গেলে
শমন দাঁড়ায় এসে যমদূত বান্ধিবে কষিয়া
আমার এই শুষ্ক হস্তের বন্ধন কে দিবে খুলিয়া
গোসাঁই নবকুমার বলে বিপদ পড়িয়া
আমি না, জান (না যেন) ভুলিয়া।

ধাঁধা

পরিমল বিশ্বাস, গ্রাম-ভগবানপুর

১। সাত হাত জলের নীচে বেদে বেটির ঘর
বান নেই, তুফান নেই, তবু বেটির ডর,
উঃ—কচ্ছপ।

২। আমি বন্ধু ডালে তুমি বন্ধু খালে
দুই বন্ধুর দেখা হবে মরণ কালে,
উঃ—গাছের লঙ্কা ও জলের মাছ

৩। পিতার কুলে জন্ম নয়, জন্ম দিল পরে
যখন ছেলে জন্ম নিল তখন মা ছিল না ঘরে।
উঃ- "কুশ" (রামায়ণের লবের ভাই)

খোকসা গ্রাম ও তার স্থাপত্য

গ্রাম—খোকসা, মৌজা—অমড়া, থানা—চাকুলিয়া, জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর।

অম্বরাগড় বাস স্টপেজ থেকে পাঁচ কিমি উত্তর পূর্ব দিকে খোকসা গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই শেখ সম্প্রদায়ের মুসলিম। এখানে একটি প্রাইমারী স্কুল ও ছোট মাদ্রাসা আছে। এখান থেকে ৩০ কিমি দূরে কামকিডে হাসপাতাল। গ্রামের

মধ্যিখানে একটি মসজিদ। প্রায় দেড়শ বছরের প্রাচীন এই মসজিদের গায়ে নানান কারুকার্য্য মনকে আকর্ষণ করে। প্রতিবছর ১৭ই ফাল্গুন এখানে উরুস অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া পীর সাহেব শাহসুবানের মৃত্যু দিন উপলক্ষে আলাদাভাবে মেলা বসে। উৎসবে দূর দূরান্ত থেকে পীর ফকির মৌলভীরাও আসেন। এইখানে পীরের দরগায় মানুষের ভির দেখা যায়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস তার কৃপায় অসুখ-বিসুখ ভাল হয়ে যায়। এখানের প্রাচীনতম মসজিদটির নাম খোকসা জুমা মসজিদ। মুসলিম মহিলাদের শরীয়তি প্রথায় বিয়ে হয়। মহিলারা গৃহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও তাদের প্রবেশ নিষেধ। এখানকার ভাষার নাম সূর্যপুরী ভাষা। বাংলা ও হিন্দীর সংমিশ্রণে এই অদ্ভুত ভাষা গড়ে উঠেছে। কৃষিকাজই মূল জীবিকা। বাড়ির মেয়েরা সেলাইও করেন। এখানকার নৌকাযান বলতে গরুর গাড়ি দেখা যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে—কুত কুত, গুটি খেলা, প্রভৃতি লোক ক্রীড়া দেখা যায়। গুটি খেলায় দুজন ৮টি করে গুটি নিয়ে খেলা করে—এটা প্রায় ছাগলে-বাগলে খেলার অনুরূপ। টালির অংশ বিশেষ দিয়ে কুত কুত খেলা হয়।

মাটির গৃহে কারুকাজ

খোকসা গ্রামের ধনী-দরিদ্র প্রতি ঘরেই অসাধারণ মৃৎ শিল্পের নিদর্শন দেখা গেল। পুরানো দিনের বিভিন্ন মসজিদের কারুকাজ অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে নিরক্ষর, সাধাসিদে গ্রামের মা বোনদের হাতে। বাইরে থেকে প্রতি বাড়ীকেই মনে হয় সিমেন্টের তৈরী। যদিও তাদের উপরে খড়ের চাল। শুধু তাই নয় রান্না ঘর, ঢেঁকী শালা, হাঁসের খোয়াড় সর্বত্রই মাটির কারুকাজ। মাটি দিয়েই বানিয়েছে বিভিন্ন তৈজস পত্র এমন কি আলমারীও। এই গ্রামের সত্তর বছর বয়স্ক মহম্মদ ইয়াসিন দেখালেন তার স্বর্গীয় মা থুকড়ী বেগম, কি সব অমূল্য ভাস্কর্য ও মাটির দেওয়ালে চিত্র এঁকে গেছেন। সেখানেই দেখলাম মাটির আলমারী। কুঠরী (যাতে ধান রাখা হয়) খুঁপি (হাঁসের ঘর) কোঠি (তুস রাখার পাত্র) খিলান। আব্দুল গনির বাড়ীতে পেলাম নানা রকমের থাম, চিরাগদর্পন (দীপাসন জাতীয়)।

লোকসাহিত্য সংগ্রহ

Group C. ('গ' বিভাগ)

শ্রী সুব্রতনারায়ণ মজুমদার

চৌপগড়া গ্রামের দয়ুপ্রসাদ সিন্‌হার বাড়ীতে দেখলাম এক অভিনব বিষহরি পূজা। এটা আসলে মানত পূজা। এটাকে এই সম্প্রদায় চূড়াকরণ বলে থাকে। এই বিষহরি পূজার মূর্তির বৈশিষ্ট্য হল মূর্তি পুরোপুরি মাটির। মূর্তির ডানপাশে লক্ষ্মী বামপাশে সরস্বতী। লক্ষ্মী সরস্বতী পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। বিষহরি বা মনসা সাপের উপর দাঁড়িয়ে এবং এই মূর্তির মাথায়ও সাপ ফণা তুলে আছে। মূর্তির শিল্প প্রতিভা খুব সুন্দর

নয়। খানিকটা অনার্য আদিবাসী জাতীয়। মূর্তির মাথায় মুকুট, কানে দুল, গলায় চওড়া হার, বাহুতে অনন্ত, হাতে চুড়ি, পরনে শাড়ি। প্রতিটি মূর্তিব দুটি করে হাত। বিষহরির পদযুগল দেখা যাচ্ছে। অন্য দুটি মূর্তির তা নয। প্রতিটি মূর্তির ডান হাত বরদানের ভঙ্গিতে উঠানো। বাম হাত একটু নীচে উপব কবে রাখা। উল্লেখ্য সরস্বতীর হাতে বীণা নেই। তবে শ্বেতবসনা পরনে পায়ের কাছে হাঁস। লক্ষীর হাতেও ধান বা সাজি নেই। বিষহরিব হাতও খালি। মূর্তিগুলি খানিকটা নাচেব ভঙ্গিতে দাড়ানো। যে কোন ফুলে পূজো হয় এবং এই পূজো হয় লগ্ন অনুযায়ী। হৈমন্তী ধানের উপর পেতলের ঘটে আম্রপল্লব দেওয়া। তবে আম্র পল্লবের উপর ঘটফলের পরিবর্তে চাল কলা দুধ দিয়ে নৈবেদ্য মেখে দেওয়া। ঘটের গায়ে সিঁদুর, চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়। দূর্বা তুলসীপত্র পূজোতে লাগে। পূজোর শুরু থেকে বিসর্জন পর্যন্ত তেলের প্রদীপ সর্বক্ষণ জ্বলে। ধূপ এবং শাঁখ থাকে। এই সমস্তই হল বিষহরি পূজোর মূর্তি বৈশিষ্ট্য।

এর পরে আমরা পাশের বাড়ী ক্ষীতিশ চন্দ্র সিন্হার বাড়ীতে গেলাম। সেখানে ছিল বিয়ের ব্যস্ততা। তাই অনেক কষ্টে কিছু ধাঁধা সংগ্রহ করলাম। এরমধ্যে কাহিনী মূলক ধাঁধা উল্লেখযোগ্য। যেমন—দশ বছরের একটি ছেলে ধীরাজ কুমার সিন্হার কাছ থেকে পেলাম—

"দৌড়ে গেনু দৌড়ে আসিনু
ধীর গঞ্জের হাট
কতুনী দেখুন মুই
ফলের উপর পাত*। (*পাতা)
(উত্তর—আনারস)

এরপর এই ছেলেটির কাছ থেকেই পেলাম একটি মিষ্টি কাহিনী মূলক ধাঁধা। যেমন—

(i) আজ্ঞির ভিতর পাখির বাসা
জলকে দিলাম শূল,
চার পাওয়ার উপরে নিপাওয়া ওঠে।
দু পাওয়া নিয়ে ডালে বসে
চ্যাঙ মাছ কি জামের আঁধার কবে ?

এই ধাঁধার পিছনে একটু রূপকথার কাহিনীগত কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এক রাজকন্যা পণ করেছিল তার প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারবে তাকে সে বিয়ে করবে। বহু রাজপুত্র রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে হেরে যায় এবং রাজকন্যার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য একজন স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে রাজপুত্র সাজিয়ে রাজকন্যার বাড়ীতে নিয়ে আসে। সেই রাজপুত্র রাস্তা

দিয়ে রাজপ্রাসাদে আসার সময় রাস্তায় যে সব দৃশ্যগুলো দেখেছিল সেই সব দৃশ্যগুলো ধাঁধার মত প্রকাশ করে রাজকন্যাকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল। আন্ধির ভিতর পান্ধির বাসা —কথাটির অর্থ হল রাজপুত্র রাস্তায় আসতে দেখেছিল একটি ফুটো হাঁড়ির ভিতর দিয়ে একটি পাখী প্রবেশ করছে এবং বার হচ্ছে। এবং আরও দেখছিল ঘাসের উপর শিশির বিন্দু থাকে বলেছে জলকে দিলাম শূল। চারপাওয়ার উপরে নিপাওয়া ওঠে দুপাওয়া নিয়ে ডালে বসে—যার অর্থ হল কোন এক রাখাল পুকুরে গরুকে (চারপাওয়া-চার পা) স্নান করাচ্ছিল, সেই সময় সেই গরুর পিঠের উপর দিয়ে মাছ (নিপাওয়া—যার পা নেই) চলে যায় এবং মাছরাঙা (দুপাওয়া—দু পা) সেই মাছটি নিয়ে ডালে বসে। চ্যাঙ মাছ কি জামের আঁধার করে ? কথাটি অনাবশ্যক। অপরটি একটি সাধারণ ধাঁধা—

(ii) একটা ঘুঘুর চারটা বাচ্চা
চললে ঘুঘু কলকাতা। (উঃ পালকি)

(iii) রাজব্যাটা আঁটিয়া/দুয়ার বান্ধে সাটিয়া। (উঃ শামুক)

(iv) রাজার বেটি ধোন্দল পেটি
বিনা কোঁদালে খুদে মাটি। (উঃ শুকর)

(v) গাছটি লতি ফলড কুচি
যাহার নি কহবা পারে তার মা লুচ্চি। (উঃ কলাগাছ)

(vi) রাজার ব্যাটা বীর / বসে মারে তীর। (গমের শিষ)

(vii) ডালে পাতে ভেলেলা
ফল ধইচে বারোটা
পাকলে একটা। (উঃ দিন, মাস, বছর)

(viii) কাচায়েতে লকপক
পাকলে সিঁন্দুর
যাহারনি কহবা পারে
তাহার বাপ বুড্চা ইন্দুর। (উঃ মাটির কলসী)

(ix) আকাশে লতুপুতু
পাতালে ডোর
যাহারনি কহবা পারে
উয়ার বাপ দুনিয়ার চোর। (উঃ ঘুড়ি)

(x) চির দিয়া ফার দিয়া
ঢাল দিয়া ঘি
তারপর লাল দিয়া
বুঝত কি ? (উঃ সিঁথিতে সিন্দুর)

(xi) কেশীপুর যে ধরা পড়া তালাপুরমে দেখা
খুরাপুর পেজা কারকে চোরের ভুটি ফাটা দিয়া।
(উঃ উকুন মারা)

(xii) খাবার নি জিনিষ তাহাও মানুষ খায়। (উঃ ঠোক্কর খাওয়া)

(xiii) ইলবিল সিল
সব বিল শুকায়ে গেল
ঢেলভত ছগ বিল। (উঃ শামুক)

(xiv) এতেডি ডিঘী মাছ খুতবুদায়
একমারা কিছু পরলে মহামুশকিল হয়।
(উঃ চোখে কিছু পড়া)

(xv) হাদেক স্থাখ স্থাখ
একটা নারীর তিনডা পেট। (উঃ আঙ্গুলের তিন দাগ)

(xvi) চার ভাই ছাপার ছপুর,
দুই ভাই বসে ঠাকুর,
দুই ভাই মণ্ডিল বাজায়
এক ভাই চ্যাউরি ডপায়।
(উঃ গরুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বাট, শিং, কান, ল্যাজ)

(xvii) দৌড়ে গেনু দৌড়ে আসনু ধীর গঞ্জের হাট
একটা কইনাক দেখে আসনু যোলমারির দাত। (উঃ ভুট্টা)

(xviii) এক ভাই আসে এক ভাই হাসে
এক ভাই কটিত্ কাদ লাগায়ে রয়।
(উঃ চ্যাপ বা শাপলা ফুলের বীজ)

(xix) বাপ খরকসা মালুতুম
ব্যাটা পিচ্ছিল। (উঃ কাঁঠাল ফল)

(xx) পাঁচ ভাই উঠায়ে দিল ধাপত
বুরাড়ি ছিল কর গনত,
ঠেলে দিলে ভিতরি ঘরত। (উঃ হাতে খাওয়া)

(xxi) এক গরু বেত খায়
মরা গরু ডডায় বেড়ায়। (উঃ ঢাক)

(xxii) খুটার উপরতি খুটা তার উপরতি গোল
খিচ্চিত করে ঘুতা দিমু ছিরিৎ করে পোল।
(উঃ ঘানিতে সরষে ভাঙ্গানো)

(xxiii) রাজা ভাত খায়
টেপুয়া দেখে রয়।

(উঃ ভাত খাওয়ার সময় গ্রাস)

(xxiv) এটা একটা কাহিনী মূলক ধাঁধা।—
হিক্‌রস্তি ডিকরস্তি চুকুর চুকুর পানি
তোর মনত্‌ থ্যাতালা ছ্যা গোটেলাই জানি।

(উঃ নাপিত ও ষাঁড়ের ঘটনা)

এক রাজা ছিল। তার দুই রানী। এক রানী রাজাকে ভাল বাসে না। তাই সে রাজার নাপিতকে হাত করে বললো যে যদি সে রাজাকে মারতে পারে তাহলে সে নাপিতকে বিয়ে করবে এবং নাপিত এতে রাজী হল। একদিন সকালে রাজা একটি ষাঁড়কে প্রস্রাব করতে দেখে উক্ত কথাটি বলেছিল। ঠিক তখনি নাপিত ক্ষৌরকর্মের সময় রাজাকে মারবার জন্য ক্ষুরে শান দিচ্ছিল। রাজার এই কথাটি জেনে সে ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল রাজামশাই বোধহয় তার দুরভিসন্ধি বুঝেই রহস্য করে ওই কথাটি বললো এবং রাজাকে হত্যা না করেই পালাল।

এর পর আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম কোন এক গৃহস্থ পরিবারের দিকে গ্রামটির নাম খাদারগাছি।

এই একই উৎস থেকে আমরা কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করলাম প্রবাদকে এই সম্প্রদায় ইলারী বলে থাকে। যেমন—

(i) চালের উপর কদুর টুসি
ভাতার ধরি মুই আপনা খুশি।

চালের উপর লাউ যেমন তেমন ভাবে পড়ে থাকে। তেমন-ই নারীও চায় তার স্বামীকে নিজের পছন্দমত বেছে নিতে। এই প্রবাদটির মধ্য দিয়ে আমরা রাজবংশী সমাজের নারী স্বাধীনতার দীপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করি।

(ii) ঘরত নি ভাত ধাপত নি চুলা
ঘরে ঘরে বেড়াই মুই ধুতি ঝুলা।

(iii) নিজের কামে উদাঙ্‌ দাঙ্‌
পরের কামে নিক্‌লাতিক ঘাম।

(iv) যাহার কামে তাহার পরে
নি করলে লাদাং পরে।

এর অর্থ হল যার যা কাজ তাকেইতা সাজে। অন্য লোক করতে সে কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

ঐ মাদারগাছি থেকেই আমরা কয়েকটি বাউলগান পেয়েছি। এগুলি সুভাষচন্দ্র সিন্‌হার কাছ থেকে সংগৃহীত।

সাধের গিন্নী তুমি আমায় দাও না চা করে
দাও না চা করে।
বলি তোমার হাতের চা না খেলে[২]
গিন্নী গো ··মন যায় মন জুড়ে
চাকরী করি দুর্গাপুরী ইস্টিল কারখানায়
আড়াইশো টাকা বেতন পাবো কিসের ভাবনা গো[২]
বলি তোমার জন্য শাড়ী নিব[২]
কোলকাতারই টাউন ঘুরে
সাধের গিন্নী দাও না······[২]
কাল বাজার থেকে কিনে এনেছি আড়াইশো আটা[২]
তাড়াতাড়ি দাও না গিন্নী পাঁচখানা পরোটা
বলি দুই খানায় আমায় এনে দাও[২]
বাকিটি রেখো কারখানা ঘরে[২]
সাধের গিন্নী দাও না চা করে

এই গানটির মধ্যে বর্তমান যুগের এক যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে, জীবনের ছোট-খাটো সুখ-স্বচ্ছন্দকে নি স্বপ্ন দেখে। সে শহরের কারখানায় কাজ করে সংসারের ছোট সুখ ও আনন্দকে অনুভব করে যেন গানের সুর মাধুর্য বৃদ্ধি করেছে।

এই গানে আধুনিক (সাম্প্রতিক) যুগ-জীবনের অপূর্ব ছাপ পড়েছে। তাছাড়া বাংলা-বিহার সীমান্তের এই অঞ্চলের বাউল গান এই কথায় প্রমাণ করে যে বাউল গান শুধু রাঢ়বঙ্গের গান নয়, এ গানের বিস্তৃতি আরও অনেক দূর। এ থেকে আরও বলা যায় যে বাউল গানের আবেদন মননধর্মী মানুষের মনের তারে সাড়া দিয়ে সমস্ত শাশ্বত জীবনধর্মকে তুলে ধরে। তাই এই উত্তরবঙ্গের মানুষের মুখে এই বাউলগান বিচিত্র নয়।

এইরকমই আর একটি বাউলগান হলো—

ও আমি তাই তো পাগল হলাম না
মনের মতন পাগল পেলাম না
বলি নকল পাগল সকল দেকো
আসল পাগল কয়জনা
মনের মতন পাগল পেলাম না।
আমি মনের মতন পাগল পেলাম না॥

কেবা পাগল প্রেমের আশে
কেবা পাগল বিহের লালসে
বলি নকল পাগল সকল দেশে
আসল পাগল কয়জনা,
মনের মতন পাগল পেলাম না ॥

শ্রীরামঠাকুর কৃষ্ণের মতো—
কতই পাগল আছে বলো না
বলি দেশের ঠাকুর দেশে রইল
বিদেশ তো আর গেল না
মনের মতন পাগল পেলাম না
আমি মনের মতন পাগল পেলাম না ॥

এটি আধ্যাত্মিক পর্যায়ের বাউলগান। এই সুভাষচন্দ্র বহু বাউল গান জানে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সব গান শোনা হয়নি।

—শিশুকে ঘুমপাড়াণী ছড়া—

নিন্দারে নিন্দারে ভাববের জুয়া
তোর মা গিচে হাট বেরিবা
বাশের পাতারিত করে লারু আয় রে।
ওমা বিলাইতা খায়া বসবে
কানা কুকুরটা বাই ভুকবে
কানে ছুয়া কুহা কুহা।

অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির আহ্বানে এই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে একটা ছড়া প্রচলিত আছে। ছড়াটি হলো—

(ক) ইগ.রে গিরথানি কাহা গেলিরে তেঁতুলা
ভাতারক্ ভাত দিয়ে হাগ.রা গেলিয়ে তেঁতুলা।

(খ) পানি মাঙবা গিয়ছু গে বামন্ কাইবের বাড়ী
বামনেব কাইবেঁ বহু বেটিলা বাবা ইতরাণী
ঝমত্ করে নিক্লাই দিলে এনা জলের পানি।
সনা জলের পানি খান খিলামু বিলহামু
আকুয়ারি দেহাতক্ সিনান কবামু।

এই ছড়া বৃষ্টির আহ্বানে গাওয়া হয়। উঠোন পরিষ্কার করে-মাঝখানে একটি ঘট স্থাপন করা হয়। তাতে আম্রপল্লব, ধান, দূর্বা, ফুল দেওয়া হয় এবং এই ঘটের উপর একটা ছাতা ধরা হয়। এরপর পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে এই ছড়া বলে। গৃহস্থরা তখন উঠোনে সেই ঘটের চারিপাশে জল ঢেলে দেয়। এই ভাবে বৃষ্টির কল্পনা করা হয়। স্থানীয় ভাষায় অর্থাৎ রাজ বংশীরা এই ছড়াকে পানি মাঙ্গার গান বলে।

এরপর আমরা দোমোহনা বাসস্ট্যাণ্ডে ক্ষেত্র মোহন সিন্‌হাকে ধরে পণপ্রথা বিষয়ে একটা ছড়া পেলাম। এটি অনেকটা পাঁচালী ঢঙে রচিত।

নামটি মানস সরকার, বাড়ী তার তোর্সা নদীর পাড়ে
জোখের কুটি গ্রামের নামটি জানায় ধীরে ধীরে।
(বাড়ী তাহার) দাবী পুরাপুরি সাইকেল, ঘড়ি আর—
স্ট্যাণ্ডস্টাপ, জামা জুতো ধুতি আর মেয়ের অলংকার॥
সোনা দশ ভরিতে দিতে হবে মেয়ে সাজাইয়া।
শ্বশুর বাড়ী এসে তবে করবেন কিন্তু বিহা॥
নগদ ছয় হাজার দাবী তার শুনলে মাথা ধরে।
লেপ, তোষক হাতের আংটি আনে তার ভিতরে॥
হায় কি দুঃখের কথা আত্মীয়তা করবার উপায় নাই।
মেয়ে নয় টাকার বিহে বুঝে দেখি তাই॥
মেয়ের বাবাই ঠেকজ দায় মেয়ে জন্ম দিয়া।
গঙ্গারামে কথা দিল নিরুপায় হইয়া॥
মেয়ের কেমন জ্বালা সারাজীবন খাওয়াই এখন ভাঙ্গবে—তালা।
তখন চিন্তা করি টাকার পরে করবে কি উপায়।
দশবিঘা জমি দিল সার্তে বিয়ের দায়॥
কথা পাকা হইল ফাল্গুন এলো বারই শনিবার।
বরযাত্রী নিয়ে জামাই এল সন্ধ্যার পর।
বাজে বিয়ের বাজনা॥
বাসরখানা ইন্দ্রপুরী প্রায়।
বাজি-বারুদ, কত ফুটে, লিখা নাহি যায়॥
ভাইরে সানাই সরে, মন-পাহাড়ে, কানে ধাক্কা মারে।
জয় জোকারে, নারীলোকে যায়, কন্যা সাজাইবারে॥
সাজন শুরু হইল হাতে দিল শাঁখের রুলিবালা।
কপালে সিন্দুর সঁপে দিল ভালে যেমন চন্দ্রকলা॥
মাথে সিঁথিপাটি গন্ধথাটি ভৃঙ্গরাজ তেলে।
কাননে কাস্থরি রিণ, মণির মত জ্বলে॥

মুখে সোনো পাউডারি, গন্ধে উড়ে প্রাণ।
গলে দিচ্ছে গো চন্দ্রহার গো হাজার টাকা দাম ॥
ঠোঁটে আলতা পরা, না যায় ধরা, নাকে জ্বলে তারা।
নিউ ডিজাইনে শাড়ী পরায়, বোম্বাই এলো গড়া।
হায় কি হাওয়া এলো ॥...(অসমাপ্ত)

এই ছড়াটি যদিও অসমাপ্ত, তবু এর মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজ জীবনে পণপ্রথার বিষময় পরিণতি, মেয়ের বাবার নিদারুণ কষ্টের প্রকাশ ঘটেছে। তবে রাজবংশী সমাজ-মানসে এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছে বলে এই ছড়ার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়।

এখান থেকেই আমাদের প্রত্যাবর্তনের পালা। এতক্ষণ সধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবার ফলে বারবার মনের কোণে মেঘ জমছিল—বিদায় নিতে হবে। আমি সুব্রত নারায়ণ মজুমদার, সুপ্রিয়া নায়েক, ছবি ভট্টাচার্য, লিপি সরকার, ইরা সরকার এবার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বক্ষণের সাথী অজয়দা মিলে বাস ষ্টাণ্ডে এসে লরীতে উঠে বিকেল চারটে তিরিশ মিনিটে সৎসঙ্গ শিবিরে পৌঁছালাম। উপরে উক্ত অঞ্চল সমূহের জনসাধারণের প্রতি থাকল আমাদের তরফ থেকে অজস্র ধন্যবাদ।

ক্ষেত্রগবেষণা বিভাগ—ঘ

আজ ৭।৫।৯০ তারিখে আমরা ঘ বিভাগের সদস্যরা পাতলোর গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী পলমা গ্রামে গিয়েছিলাম। উভয় গ্রাম থেকে লোক সংস্কৃতি বিষয়ক যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছি তার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হল—

১। উপকথা
২। রূপকথা
৩। ছড়া
৪। মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ সম্পর্কিত গীত
৫। ধাঁধা
৬। আল্‌পনা
  (ক) রাজবংশীদের বিয়ের আল্‌পনা
  (খ) পূজা সম্পর্কিত আল্‌পনা
৭। রাজবংশীদের বিবাহ সম্পর্কিত গীত
৮। প্রবাদ
৯। নটুয়া গান (পালা)
১০। বলভাই গান (পালা)
১১। ওড়ানি ছবি গান (পালা)

১২। লৌকিক নাটক
(ক) রেবতী পালা
(খ) পূন্নিমা (পূর্ণিমা)
১৩। লক্ষ্মীর (কমল প্রাপ্তির জন্য) আহ্বান বিষয়ক ছড়া—ডাকের ছড়া
১৪। উল্কাদানের ছড়া
১৫। পলমা গ্রামের মন্দির (শিব, দুর্গা) গড়ে ওঠার কাহিনী
১৬। পাতলো গ্রামের মসজিদ গড়ে ওঠার কাহিনী ও সরিয়তী নামাজ পদ্ধতি
১৭। মাটির দেওয়ালে নক্সা ও গৃহের বিশেষ আকৃতির প্রতিকৃতি
১৮। জিতাষ্টমী
১৯। লোক-ঔষধ।

সময়াভাবে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হল না। আগামীকাল আমাদের সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ আপনার নিকট পেশ করব।

বিভাগ—ঘ পথনির্দেশক—

১। নিশিথ মাহাতো যজ্ঞেশ্বর দাস
২। যশোদা ঘোষ
৩। পারমিতা চৌধুরী
৪। মধুমিতা মজুমদার
৫। অখিল বিশ্বাস
৬। সাহেরা তরফদার

॥ ছয় ॥

তৃতীয় দিবসের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের বিবরণ

'ক' বিভাগ

আমাদের কর্মশালার বিবরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলা বিভাগ, লোকসাহিত্য বিশেষপত্রের ক্ষেত্রকার্যের ফলাফল :

6th May 1990 আমরা ক্ষেত্রকার্যের অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিম দিনাজপুরের ডালখোলায় এসেছি। এই বিষয়ে আমরা আগেই জানিয়েছি। আমরা 'ক' বিভাগের সুদেষ্ণা রায়, সুলেখা ঘোষ, ভারতী সাহা, সুরজিৎ বসু ও শুভাশিষ ভুক্তা আমাদেব ক্ষেত্র অনুসন্ধানের বিবরণ এখানে উল্লেখ করলাম। আমাদের প্রথম দিনের অনুসন্ধানক্ষেত্র ছিল টুঙ্গীদিঘী নামক একটি গ্রাম। গ্রামটির পোষ্ট অফিসকরণ দিঘী। মৌজা জুঝারপুর।

গ্রামটি ডালখোলা থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে। এখানে আমরা প্রথমে যাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম তাঁর নাম সাধুচরণ দাস। তিনি আমাদের কাছে এই গ্রামটির যে পরিচয় দিলেন তাতে আমরা জানতে পারলাম গ্রামটিতে বর্তমানে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে।

এই অঞ্চলটি রাজবংশী প্রধান এলাকা। অঞ্চলটি তিনটি রাজ্যের সংযোগস্থল বলে এখানে সংস্কৃতির মধ্যে কিছু নতুনত্ব আছে।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে একটি পালাগান রচনা করেন এর নাম **নাটকগান**। এই গানকে আঞ্চলিক ভাষায় বলে পুলিয়া। গানের ভিতর কোন কোন সময় সংলাপও থাকে। বিশেষ বিশেষ দিনে তারা কোন এক জায়গায় সমবেত হয়ে নাটকগান করে। প্রাচীন অতীতের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিকে ভিত্তি করে নাটকগানগুলি রচিত হয়। যেমন—মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারটি নিয়ে নাটকগান রচিত হয়েছে।

এছাড়া প্রেমজ ঘটনাকেন্দ্রিক গান থাকে এখানে বলে বুদাই সোরী গান। **বুদাই সোরী** গান সমসাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক। অনেক জায়গায় একে বাউদিয়া গানও বলে। এর একটি গান আমরা সংগ্রহ করেছি। বিয়ের পর বউ মারা গেলে বিপত্নীক স্বামী আক্ষেপ করে গান গাইছে—

গানটি ঢ্যানার মন কান্দেরে দারুন বিধুতা
আর কতদিন হবে ঢ্যানার শুভলক্ষণ ব্যাহা।
'মা' বেটা শুন মোরে কথা
কাল না হইতো পরশু দিন দিব তোমাকে ব্যাহা॥

আরও আছে চোরচুন্নী :—এটি আলমতী প্রেমকুমারের কাহিনী—

গানটি :—আজি ছায়ার জন্য বিরথে গেলাম
বিরথে নাহি পাতা
হায় দারুন বিধুতা॥
মুই অভাগন ভোর মরণ হইল না
হায় দারুন বিধুতা॥
:—আজি হামন সুন্দর নারী মরিবেরে কি তায়
হায় দারুন বিধুতা॥
:—আজি মরণের সময়রে মন কে দিলে বাধা
ও মোর খায়েরে মাথা
বিধিরে, দারুন বিধুতা, হায় দারুন বিধি
মুই অভাগিন ভোর
মরন হইলনি। (গায়ক ওয়ামু সিং)

বিভাগ—ক

১। সুদেষ্ণা রায়

২। সুলেখা ঘোষ

৩। ভারতী সাহা

৪। সুরজিৎ বসু

৫। শুভাশীষ ভুক্ত

গতকাল ৭ই মে, সোমবার আমরা করণদীঘি থানার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামকে ক্ষেত্রানুসন্ধানের জন্য চিহ্নিত করেছিলাম। সেখানে আমরা সতীনাথ সিং-এর বাড়িতে কিছু ছড়া পেলাম। বিভিন্ন বিষয়ক ছড়ার মধ্যে শাশুড়ী ও বউয়ের সম্পর্ক নিয়ে ছড়া প্রচলিত আছে। ছড়াটি হল—

১. বড় পুতও বড় পুতও
বড় বাপের বেটি
মার্কিল পুতও মার্কিয়ার মাটি।
ছোট পুতও মাহাতোর মান
কেতে শুনাবে কাথার মান।

শাশুড়ি ও শ্বশুর মরে গেলে স্বামী স্ত্রীর আনন্দিত মনে বসে যে ভাত খাচ্ছে তার প্রকাশ একটি ছড়াতে দেখা যায়—

২. শাশুড়ী শ্বশুড়ী চলি গেছে বনবাস
তুই খাচী শীদল পোড়ায় বেদলায় ভাত।

ঘুম-পাড়ানি বিষয়ক ছড়াটি হল—

৩. নিন্দারে নিন্দা ভাকরে ছোঁয়া
তোর মাগীটা হাট বেড়িয়া
বাঁশের পাতাড়ি লাড়ু আনিয়ে
ভোমানাকাটো খাবা বসিছে
কানা কুকুরটা বাউ ভুগিবে ভাউ ভাউ।

হাট ফেরত স্বামীর হাসি মুখ দেখার জন্য স্ত্রীর মানসিক চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ—

হাট মাচু বাজার মাচু
(ঝুলায়) মুখোয় তেড়ে তাড়ি
লেকে জনে কয়ে দিব
ভাল দুনিয়ার মুদি
আসিবে দেউলিয়া ভাতার বসতে দিমু চটি
ডালা ভরে পান দিমু মুখে লিমু হাসি।

স্বামীর পরিচর্যা না করে স্ত্রীর অন্য কাজে মন দেওয়ার ব্যাপারটিও ছড়ায় ধরা পড়েছে—

হেন তাকড়ি হেন তাকড়ি
ভাতারক দেখায় লিখলাল তাকড়ি (বেরকরল)
ভাতার গেল পাথার
তাকড়ি মরিল ফিকতার ॥

ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাদের সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু প্রবাদও। অসময়ে কাজের বিষয়ে একটি প্রবাদ হল—

১. দিন পেলে আলে কালে জোনাকে শুকাছে ধান
আনবো বেটি ছাম গাহীম তোর বাপে কুটুক ধান।
কুঁড়েদের নিয়েও প্রবাদ প্রচলিত আছে—

২. হাড়ে কুড়িয়া বেদেং দেং
আলায় খেচলহি ছোয়াডোর ধ্যাং।

ঘরে অন্নের সংস্থান নেই, অথচ সাজপোষাকে প্রাচুর্যের বিষয়ে প্রবাদ—

৩. ধরুনি ভাত ধাপত ঢুলা ঘরে ঘরে বেড়াছে ধুতি ঝুলা।

৪. দুঃখী যায় সুখীর পাশ
আন পাশনি ছিলে ঘাস। (খুরপী)

৫. মরলড বাহিরে ফুটানি
ঘরুনি গরু মরলড দশখান গুহাঙ্গি।

৬. হালত নি গরু চপরি উল্টা চাষ
থকনি ভাত বুড়া মকর মকর গাস।

আমাদের দ্বিতীয় দিনের কাজে অর্থাৎ 7th May-র কাজে আমরা এই মোহনপুর গ্রামের রাজবংশী অধিবাসীদের কাছ থেকে কিছু ধাঁধাও পেয়েছি। রাজবংশীরা ধাঁধাকে বলে ফাকড়ি। ফাকড়ি বা ধাঁধার কিছু নমুনা নীচে দেওয়া হল।

১। দু বগলমে দু শোলাং বিজমে পানি ফচাং
আরে চুপাতা চুপাতা আফভি তুমকো দেতাং
দে তাং তো না হামারা বিধি মর জাতাং। (উত্তর পাওয়া যায়নি)

২। পানি পড়ে টিপির টাপার ধান বুনে গজা
হাতির পর চড়ে যাছে চামচিল রাজা। (উত্তর পাওয়া যায়নি)

৩। ছয় ঠ্যাং কিষণ বরণ পেট কাটিলে নাহি মরণ। (পিঁপড়ে)

৪। চার ভাই ছাপার ছুপুর দুই ভাই বসিয়ে ঠাকুর
দুই ভাই ঢেরঢেরি বাজায় এক ভাই চেতলি ডলায়।
(লাঙল চালানোর সময় গরু)

৫। হপর হপর এক কবর দুই ছপর। (কলার পাতা)
৬। জল টিমটিম জলও বাসা কাটায়নি গজায়নি লুদলুদ দাসা। (জোঁক)
৭। ভাঙ্গা ঘড়ে হুলমান নাচে। (খই)
৮। রাজার বেটি ধোমদল পেটি বিনা কোদালে খুদে মাটি। (শুকর)
৯। দিন করে মেদনি ভাল ঘাস খায় রাত করে মেদনী খোকত লুকায়। (কাঁচি)
১০। জলত খোতলা (শোলা) ভাসে কুকুরটার মতন বসে
যাইনি কহবা পারে তাব বহনুক (জামাইবাবু) ডাকায় মানে। (ব্যাঙ)
১১। একটা ঘুঘুব দুইটা মাথা, চলরে ঘুঘু কলিকাতা। (নৌকা)
১২। আছারালে ভাঙেনি টিপলে সহেনি। (ভাত)
১৩। খোরত পায় আচ্ছায় মারয়। (নাকের শ্লেষ্মা)
১৪। ধাপতেছে ফুল লাল টুলটুল। (কুপি)
১৫। রাজা ভাত খায় টেপুয়া দেখে রয়। (ঘটি)
১৬। টিটি নেগর দিয়ে জল খায় তার নাম কি? (কুপি)
১৭। এতেরি কুঠি ধান ধরে আঠারো বিশি। (শালুক ফুল)
১৮। কাচ্যতে লুকপুক পাকলে সিন্দুর যাহনি কহবা পাবে বুড়া মিনচুর।
(মাটির হাঁড়ি)
১৯। হেকা বেকা খুদে মাটি দশ ঠ্যাং তিন কটি। (লাঙ্গল, মানুষ, গরু)
২০। ঘড়া যায় ঘটঘটাতে হাতি যায় টাবে তোর বাপের নাম
কি খোকল ডিম এইডো কথা কহতে লাগবে যোলদিন। (ইঁদুর ও বিড়াল)

রাজবংশীদেব বিবাহের গহনাব কিছু নামও আমরা সংগ্রহ কবেছি—

কলিবালিয়া—চুড়ি
বিছা—হার
করঙ্গা—সোনার মালা
কাঁটা
ছাড়া—চুড়ি (পায়ের)
তোরা—
রেট—বিছা (কোমবের)

এছাড়া বিবাহের সরঞ্জামেরও নাম পেয়েছি—

কবুরা—ঘট
আমডালা—আমপাতা
পানসুপাড়ি—
ধানদুবরি—

ঢাকন—ঢাকা দেওয়া মাটির সরা

কলো—কলা

কোড়ো—হলুদবাটা

কাঁসাই—গাছের শিকড়

কোড়ো আর কাঁসাই মেশালে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়। বিয়ের সময় পেটি (পাথর) থাকে, পেটিতে তেল দিয়ে মাথায় দেওয়া হয় পাঁচবার।—মঙ্গলকার্য। কুলোতে মাটির খোলা থাকে, পাশা খেলা হয়। বিয়েতে সাদা থান পরে কনে, কুমারী অবস্থায়, সিঁদুর দেওয়া হয়ে গেলে অন্য শাড়ী পরে।

গেরস্থালিরও কিছু জিনিসের নাম—

রান্নার মশলা রাখার সরঞ্জামকে বলে চারচুকিয়া।

বাড়িয়া—কলসি

লোহি—কড়াই

হাণ্ডি—হাঁড়ি

থালি—থালা

কাঠুয়া—কাঠের পাত্র

মালামাধব গান—এটি প্রেমসংক্রান্ত। আশ্বিন-কার্তিক মাসে কালীপুজো উপলক্ষে রাজবংশীরা এই গান দলবেঁধে করে। এটি বোলোসোবী পর্যায়ের।

মাধব :—জলপিপাসা লাগছে রে মালা আমার অন্তরে
তোর কলসার জল খাওয়াআ মালা প্রাণ বাঁচা আমারে।
জল পিপাসার বড়ই জ্বালা সয়না মালা আমার অন্তরে,
তুইরে মালা রূপবতী জলছিস কলের বাতি
তোক নে দেখনে মালা রৈতে পারুনি।

মাধব :—চারশো চল্লিশ নম্বর গাড়ীতে চলে যাবো মালা বালুরঘাটে
বালুরঘাটে গিয়ে মালা করিবরে কোর্ট-বিয়ে।

মালা :—তুই যে আমার মামার বেটা, মুই যে হলু দাদা
পিসার বেটী বুহিন, ভাইয়ের বুহিনে দাদা কেমনে পলাই যাই
মুই যে হলু দাদা ইস্কুলের ছাত্রী, না জানি মুই প্রেম পীরিতি।

লয়ী গান—চাষ করার সময় খুব রোদে মাঠের মধ্যে মানুষ যখন অস্থির হয়ে ওঠে তখন বিনোদনের জন্য এই গান গাওয়া হয়। গানটি হল—

কালো কালো লেলিয়ারে সাগর,
ও মোর হিরাজ হিরারে পাত
শেখনা লেলিয়া তুলি তেরে
ও মোর স্বামী থালে কালো পয়দা লাগে রে।

শ্বশুর কাড়ে হাতেরে পায়ে
ও মোর স্বামী কাড়েরে জিয়ার পাত্র দিয়া রে
ও মোর সামারুরে।

বেহার গান—বিয়ের সময় উভয় পক্ষই এই গানটি গায়—

১। কাচা কাচা ডালিম গুছা
তার তলে কুহেলীর বাসা
মায়া গরীব মা তোরগে তোকে বুড়ো তেজি
বুহিল লুভাক তোআ লনী যাচ্ছে।

২। ভাত খালো পাত কানা করলো জলা
কাকুয়া মোর বহিনিক সাগরে ভাসালে জলা কারুয়া।

৩। ঝিলি কিতে মিনি আসেবে বাবা
কাজিয়া লাগা মজরিতে আসেবে বাবা।

৪। কলাওলাকে সারি সারি
(কলাগাছ) বাগুরায় ঘেরাইছি বাড়ি
কলা কাটে দেবে ভাউজ লুভা
দেখা যাউক তোর বাড়ি
আগে যাবে দান দেহেজ
পিছে যাবে গাড়ি
তার পিছনে চলে যাবে
জমিদারের বেটি।
ভায়ে দিলে শাড়ী বালাউজ রে
বাপে দিল দীঘি
দীঘিতে বসি গেলি নানা জাতীর পাখী।

৫। সিন্দুর নাইবে ভাউজ লুভা নাই দিব সাধী
সিন্দুর বাদেরে শাশুড়ীর যাইমুই কেনে
শাখা নাইরে নাই রে যে ভাউজ লুভা
তাই ভাবি মাইর বাপীর আগা
কিনা জবাব করবো।
বাবার সোনার পিবাত অগর চন্দন

৬। রূপার পিবাত কাচাই
বাবার বাপে হইছে এ গাঁয়ের মোড়ল
বাবার রূপ দেখিয়ে কাচা হলদি কবে ঝিকিমিকি
রূপ বহস পরে বালাহীর উপর
কাহানে গিয়াছে বরের ভগীনপতি
আচলে ঘেরি রাখুক রূপোক।

মোহনপুরে আমরা হোলির গান পেয়েছি।

হোলির গান

১। কুন ছলে লাগালো পিরতী
মন মোব কোসোরে উদাসী
ভাতো নানিতে সিটি
মালোরে উদাসী
কুন ছলে লাগালো রে পিরতী।

সাধুতত্ত্বের গান ঃ

গুরুশিষ্যে যাই ভাই রামকেলের মেলা
শিষ্য বেটিটাক লইছু সঙ্গে করিয়া।
আগে আগে গুরু যায়
মধ্যে জল সরি
তাহার পিছনে জলসরির স্বামী।

এই মোহনপুর গ্রামেই আমরা ক্ষিরিমোহন সিং নামে এক সাপুড়িয়ার বাড়ীতে গিয়ে কিছু সাপের মন্ত্র পেয়েছি। এই মন্ত্র সাধারণত গোহমা সাপ ও বোড়া সাপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।
সাপধরার মন্ত্র—

তন্ত্রগুরু মন্ত্রগুরু আখিয়া নিরঞ্জন গুরু
গুরু মানে বিনা ভাপসে
পড়ল দেবীর পড়ল ভাক্কাশা
মায়া করে ছল বল অমৃত ধমসা।

বিষ ঝাড়ার মন্ত্র—

আখানিয়ে আখতুলে দিনগুনে কানাই গো
আনিলাম চেয়ারির পাত, কাটিলাম ডাইনে বুড়ীর বাণ
আয়গুরু হয় ময়া করে ছল বল
একেক কক্ষে একেক দুপুর বেলা
কে মরল গায় ঢিলা
ইকথা হলো ফেলো
শিবদুর্গার দুপায়ে মোছো, জয়মা বিষহরি !

এই জাতীয় আর একটি গান—

বিষে বিষে সোজী মাতা বিষে কর আজারে
বিষ খায় বিষ্ণু জাগে যেদিন বিষ
বিষ্ণুনি পাবে
সাত কুটুর মাথা ঠুকে, বিশ মোরা
হারারে, জয়মা বিষহরি।

করনদিঘী থানার মোহনপুর গ্রামে আমরা একটি কেচে বা বহে সম্প্রদায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সেখানে বাড়ীর মেয়েরা আমাদের গান শুনিযেছিল এবং তাদের বিবাহের দেওয়াল চিত্রের নমুনাও তারা আমাদের দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু জানতে দিতে অস্বীকার করে।

করনদিঘী জায়গাটির নামকরণের পিছনে একটি কিংবদন্তী আছে। রাজা কর্ণদেব এই দিঘী খনন করিয়েছিলেন। রাজা কর্ণদেবের নামে তাই এই দিঘীর নামকরণ হয়েছে। গল্পটি এইরকম—কোন এক সময় এক শাপগ্রস্ত দৈত্য এই জায়গায় এসেছিল তার শাপমুক্তির জন্য। তার কাছে একটি মন্ত্রপূত জলের ঘট ছিল। ঘটের সেই জল দৈত্যের গায়ে ছিটিয়ে দিলে দৈত্যের শাপমুক্তি হবে। দৈত্য সেই জল নিয়ে কয়েকজন মানুষের কাছে গিয়ে এই অনুরোধ করেছিল। কিন্তু সেই সমস্ত গ্রামের মানুষেরা দৈত্যকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল এবং পালানোর সময় তাদের পায়ের ধাক্কা লেগে জলের ঘটটি পড়ে যায়। যার জন্য দৈত্যের শাপমুক্তি আর হলনা। আজ অবধি সেই গল্প প্রচলিত আছে। বৈশাখ মাসে মেলার সময় দৈত্যের কথা মনে রেখে দিঘীর মাঝখানে একটি বাঁশ পোঁতা থাকে। মনে করা হয় দৈত্য সেই দিঘীতেই থাকে।

মেলার সময় এখানে রাজা কর্ণদেবের পূজো হয়। অনেকে এখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানত করে। মানত সফল হলে দিঘীতে কবুতরের বাচ্চা, সোনা, রূপা, বা ফলমূল প্রদান করে।

মোহনপুরে আমরা এই গানগুলিও পেয়েছি।

চন্দ্রলেখার গান ঃ

আশ্বিন মাসে ২৫ জন মিলে সারারাত ধরে করে এই গান করে।

হীরালাল—শুনডে মতি আমার কথা
এখন হল নতুন মাতা
নতুন মাতা দেখিতে না পারে রে
ও ভাই মতি।

চন্দ্রলেখার গান—

কী দোষ করেছে ছেলে
বল কথা প্রকাশ করে
বল কথা প্রকাশ করে গো
শ্বশুর বাবা।

চন্দ্রলেখার গান—কী দোষ করেছে স্বামী
বল কথা আমি শুনি
বল কথা প্রকাশ করে
শ্বশুর বাবা।

হীরালালের বাবার বিয়ে দুটো ছেলে বড় হবার পর মা মারা গেছে। নতুন মা এসেছে। নতুন মা শুয়ে আছে। ছেলে দুটো খেলা করছে :—

হীরালালে মতিলালে
তারা দুভাই রাত্রিকালে
আমার সঙ্গে করে বলদ জোড় গো
প্রান স্বামী।

আমাদের আজকের শিবিরে সৎসঙ্গের শিষ্যা শ্রীঅমিতাভ ঘোষ এবং জগদীশ সিনহার অক্লান্ত ও সহৃদয় সহযোগিতায় আমাদের কাজ অনেক দ্রুত এগিয়ে নিতে পেরেছি। তাঁদের কথা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে।

ক্ষেত্র - গবেষণা

বিভাগ—ঘ

কর্মশালার বিবরণ

Folk lore is the total creatr of the life practice and the ideational-pursuit of mainly collective spontaneous and anonymous effort of an integrated society ; it is fundamentally distinguished in its features, more or less, from the cultural effort of the so-called unsophisticated primitive society and sophisticated one, basing mainly on tradition and independent of formal training it is manifested in oral and gesture language, art and craft, costume and culinary, tune and melody, signal and symbol, sports and drama, charm and cure, custom aud ceremony, belief and superstition and rity, fair and festival' etc. though incases, it develops in creative proces or disappears in forgetfulness, yet, on the whole implanting its roots in the past and illumining the reality of dynamic time in the evolutionary process it extends its conti nuity in future in the interaction of social relation"—এই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস পোষণ করে বৃষ্টি-ধৌত সূর্য-স্নাত ৭।৫।৯০ তারিখের সকালে আমরা ছ'জন নিশীথ, অখিল, পারমিতা, মধুমিতা, যশোদা ও সাহেরা আমাদের পথ নির্দেশক ও বন্ধু যজ্ঞেশ্বর দাদুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবু থেকে শুরু করি লোকসমাজের নিভৃত কোণে লুকিয়ে থাকা বিবিধ তথ্যাবলী অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় উপস্থিত হই পাত্নার গ্রামে। ছোট্ট মুসলমান প্রধান গ্রাম। গ্রামের প্রবেশ পথেই দৃষ্টিগোচর হলো মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন একটি মসজিদ। লোভ সংবরণ করা গেল না। পরিচিতি ঘটালাম ঐ মসজিদ কমিটির অন্যতম সদস্য মহম্মদ রফিক আলম মহাশয়ের সাথে। বয়স একত্রিশ বছর, পেশায় কৃষক, সুগঠিত চেহারা, আলাপচারিত ক্রমশঃ উদ্দেশ্যের ভেতর প্রবেশ করতে শুরু করে। অন্যদিকে আতিথেয়তাও থেমে থাকে নি। মসজিদ সম্পর্কে জানতে উৎসুক শুনে তিনি শুরু করেন মসজিদের জন্ম ইতিহাস। ৩৫ বছর পূর্বে মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁরা এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। উক্ত অঞ্চলের তৎকালীন ভূ-স্বামী ছিলেন ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়। তিনিই রফিক আলম ও সম্প্রদায়কে বসবাসের জমি দান করেন। মানুষ স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ জীব। যে কোন জায়গায় বসতি স্থাপনের পরেই প্রয়োজন হয় ধর্মচর্চা করার অনুকূল পরিবেশ। হিন্দুরা চায় মন্দির গড়ে তুলতে, মুসলমানেরা চায় মসজিদ। এই নিয়মেই আমাদের মসজিদটি গড়ে ওঠে। তবে আজকের মসজিদের যা চেহারা ৩৫ বছর পূর্বে তা ছিল না। উপাসনা পদ্ধতি জানতে চাওয়ায় রফিক বাবু জানান: শরীয়তী মতে প্রত্যেক দিন পাঁচ অক্ত নমাজ হয়। প্রথমে পবিত্র হয়ে তাঁরা মসজিদে প্রবেশ করেন। শুরু হয় আজান। আজানের উচ্চগ্রাম ভেসে ভেসে প্রত্যেকটা গ্রামবাসীকে সচেতন করে তোলে। সকলে এসে মিলিত হয় মসজিদে আল্লার কাছে শুভ প্রার্থনা জানাতে। তারপর প্রথমে উজু করে অর্থাৎ হাত পা ধুয়ে মসজিদের ভেতরে

প্রবেশ করে। শুরু হয় নমাজ, সূর্যোদয়ের কিছু পূর্ব থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মোট পাঁচবার এই নমাজ হয়। শরীয়তী মুসলমান সমাজের ধর্মীয় রীতি কিভাবে প্রতিপালিত হয় তা জানতে পেরে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি আর একটু ভারী হলো বৈকি!

এবার কথা বলা শুরু হলো ঐ গ্রামেরই স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত এক যুবা পুরুষের সংগে যে সবে মাত্র কুড়িটা বসন্ত পার করেছে। নাম আব্দুল রেজ্জাক। রাজমিস্ত্রি। শুরু হলো অন্য পালা। আসুন আমরাও লোক সংস্কৃতির এক অন্যতম উপাদানের রস গ্রহণে অংশ গ্রহণ করি। কাল্পনিক হলেও যার স্বাদ আমাদের মনের ক্লেদ, গ্লানি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। এক অনাবিল মানসিক আনন্দে আমাদের হৃদয় নেচে ওঠে। বলতে চাইছি উপকথার কথা। উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করাই বিজ্ঞানসম্মত।—

উপকথা

(১) কপাল পরশন হতে গেলে পথে পায় সোনা।
ঘরের নারী জল খাবার দিলে মরে চার জনা॥

—কোন এক গ্রামে এক কাঠুরিয়া থাকতো। প্রত্যেক দিন বনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে এবং তা বিক্রয় করে যা উপার্জন হতো তা দিয়েই সংসার চালাতো। বাড়ীতে একমাত্র তার স্ত্রী। সে কিন্তু কাঠুরিয়াকে স্বামী হিসাবে পেয়ে সুখী নয়। তাই সে অন্যাসক্তা, কাঠুরিয়া বনে বেরিয়ে গেলেই কাঠুরিয়ান মজে যেত প্রেম সাগরে তার প্রেমিকেব সংগে। কিন্তু প্রতিদিন এভাবে চলা সম্ভব নয় ভেবে উভয়েই কাঠুরিয়াকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে। তাই একদিন বনে যাওয়ার পূর্বে কাঠুরিয়াকে যে খাদ্য বেঁধে দিত সেই খাবারের সংগে বিষ মাখিয়ে দেয় কাঠুরিয়ান। কাঠুরিয়া কিছুই বুঝতে পারলো না। সে খাবার গাছের ডালে বেঁধে দিয়ে কাঠ কাটতে শুরু করে। সেই সময় ঐ পথে কাঠুরিয়ার চার বড় কুটুম চুরি করে ফিরছিল। উল্লেখ্য কাঠুরিয়ানের চার ভাই-এব জীবিকা নির্বাহের পথ ছিল চৌর্যবৃত্তি। চুরি করে ফেরার পথে তারা ক্ষুধাতুর হয়ে পড়ে—সেই সময় তাদের বহ্নুর এ বনে কাঠ কাটতে আসার কথা মনে হলো। এবং তার কাছে গেলে খাবার পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল। তাই তারা চার ভাই মিলে বহ্নুকে খুঁজে বের করে খাবার চাইলো। কাঠুরিয়া তাদের চার ভাইকে নিজের খাবার ভাগ করে খেতে বলে। চার ভাই খাবার খেয়ে নদীতে জল খেতে গিয়ে মারা গেল। এদিকে চার ভায়ের চুরি করে নিয়ে আসা কাঁসার বাসনগুলো কাঠুরিয়া দেখতে পেল। কিন্তু চার জনের চুরি করা মাল একা নিজের কাঁধে তুলতে গিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। কাঁসার বাসনের ঝন্‌ঝন্ শব্দ ঐ বনে বাস করে এমন একটি বাঘের কানে গেল। বাঘ তখন কাঠুরিয়ার দিকে ছুটে এলে কাঠুরিয়া নিকটবর্তী একটি গাছে উঠে যায়। এই দেখে বাঘ হমকাড় ছাড়লে কাঠুরিয়ার হাত থেকে তার কুড়ুলটি বাঘের উপরে পড়ে গিয়ে বাঘ মারা

যায়। কাঠুরিয়া তখন অল্প কিছু বাসনপত্র নিয়ে বাড়ী ফেরে। এদিকে সেই সময় কাঠুরিয়ান ও তার প্রেমিক প্রেমের রসে পাগল পারা। কাঠুরিয়া বাড়ীর দরজায় এসে কাঠুরিয়ানকে দরজা খুলতে বলে। কাঠুরিয়া ফিরে আসাতে কাঠুরিয়ান ও তার প্রেমিক রীতিমতো ভীত হয়ে পড়ে। কারণ তারা ভেবেছিল বিষ মাখানো খাবার খেয়ে কাঠুরিয়ার মৃত্যু হয়েছে। এই অবস্থায় কাঠুরিয়ান তার প্রেমিককে গোয়াল ঘরের খিড়কি পথ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় গোয়ালে বাঁধা থাকা জব্বর ষাঁড় গরুটি গুঁতো মেরে তাকে মেরে ফেলে। কাঠুরিয়ান এই দৃশ্য দেখে নিজের দোষ ঢাকার জন্য চিৎকার শুরু করে এবং তার প্রেমিকের হত্যাকারী হিসাবে তার স্বামীকেই দায়ী করে গ্রামের জনসাধারণের সামনে। কাঠুরিয়ার যারা দুশমন ছিল তারা থানায় গিয়ে খবর দিলে পুলিশ কাঠুরিয়াকে বন্দী করার জন্য আসে। সেই সময় কাঠুরিয়া কাহিনীর প্রথমোক্ত শোলোকটি বলে।

এই উপকথার উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে শোলোক দিয়ে কথা শুরু হয়েছে সেই শোলোক দিয়েই শেষ হয়েছে। এ যেন অনেকটা অনেক আধুনিক উপন্যাসের সূচনা ও উপসংহারের মতো।

পাতনোর গ্রামকে বিদায় জানিয়ে এবার চলা শুরু হলো তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাল্‌মার উদ্দেশ্যে। পাতনোর থেকে হাঁটা পথে তিরিশ মিনিটের পথ। দুই গ্রামের মধ্যবর্তী অংশে এক বিরাট আমবাগান। সেই বাগানের শীতল ছায়ার মাঝখান দিয়ে একটা কাঠের তৈরী সাঁকো পার হয়ে এক ঝাঁক খর রোদ মাথায় নিয়ে প্রবেশ করলাম উদ্দিষ্ট গ্রামে। উঠলাম ঐ গ্রামের রবিলাল দাস মহাশয়ের বাড়ী। যাঁর পেশা চাষবাস বয়স ৫৫ বৎসর। গ্রামে রাজবংশী ও যাদব শ্রেণীর প্রাধান্য। পূর্ববঙ্গ থেকে আগতদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় এদেরকে 'বুনা' নামে পরিচিত।

বাবুলাল দাস—সুঠাম শরীর। এই বয়সেও রীতিমতে যুবা-পুরুষ। সব থেকে বড় জিনিস তিনি যেন রূপকথার খনি। শুরু হলো গল্প বলা।

(১) এক বামহন ও এক বামহনী ছিল। বাড়ীতে চাল ডাল না থাকাতে বামহনী বামহনকে বুজনা করতে যেতে বলে। বামহন বুজনা করতে গিয়ে দুদিন পর ফিরে এলো। বামহনীকে রুটি বেলতে বলে বামহন ঝারা করতে চলে যায়। আসলে সে ভাননা ঘরের কোনে বসে থেকে বামহনীর রুটি বেলা দেখছিল। বামহনীর রুটি করা শেষ হলে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। বামহনী বলে তুমি তো বুজনা করতে শিখেছো— বলতো আমি কটা রুটি করেছি। এর উত্তরে বামহন বলে—ঠগ, ঠগস্তি রুটি গস্তি বামহন রুটির ঠিক সংখ্যা বললে বামহনী তার স্বামীকে প্রকৃত পণ্ডিত বলে মনে করে।

এক ধোপার গাধা হারিয়ে যায়। ধোপা বাম্‌হনীর কাছে এসে তার গাধা হারানোর কথা বললে বাম্‌হনী বাম্‌হনকে বুজনা করে গাধাটি কোথায় আছে বলে দিতে বলে। বাম্‌হন ৫০০ টাকা এই কাজের জন্য দাবী করে। ধোপা রাজি হয় টাকা দিতে। এই সময় বাম্‌হন ঝারা ফিরতে গেল। ঝারা ফিরার সময় সে বলে—

ঠগ্‌ ঠগস্তি রুটি গস্তি
ঝারা ফিরতে গাধা দেখি—

এই বলে সে বুঝনা করতে থাকে। গাধাটা রহিল (অড়হর) গাছের মধ্যে ছিল। বুঝনা করার সময় বাম্‌হন তা দেখতে পায়। ফলস্বরূপ ধোপা গাধা ফেরৎ পেল এবং বাম্‌হন তার প্রাপ্য টাকা পেল।

এই ঘটনায় বাম্‌হনের উপর বাম্‌হনীর বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল, বাম্‌হনী প্রকৃতই বাম্‌হনকে পণ্ডিত বলে মনে করে।

সেই দেশের রাণীর চন্দ্রহাব একদিন হাবিয়ে যায়। রাজা ঘোষণা করলেন যে এই হার কোথায় পাওয়া যাবে বলে দিতে পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। বাম্‌হনের কথা জানতে পেরে রাজা তাকে ডেকে পাঠান। বাম্‌হন তো পড়ে বিরাট বিপদে, কারণ পরপর দুটো বিপদ থেকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য রেহাই পেলেও এবার সে-সম্ভাবনা একদম নেই ভেবে সে ভীত হয়ে পড়ে। রাজা একটা চেম্বারে বাম্‌হনকে ঢুকিয়ে ভেতরে খাওয়ার দিয়ে বাইবে থেকে বন্ধ করে দেয়। বাম্‌হন নিজের মূর্খতা মনে মনে করছে আর বলছে—

ঠগ্‌ ঠগস্তি রুটি গস্তি
ঝারা ফিরতে গাধা দেখি।
আইসে নিনিয়া আইগে মুনিয়া
কাল হায় তো ধুবিকে পিরহা। (পাটি)

নিনিয়া নামে ঐ রাজার বাজ্যে এক লড়কি ছিল, এই কথা শুনে নিনিয়া ভীত হয়ে সোনার হার সে চুরি করেছে স্বীকার করে। রাণী সোনার হার ফিরে পেল। এবার রাজা বাম্‌হনের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য আর এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। একটা মাটির হাঁড়িতে একটা ফতঙ্গি (ফড়িং) রেখে মুখটা ঢাকিয়ে তার মধ্যে কি আছে বাম্‌হনের কাছে রাজা তা জানতে চান। এই সমুহ বিপদের মুখে ভীষণ ভীত হয়ে বাম্‌হণ আবার সেই শোলোক বলতে আবম্ভ করে—

ঠগ্‌ ঠগস্তি রুটি গস্তি
ঝারা ফিরতে গাধা দেখি
আইসে নিনিয়া আইগে মুনিয়া
কাল হায় তো ধুবিকে পিরহা,
আজ ভর ফতঙ্গি। (শেষ করে দেওয়া)

এই কথা শুনে রাজা সত্যই বুঝতে পারলেন যে, বাম্‌হনের পাণ্ডিত্য অসাধারণ। আর বাম্‌হনও নিজের অজ্ঞাত সারেই মুক্তি তো পেলই এবং যথোচিত পুরস্কারও পেল।

প্রদত্ত গল্পটির মধ্যে বাম্‌হন কি বিপদ থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা না করলেও সে কিভাবে মুক্তি পেল তা তার অজানাই থেকে গেছে। এখানে যেন বাম্‌হন কথিত শ্লোকটিই বাম্‌হনের ত্রাণকর্তা, রূপকথার এটি একটি বিশিষ্ট রীতি।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পেলেও অনেক সময় পাড়া গ্রামের শিশুদের কান্না আর থামতে চায় না। তাই সেই কান্না থামানোর জন্য লোক সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট উপাদানের আশ্রয় নেয় লৌকিক মানুষ। বলতে চাইছি ছড়ার কথা। আসুন না আমরাও ছড়ার সহজ সরল বিষয় বস্তুগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে লাভ করি এক পুরাতন অথচ চিরনূতন আনন্দ।

১) এক তারো, দুই তারো
তারোর বেটি মোতি হারো
চলগে বেটি জল ভরিবা
জলের টুবুভটি টুবুভ।
ঐ দাদা দেখা যায়
শিমলের গাছ।
শিমলের গাছ ত চৌদ্দ ঘর।
পতিগে ঘিন কলো
পাদিয়ে গনাই দিল।

২) নিন্দ্ মুসিগে নিন্দ্ দিয়ে যা
গোটা বটি পান্‌লা মুখ ভরে খা।
আইরে চান্ আয়
সুহুর টিকিত্ পোর।
—খেলার ছড়া।

৩) এদেগ বেদেগ ধোকে মালা
কে কে যাবেন বামুনতলা।

৪) টুম্পা রে টুম্পা সাঁতরির টুম্পা
কে কে যাবেন বামুনতলা
বাপ ছোড়েন কবিথান
তরে উঠে ঠ্যান্ খান্।

ছড়া আর ভালো লাগছে না? তবে চলুন এক মুসলমান সমাজের বিয়ের আসরে। নিশ্চয়ই ভালো লাগবে—

১) বারো বৎসর ধরে ভাব করে
মা-বাপে দিলানা বিয়া,
শুনরে আলি তোমারে বলি
দুজনে মিলে বিয়া করি।
মাও শুধায় বাপে শুধায়
চুল বেঁধে রিক্সায় চেপে যাচ্ছ কোথায়?
চুলও বেঁধে রিক্সায় চেপে চলে যাবো কোর্টের ঘরে।
উকিল দাদা হাকিম দাদা বিয়ে করে দে মোরে।
শিশুর ছেলে বাচুর মেয়ে বিয়ে করা হবে না তোদের।
দুজন মিলে হাত ধরে চলে যাবো দোকান ঘরে।
দোকানী দাদা দোকানী দাদা বিষ কিনে দে আমারে
তুমি খাবে গ্লাসে করে আমি খাব বোতলে
একই সঙ্গে মরে যাবো দুজনে মিলে।

—গানটিতে আধুনিক বিষয়ের প্রাধান্য ঘটেছে।

(২) জোড় হিমানি জোড় পাউডার
আনিবে যাহাতে
চ্যাপ্টা করে বিয়ানি বাঁধিব
নন্দুর কাঁটাতে।
নন্দু তোমার ভালোবাসা
নন্দু গলাব হার
নন্দুর সঙ্গে চলে যাবো
আসিব না আর।
পাকার ঘরে নাচ করিব
ছিটের মশারী।
নন্দুর সঙ্গে চলে যাবো
আসবো না বাড়ি।

(৩) কোন বনে ক্যাশা বনে বাঁশরী বাজায়
কাঁকে কলস নিয়ে যমুনাতে যায়।
ছাড়ো বন্ধু ছাড়ো বেলা চলে গেল
আমার কাঁকের কলস সেও ভেসে গেল।
বাড়ীতে আছে শাশুড়ী ননদ কি দিয়ে বুঝাব।

(৪) আমি কার গলায় মালা দিব গাঁথিয়া
বিদেশেতে গেল আমার পিয়ারা।
শিকের উপর দুধের বাটি
তাতে আছে মণ্ডা দুটি
বিদেশেতে গেল আমার পিয়ারা।
ঘরে আছে শিকল চৌকি
তাতে আছে শীতল পাটি
ও কি বিছাইয়া
বিদেশেতে গেল আমার পিয়ারা।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ের ভোজে উদর পূর্তি হলো না তাই না? চলুন তাহলে যাই রাজবংশীদের বিয়ে বাড়ীতে—

বিয়ের পূর্বে ডালা নিয়ে মন্দিরে যাওয়ার গান—

(১) কালো কালো কুয়ালি গে
ঘন বলে কুয়ানি বলি
যাছে অনেক দূরে।
এ কুয়ালিক মারিলেন গে
কে কুয়ালিক ধরিলেন গে
কে কুয়ালিক উজারালেন বাসা গে।
হাসে কুয়ালিক মারিলুন গে
হাসে কুয়ালিক ধরিলুন গে
হাসে কুয়ালিক উজারিন বাসা।

হলুদ কুটার সময়

যেধিন কামায় কুটে গে
কঠিন শীতল পাটি
এতে আই মাই রহতে গে
কাঁসায় হলো মোর চুরি কি।
ছাবো ছাবো ভগিন্ পতিহে
কাহার কছায় মেলে কি
ছাবিতে চুলিতে হে ভগিনপতির
কোছায় মিলে কি।
মারো মারো ভগিন পতি হে
সুরতি নঠাই একি।

সিন্দুর দান

অ্যালক্যাটা ব্যালক্যাটা
সিন্দুর না দিসরে বান্দর মোহা
আমার মায়ের সরু সুতা রে বান্দর মোহা

বর কনের বিদায়ের কথা

এগুন কান্দে ধুপু ধুপু
লোক বহুত গে
কাহা পরে কাহারো চোখের লোও খে।
আপনারে যায়ো পরে গেলি মনে খে।
পরে গেলি লয়তন চোখের জলগে
বাজেন গে বৌটি দূরে শশুরালিকে দিবে।
মায়ো বলে ডাকো গে
আমি মুখে মাপে বছর ছয় মাসো গে।
তেনে দিমু মায়ো বলে ডাকো গে।

গান গান গান। পরিবেশটা একঘেঁয়েমিতে ভরে উঠছে। অন্য কিছু পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন, তাই না? আসুন, তাহলে প্রবাদ নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করা হোক—

(১) ধাতিঙ্গা মরট্ট কুনে কামেরিনি।
(২) বেজায় চিথগি চিথগি বাত্‌লা বলিস।
(৩) ঘরতমি ভাত ধাপর চুলো
ঘরে ঘরে বেরায় ধুতি ঝোলা।
(৪) ঘরতমি লাত্তা খাবার চাহাছিস কালকাত্তা।
(৫) মরোয়ার খুনি মকরধ্বজ।
(৬) পুনিত নিরুয়া ধান কিনবা যাইস বনগুয়া।

ছড়া, গান, প্রবাদ সবাই তো এসে তাদের রূপ সৌন্দর্য দেখিয়ে গেল। এবার আমন্ত্রণ জানানো হোক ধাঁধা-কে—

দ্রব্য সামগ্রী বিষয়ক ধাঁধা

(১) চার ভাই চানেপা
মাথা নাইরে বাপেপা।—চৌকি

বিবিধ ধরনের ধাঁধা

(২) আমি থাকি ডালে তুমি থাকো জলে তোমার সাথে দেখা হবে মরন্তিকালে।—মাছ ও লঙ্কা।

(৩) এক কলসিতে দুরকম জল।—ডিম।

(৪) এ্যালের এ্যাল বনের বন জলের ভক্ত তিন ব্যাটায় শক্ত।—সাপ, বাঘ, কুমীর।

(৫) ইচ্ছু গেলাম বিচ্ছু শেলাম, শেলাম কোলকাতা এমন জিনিষ দেখে এলাম ফুলের উপর পাতা।—গিমাশাক।

(৬) মাথা ধরলে বমি করি।—কলমি।

(৭) শ্বশুর বাড়ী গেলে কিসের গলা ধরে।—বদনা।

(৮) একটুকু লত্তা যাই কোলকাত্তা।—রাস্তা।

(৯) এক জিনিষ দেখে এলাম নাওরের ঘাটে এক সন্তান দুই মায়ের পেটে। —ঝিনুক।

(১০) আশমান ঝুরঝুর মালিক লতা এ ফুল তুমি পেলে কোথা।—শিলাবৃষ্টি।

(১১) একমায়ের ভাইবোন হীরা-সতা-গোন রক্ত নাই মাংস নাই যাকে আজ্ঞা করে তখন হয় ভাম।— দেশলাই।

(১২) বিজু বান ইজু বান চারভিতি মুখবন্ধ।—ডিম।

(১৩) উঠ, বুড়ি মুই বসিহি—বের। (টাটি)।

(১৪) উপরসে পড়িল ধুম
ধুম কহে মোর পাদটি সুণ্ড।—তাল।

(১৫) হিড্ হিড্ গোটা ধর জলে গেল
পুনির ভিতি জিভ।—ঘাস।

(১৬) ঠ্যাং দুইখান মেলয়ে
মধ্যে দিলাম ঠেলিয়ে
দিমাক দিলে হয়
যে কথাটা মনে করিস
উতি কথা নি।—যাঁতি, সুপারী।

(১৭) ইঘর যায় উঘর যায়
চিব্‌তার মার খায়।—ঝাঁটা।

(১৮) একশো ফারি বাড়ো ভাই
আধখানা ভাগ পাই।—সুপারী।

(১৯) মা কাকরি বেটি সুন্দরী।—লংকা।

উল্কা দানের ছড়া—কালী পূজার সময় পূর্বপুরুষদের আত্মার মুক্তির জন্ত এই ছড়াগুলি বলা হয়। পাটকাঠি যাকে এখানে সিন্টি বলা হয়। পাটকাঠি বা সিন্টি উলুখড় দিয়ে বেঁধে বংশের সকল পুরুষেরা অগ্নি সমর্পণ করে। মাত্র দু-এক লাইনের ছড়া।

উদা—(১) নান গে দাদগে আলোলে

(২) আম গাড় কাঠাল গাড়
রাজার বেটিক বিহা কর।

দ্বিতীয় লাইনটি বলার সময় সিন্টির অবশিষ্ট অংশ মাটিতে রোপন করা হয়।

ডাকের ছড়া—লক্ষ্মী পূজার সময় আমনের জমির লক্ষ্মী কোণাতে লক্ষ্মীর আহ্বানের ডাক দেওয়া হয়। বিকাল বেলাতে এটা করা হয়।

সাধারণত জমিতে যেন ভাল ফসল হয় এই কামনাতেই এটা করা হয়ে থাকে।

উদা—হাসের ডিমা কচুর ফুঁতি
আয় লক্ষ্মী মা মোর ভিতি (দিকে)।

ঐ একই সময়ে জমিতে যেন পোকা মাকড়ের উপদ্রব না হয় তার জন্ত—

চিং ফড়িঙ্গা দূর পালা
ইন্দুর ধরিয়া দূর পালা
আয় মা লক্ষ্মী মা ঘোর ঘোর সোনা

এছাড়া আপনার জমিতে অধিক ফসল হয় ও অন্তের জমিতে যেন তার বিপরীত হয় তার জন্যও লক্ষ্মীর আহ্বান করা হয় ও বলা হয়—

কার ধান আউল-বউল
মোর ধান দুধের চউল।

বাড়ীর প্রধান পুরুষ সাধারণত এটা করে থাকেন।

উল্কা দানের ছড়া ও ডাকের ছড়া পেয়েছি পালসার অসীমকুমার দাস ও জগদীশ দাসের কাছ থেকে।

ওড়ানি সরি (পালা গান)—কালী পূজার সময় দশ বারো জন খোল করতাল বাজিয়ে গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে গেয়ে বেড়ানো হয় ও বিনিময়ে চাল পয়সা ইত্যাদি নেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর কারো বাড়ীতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে এই পালা গান কাহিনী আকারে গাওয়া হয়। এরা যখন বাড়ী বাড়ী গিয়ে গাওয়া হয় তখন তার শেষ ও শুরু থাকে না। কিন্তু রাত্রি বেলায় গ্রামের কোন বাড়ীতে যখন খাওয়া দাওয়ার বিনিময়ে গাওয়া হয় তখন তার শুরু ও শেষ থাকে। রাজবংশীদের মধ্যেই এটি সাধারণত প্রচলিত। তবুও দেখা যায় আনন্দের টানে যে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরাও অংশ গ্রহণ করতে পারে।

সরি অর্থে মেয়ে বোঝানো হয়েছে। ওড়ানি সরি নামক একটি মেয়ের সঙ্গে ভলা সরা নামক একজন পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে এই পালা গানগুলি রচিত হয়েছে।

এই ভলা—ওড়ানির মামা।—

উদা—ওরে মোর নামটা ওড়ানি সরি—ওড়ানি সরি ঘরে বসে করিমু কি।

বলছে—

থার করিমা যাছি মুই ঐ রাজার দীঘি
থার করেছ, এমন তেমন মনটা বুজছে
ভলা মামার লাগাল পাইলে বসে গল্প করিমু।

ভলা সরা বলছে—

মোর নামটা ভলারে সরা
ঘরে বসে করিমু কি।
গরু বান্ধিবা যাছিরে মুই ঐ রাজার দীঘি
গরু বান্ধি মুই যেমন তেমন মনট বুঝামু
ওড়ানি সরির লাগাল পাইলে গল্প করিমু।
ও মোর নামটা ওড়ানি সরি
ঘরে বসে করিমু কি।
ছাগল বান্ধিবা যাবরে মুই ঐ রাজার দীঘি
ওকি মুই মোরিবে ছাগল বাঁধিমু এমন তেমন
মনটারে বুঝামু
ভলা মামার লাগাল পাইলে
সল্পকে করিমু।

তখন—সরা (ভলা) বলছে—

মোর নামটা ভলারে সরা
ঘরে বসে করিমু কি।
হাল বাইবা কছু মুই ঐ রাজার দীঘি
ওকি মুই মরিরে হাল বহিমু যেমন যেমন
মনটারে বুঝামু।
উড়ানি সরিটার লাগাল পাইলে
গল্পরে করিমু।

এইভাবে সরি ও সরার উক্তির দ্বারা পালা গান এগিয়ে যায়।

উল্লেখ্য উরানি সবি বলভাই গানেরই অংশ বিশেষ।

লৌকিক নাটক :—রেবতী পালা

যার কাছ থেকে পেয়েছি তার নাম ধনলাল দাস। বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ বছর। ওর কাছ থেকে আমরা দুটি পালা নাটক পেলাম। (১) রেবতী (২) পুন্নিমা (পূর্ণিমা)। রেবতীর কাহিনীটা এরকম—রেবতী নামে একটি মেয়ে বনে ফুল তুলতে গিয়েছিল। এমন সময় বনের পথ দিয়ে ঐ দেশের রাজা যাচ্ছিল, রাজা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু এটি সম্ভব ছিল না। কারণ রেবতী ব্রাহ্মণের মেয়ে। রাজা জোর করে রেবতীকে ধরে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে রেবতীর বাবা খবর পায় ও রাজার কাছে যায়, এবং রাজাকে জিজ্ঞাসা করে কেন তার মেয়েকে ধরে এনেছে! ইতিমধ্যে রেবতীকে ধরে আনার জন্য রাজার ভাই-য়ের সঙ্গে রাজার বিরোধ বাধল। বিরোধের ফলে রেবতীর সঙ্গে রাজার আর বিয়ে হল না। রেবতীর বাবা রেবতীকে বাড়ী নিয়ে যায়। কিন্তু রাজা রেবতীর আশা ছাড়তে পারে নি। সে রেবতীর উপর অত্যাচার করার চেষ্টা করে। রাজার ভাই-য়ের সঙ্গে আবার বিরোধ ও রাজার মৃত্যু দণ্ড হয়।

এর পূর্বে যে অংশটুকু হয় তাতে দেখা যায় সম্ভ মাতৃহারা রেবতী বিলাপ করছে এবং তার বাবা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। রেবতীর বিলাপ—

মা আমায় আমায় ছেড়ে
মাগো গেছ পর লোকে
মায়ের লাগি মন কাঁদে হায়
মরি মন দুখে ওগো মন দুখে

বাবা এই ভাষায় সান্ত্বনা দেয়—

কাঁদিস না মা মামা বলে
তোর মা কাঁদে পর লোকে
কাঁদিস না মা মামা বলে
ওরে তোর মার কি তোর-ই হ'ত
তুমায় ছেড়ে কেন যে'ত
মা আর তুই কাঁদিস না মা

এর পর বাবা রেবতীকে বলে—আচ্ছা মা তুই এবার ফুল মোচন করতে যা। রেবতী ফুল মোচন করতে যায়। যার পরবর্তী ঘটনা আমরা পূর্বে ব্যক্ত করেছি।

পুন্নিমা :—(পূর্ণিমা) নামক লৌকিক নাটকের (পালা) কাহিনী—

* * *

নবকুমার একজন সামন্ত রাজা। তার সঙ্গে বিয়ে হয় পুন্নিমা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। পুন্নিমা ছিল অসাধারণ সুন্দরী এবং গুণবতী মেয়ে। কিষণলাল নামে নবকুমারের এক সেনাপতি ছিল, পুন্নিমার রূপ দেখে কিষণলাল মুগ্ধ হয়। সে নবকুমারকে হত্যা করার চেষ্টা করে। নবকুমারকে নিয়ে মৃগয়ার ছলে বনে যায় এবং খাবারের সঙ্গে বিষ

খাওয়িয়ে খাইয়ে নবকুমারকে মেরে ফেলে। মরবার পূর্বে নবকুমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলে যান কিভাবে কিষণলাল তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে। নবকুমারের দেহ দাহ হয়ে যাবার পরে এক সন্ন্যাসী তাকে প্রেতাত্মা রূপ দেয়। পুন্নিমা মনের দুঃখে সমুদ্দরের ধারে চলে গেলো পূজা পাঠ করে থাকবার জন্যে। মনের ইচ্ছা এই যে সে আর কোনদিনও কোন পুরুষের মুখ দেখবে না। এদিকে নবকুমার প্রেত হয়েও নবকুমারকে ভুলতে পারে নি। সে প্রেত হয়ে পুন্নিমাকে আলিঙ্গন করতে আসে। নবকুমার আলিঙ্গন করতে এলে পুন্নিমা ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু সন্ন্যাসী পুন্নিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং ভয়ের কারণ নেই বলে পুন্নিমাকে ঘরে যেতে বলে। কিন্তু পুন্নিমার জীবনে ক্রমাগত সেই বিপর্যয় চলতেই থাকে। তখন সন্ন্যাসী পুন্নিমার কষ্ট দেখে কাতর হয়। পুন্নিমা সন্ন্যাসীকে এই বিপর্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করে। সন্ন্যাসী তখন নবকুমারকে প্রেতাত্মা করে রাখার ঘটনা বলে। এরপর সন্ন্যাসীর কাতরতা এবং পুন্নিমার অনুরোধে নবকুমারকে জীবিত করে দেয়। নবকুমার এবং পুন্নিমার পুনর্মিলন ঘটল এবং কিষণলালের শাস্তি হল।

কাহিনীটি পালা আকারে গাওয়া হয়।

মহারাজা পূজা—

অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার আগে মহারাজা পূজা হয়। মহারাজা এক কাল্পনিক দেবতা। বেশ কয়েকজন দেবতার মধ্যে এই দেবতাকে প্রধান বলে মনে করা হয় যার জন্য এই দেবতার নাম মহারাজা। মাটি কিংবা শোলা দিয়ে এই দেবতার মূর্তি নির্মাণ করা হয়। বাঘের উপর এই মূর্তি থাকে। মাঠে এই পূজা হয়। এ পূজার জন্য পুরোহিত লাগে না। গ্রামের পুরুষরাই এ পূজা করে। এ পূজাতেও লক্ষ্মী পূজার মতই উপকরণ ব্যবহার করা হয়। তবে এ পূজাতে পাঁঠা লাগে অর্থাৎ পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

সীতাষ্টমী পূজা—

এই দেবতাকে মেয়েরা ভাই বলে মনে করে। ভাদ্র মাসে তিথি অনুযায়ী রাত্রিবেলা এই পূজা মেয়েরা করে থাকে। তাদের ধারণা সীতাষ্টমী ভাইকে খুশী রাখলে মেয়েদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পাবে এবং তারা সুখী থাকবে। এ পূজাতেও কোন পুরোহিত থাকে না। বাড়ীর মেয়েরা এ পূজা করে। এই পূজা উপলক্ষে একটি ছড়া বলা হয়। ছড়াটি নিম্নরূপ—

রশো কুম্মার হাটের ধুলধুল মাটির গে
ধুলধুল মাটি
সেঠিন বিকায় গে চাপন হাটি
হসকার চাপন গে বিশকা লাগায়ে
যিতিবন ভাই পাবুন লগে।

লৌকিক ঔষধ

(১) সীমের পাতার রস আর চুন মিশিয়ে গালে লাগালে মামস সারে।

(২) পেরেক ফুটে গেলে দেশলাই কাঠি দিয়ে পুড়িয়ে দিলে ব্যথা সেরে যায়।

বলভাই গান

বলভাই গান রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক পালাগান। এই পালাগানের ঘটনাটা নিম্নরূপ—

এক মা ও তার ছেলে। কাজকর্ম করে ছেলে মাকে কোনরকমে খাওয়ায়। ছেলের বিয়ে দেওয়া হল। ছেলে আর ছেলের বৌয়ের রসিকতা দেখে মায়ের আনন্দ। কখনো মায়ের সঙ্গে বৌয়ের ঝকড়া। ছেলে খন কাটাতে যাচ্ছে বাড়ীতে যেন গণ্ডোগোল না হয় তার জন্মে বলছে—

১) মগো আমি গেলাম খন কাটিতে
কেচিয়া গণ্ডোগোল যেন হয় না বাড়ীতে
ছেলে বৌয়ের আবদারে অতিষ্ট হয়ে বলে—

২) দেখো এমন দুনিয়ার
কেমন মজা তার
দেখবে ভাই কলির জমানা
রূপার গনা প্রসন হয় না।
রূপার গনা ফেলে দয়ে
পিনতে চায় চুড়ি।
দেখো এমন······।

৩) ছেলে রাজাকে দেখতে যাবে সে বলে—

ছেলে—ওমা জননী রাজা দেখতে যাবো গো আমি।

মা—ও ব্যাটা যামনা কে বিন পমায়ে রাজা দেখিতে ও রাজা দেখতে রে গেলে পাঁচটি টাকা ওরে ব্যাটা সেলামি লাগে।

এ ছাড়া নতুন কোন ঘটনা নিয়ে বা কোন অবৈধ সম্পর্ক নিয়েও এই পালা গান লেখা হয়ে থাকে। উদাহরণ—

দেখবি যদি আয়জি মামী উড়ানি জাহাজ।
জাহাজ উড়াচ্ছে আকাশ।

এখানে মামীর সঙ্গে ভাগ্নের অবৈধ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। ভাগ্নে মামীকে ঘরের বার করার চেষ্টা করছে।

উপসংহারে এসেও উপসংহার টানা গেল না কারণ তথ্যাবলী—উপস্থাপনা পূর্ণতা প্রাপ্তি পায়নি সময়াভাবে।

বিভাগ—'ঘ'

নিশীথ মাহাতো
অখিল বিশ্বাস
সায়েরা তরফদার
যশোদা ঘোষ
পারমিতা চৌধুরী
মধুমিতা মজুমদার

করণ দিঘি নামকরণ সম্পর্কিত কিংবদন্তী :—

রাজা কর্ণের নামানুসারে এই দিঘির নামকরন করা হয়েছে করণদিঘি। এ বিষয়ে আমাদের একটা কিংবদন্তী শোনালেন ভগবান পুরের হরেন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়। কর্ণের রাজত্বে একজন গুণীন ছিলেন। তিনি মন্ত্রপূত জলের গুণে দৈত্যরূপ ধারণ করতে পারতেন। এই কথা রাজা জানতে পেরে গুণীনকে তার বিদ্যার পরীক্ষা দিতে বলে। গুণীন দুই ঘটি জল নিলেন ও উভয় ঘটির জলই মন্ত্রপূত করলেন। রাজা ও উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে একটি জলভর্তি ঘটি দিয়ে বললেন এই জল আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেই আমি দৈত্য হয়ে যাবো। কিন্তু সাবধান আপনারা যেন কেউ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবেন না। এই যে দ্বিতীয় ঘটির জল দেখছেন ওটা আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেই আমি পুনরায় মানুষ হয়ে যাবো। কিন্তু দৈত্য হবার পরেই রাজা ও উপস্থিতরা ভয়ে পালিয়ে গেল। মানুষের পায়ে বাকি ঘটির জল পড়ে গেল। ফলে গুণীনের মানুষ হওয়ার আর কোনো পথ রইলো না। এরপর গুণীন মারা যাবেন ঐ দৈত্য অবস্থাতেই। মৃত্যুর আগে রাজাকে বলে যান আমার তো আর কিছু করার নেই—আপনি আমার স্মৃতির জন্য একটা পুকুর তৈরী করবেন। এই নির্দেশেই রাজা পুকুরটি তৈরী করেন।

সাত

চতুর্থ দিবসের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের বিবরণ

বিভাগ—'ক'

(১) সুরজিৎ বসু
(২) সুলেখা ঘোষ
(৩) ভারতী সাহা
(৪) শুভাশীষ ভুক্তা
(৫) সুদেষ্ণা রায়

আজ ৯ই মে, বুধবার, ১৯৯০ আমরা ক্ষেত্রকার্যের জন্য ভালপাড়ার ইস্কুল মাঠে গিয়েছিলাম।

স্কুল পাড়া / কলেজ পাড়া গ্রামের ছোট মেয়ে যোগমায়া দেবনাথের কাছ থেকে কিছু পূজোর কথা জানতে পারলাম। সূর্য পূজো, নাটই পূজো, খেস্তি যা ক্ষেত্র পূজা নামে পরিচিত ও পাটই পূজার রীতি ইত্যাদি।

সূর্য পূজা—

প্রতি মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার পরের দিন সূর্য ওঠার আগে এই পূজা করা হয়। পূজার আগের দিন সংযম করতে হয়। পূর্ব-পশ্চিম দিকে পূজোর আগের দিন বেদী তৈরী করে রেখে পরের দিন ভোরে স্নান করে পূজার আয়োজন করা হয়। সকালে পূর্ব দিকে এবং সন্ধ্যা বেলায় পশ্চিম দিকে মুখ করে পূজা করতে হয়। পূজা শেষ হবার আগে পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। বেদীটা ২৫-২৬ জন ধরে এইরকম মাপের করা হয়। বেদীর মাঝখানে ঘট বসিয়ে গাঁদা ফুল মাটিতে গেঁথে দিতে হয়।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—

এক কেজি ধান ঢেকিতে ভেঙে নিতে হয়। সবরি কলা ও হরিতকি, প্রদীপ।

বেদীর চারিদিকে যারা পূজা করে থাকে তাদের কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিতে হয়। যে বাড়িতে পূজা হয় সেখানে দুই রকম ভোগ দিতে হয়। একটা ভোগ সেই বাড়িতে রেখে, অপরটি নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন স্নান করে মেয়েরা দেল (বেদী) ঠাণ্ডা করে। ঘটের জলটা গাছের গোড়ায় দিয়ে ঘটটা ধুয়ে ঘরে রাখা হয়। এই একই ঘট দিয়ে আর পরের বছর পূজা করা হয়।
আরেকটি পূজোর কথা জানলাম—

নাটই পূজা—

কার্ত্তিক অঘ্রাণ মাসে রবিবার পূর্ব দিকে মুখ করে বসে ঠাকুরের মূর্ত্তিটি পশ্চিম দিকে বাসয়ে এই পূজা করতে হয়। যদি মাসে চারটি রবিবার না থাকে তবে তিনটি রবিবারে এই পূজা করা হয়। এই পূজা মেয়েরা করে। কিন্তু উপোস করতে হয় না।

ঢেকিতে ভাঙা আতপ চাল লাগে। উঠানে একটি গর্ত করে গর্তে নেল (নল) থাকবে। এই গর্তে পাঁচটা সিঁদুরের ফোটা। গর্তের বাইরে সাতটি কচু পাতায় সাতটি পিঠে দিতে হয়। কাচা দুধ পিঠের মধ্যে দিতে হয়। পুকুরটাকে জল দুধ দিয়ে ভর্তি করে সিঁদুর ফোটা দিয়ে একটি পিঠে দিতে হয়। এই সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ছড়া—

কার্ত্তিক গেল অঘ্রান এলো
নাটই চণ্ডী ঠাকুর উঠানে বসল।

এই পূজার সময় এক ঝাঁক জোকার দিতে হয়। সব কিছু ঘরে নিয়ে কচু পাতাগুলো গর্তে থাকে।

খেস্তি পূজা—

খেস্তি পূজা ক্ষেত্র পূজা নামেও প্রচলিত। জমিতে বা উঠানে বসে এই পূজা করা হয়। বিন্নছোবা (ধান গাছের শিষের ন্যায়) দিয়ে এই পূজা করতে হয়। বাড়ির মেয়েরা ও বয়স্ক মহিলারা এই পুজো করে। সারাদিন উপোস থাকতে হয়। জমিতে নিয়ে গিয়ে ছেলেরা এই পুজোর প্রসাদ খায়।

সরঞ্জাম—

মূলো, সাতটি বেগুন পাতা, বিচে কলা।

পাটাই—

বিন্ন গাছ এনে কলার খোলা দিয়ে লম্বা করে বেঁধে ঠাকুর তৈরী করে পুজো করা হয়।

সরঞ্জাম—

ভাত, সাত রকম তরকারী—শোল মাছ (গোটা) ও ভাজা, টক, লাউঘণ্ট, কলুই পিঠে যে কোন পাঁচ রকম। সন্ধ্যা বেলায় এই পুজো করা হয়। মেয়েরা এই পুজো করে। একে পরস্তাব পুজোও বলা হয়ে থাকে।

এই পাটাই পুজো সম্বন্ধে একটা গল্প এদের সমাজে প্রচলিত আছে। এই পুজোর জন্য কোন এক বাড়ীর শাশুড়ী এবং পুত্রবধু জোগাড় করেছিল। শাশুড়ী সমস্ত ভোগ সরঞ্জাম ঘরে রেখে গেলে বউ সেই ভোগ থেকে খেয়ে নেয়। তাই পাটাই ঠাকুর তাকে অভিশাপ দিয়ে জিভ বন্ধন করে দেয়। পরে তার শাশুড়ী ঠাকুরের কাছে জোড়া পাটাই পুজো করার মানত করলে তার বউ সেরে ওঠে। তারপর শাশুড়ী জোড়া পাটাই পুজো দিয়েছিল।

মাঘ মাসের পূর্ণিমায় শনিপূজার মতো এই ভোর রাত্রে আকাশে তারা থাকতে এই পূজা করা হয়। পুকুরের পাড়ে ঠাকুরের মূর্তিটি গেরে পেছনে না তাকিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। চতুর্দশীতে পাটাই পূজা হয়। এই সম্পর্কে একটি প্রচলিত ব্রতকথা রয়েছে।—

ভর পূর্ণিমায় চতুর্দশী
পাটাই ঠাকুর বসল আসি।

চালের গুড়া দিয়ে আলপনা দিতে হয়। ফুল দিয়ে ঠাকুরের চতুর্দিকে সামনে সাজাতে হয়। গাঁদা ফুল দিয়ে সাজাতে হয়।

ঘুম পাড়ানি গান—

১। আয় ঘুম ঘুম করে কুমকুম
হাটিয়া বাজাইয়া মাছ বাড়ির বেগুন
তাই খাইয়া আমার ভাইয়ের চকে
আইল ঘুম।

২। ডিম ডিমাডিম ডিম
কিসের বাদ্য বাজে
খোকা যাবে পাঠশালাতে
তাই তো এতো সাজে
আগে যায় গাড়ি ঘোড়া
পিছে যায় হাতি।
তার পিছে ব্যাঙ চলে
কাঁধে ধরে ছাতি।

৩। ফড়িং নাচে তিরিং বিড়িং
ফিঙা বাজায় ঢোল
ট্যাংরা মাছে গান গায়
চিংড়ি বাজায় খোল
তাধিং তাধিং সঙ নাচে
নাচে কোলা ব্যাঙ
ট্যাংরা হাতের ন্যাওরা নিয়া
চ্যাং চ্যাঙা চ্যাং চ্যাং।

এছাড়া আমরা কিছু ধাঁধা সংগ্রহ করেছি—

১। কোন কোন গাছে সাজনা সাজে—সাজনা গাছ
কোন কোন গাছে বাজনা বাজে—কড়ুই গাছের ফল
কোন কোন গাছে মানুষের মাথা—নারিকেল
কোন কোন গাছে লেস ছেঁড়া কাঁথা—কলাপাতা

২। এখান থেকে দিলাম সাড়া সাড়া গেল বোদ্দপাড়া। (শঙ্খ)

৩। এক হাত গাছটা, ফল ধরে পাঁচটা। (হাতের আঙুল)

৪। ছোট ছোট মামা তার গা ভরা জামা। (পিঁয়াজ)

৫। আঁখির ভেতর পাখির বাসা ডিম পাড়ে ঠাসা ঠাসা। (কাঁঠাল)

৬। নাও চালাও সদাগর বুঝে শুনে তত্ত্ব
যার সম্বন্ধে মামা তুমি তবুও কথা সত্য
তুমি যে মামা আনন্দ মামী
তার গরভে জন্মিলাম
আমি মিছে কেন কহো তুমি
তোমার স্ত্রী আমার বাপ

রাজার নাও চালনাকালে এক জায়গায় উৎসব চলছিল। সেই অনুষ্ঠানে একটা ছেলে মেয়ে সেজেছিল। রাজার সেই মেয়েকে দেখে পছন্দ হয়ে গেছে। বাড়িতে নিয়ে এসেছে। রাজামশায়ের বোন আছে। বোনটার স্বামী নেই। বোনের সঙ্গে সেই ছেলের বিয়ে দিলেন। তাদের সন্তান এই প্রশ্ন করেছিল।

বৈঠকী গান—দেহতত্ত্বের গান

গ্রাম—ডালখোলা ইস্কুল পাড়া

নাম—নারায়ণ দেবনাথ

বয়স—৪৫

গান—১

(১) জীবন নদী নাইয়ারে আমার, জীবন নদীর নাইয়ারে
কবে আমার তীরে ভিড়াবে নাও, ধীরে ধীরে বাইয়ারে।
বের হইয়েছি সেই তো ভোরে ধরণী ধরে সাথী নাই মোর
চলার পথে মাঝি পথ নিয়েছি ভোলে
এখন সব হারায়ে নদীর কূলে, আছি যে দাঁড়াইয়ে।

(২) সাথী যারা গেছে তারা ফেলিয়া আমায়
আমি শুধু আছি বসে মাঝি তোমারই আশায়।
এখন কামাল বলে এই অয় ভাগায় দিও না ফিরাইয়ে।

গান—২

(১) পরেব জায়গা পরের জমি ঘর বানাইয়া আমি রই
আমি সেই ঘরের মালিক নই।
ঘরখানি যার আমি পাইনে তাহার হুকুমদারী
আমি পাইনে চৌকিদারের দেখে মনের দুঃখ কারে কই
আমি সেই ঘরের মালিক নই।

(২) জমিদারী ইচ্ছেমত দেয়না জমি চাষ
তাই তো ফসল ফলে নাবে দুঃখ বারো মাস।
আমি খাজনা পাতি সবই দিলাম তব জমি তাই যে নীলাম
আমি চলি যে তার মন যোগাইয়া দলিলের মিলে নাই সই।
আমি সেই ঘরের মালিক নই।

গান—৩

(১) দিন থাকিতে দিব বন্ধুরে ওরে আমার দিনের
কথা বলে রাখি
আমার আসবে যেদিন দিনের সেই দিনে গো
সেদিন আমায় দিও না ফাঁকি।
দিন…………বলে রাখি।

(২) সেদিন আমি যাত্রাপথে কেউ যাবে না আমার সাথে
অসময় দেখে।
আমি মহাযাত্রা করলেম বলে রে
কৃষ্ণরূপ যেন রৌদ্রে হেরি………
দিনের কথা…………বলে রাখি।

(৩) যেদিন আমি পথ ভ্রান্তি তুমি সাথে থেকো কোমেদ
কান্ত সাম কমল
আমি সেদিন মহানন্দ গেঠ রাম কৃষ্ণরূপ যেন
রৌদ্রে হেরি।
দিনের কথা বলে রাখি।

গান—৩ (ক)

মাটির দেহ হয় রে সোনা নিলে গুরুর উপাসনা
জন্ম মৃত্যু হবে বরণ আসা যাওয়া হবে না।

(১) মনরে আসিযা মায়ারই দেশে দিন কাটালেম রঙ্গরসে
স্বভাব গুরুধন চিনলি না।
একবার প্রাণ ভরিয়া ডাক তারে শ্রীগুরু করবে
করুণা।

(২) মন রে গুরু যারে কৃপা করে দিন জ্বালায় তার
অন্ধকারে।
শিখায় তারে অসাধ্যসাধনা,
সাধন করলে পরে পলায় ঘরে
সমানে ছুইতে পারে না।

(৩) অসাধ্য করলে সাধনা ঠিক হইতে ষোল আনা
চাঁদের কোনা ভাঙ্গিতে পারে না।
যেতো প্রেম মানরে ভেসে বেড়ায় অতি পর
তার গগন থাকে না।

গান—৪

প্রাণ পাখী পিঞ্জারায় বসে লও রে হরিনাম
একবার অন্তর দুয়ার খুলে বলো হরে কৃষ্ণ রাম ॥

১। হরিনাম হয়ে বিস্মরণ ঘুচলনা তোর মর্ম মরণ
কিসে হবে ত্রিতাপ করণ জুড়াবে পরাণ
হরিণাম মহৌষধী ভক্তিতে পান করিবে যদি
দূরে যাবে ভব ব্যাধি হবে প্রাণারাম ॥

২। যাগযজ্ঞ আর ব্রত আদি কলিতে নাই অন্ত বিধি
প্রাণ খুলে নাম করিবে যদি পাবি মুক্তি ধাম।
হরিনাম পারের তরী যপরে নাম নিষ্ঠা করি
যথা নাম তথায় হরি তথায় ব্রজধাম ॥

৩। যার মুখে নাই কৃষ্ণকথা, সে মানবের জন্ম বৃথা
হরিনাম যার হৃদে গাঁথা সে তার প্রাণের প্রাণ
এ বল্লভের স্বভাব মন্দ, হরিনামের সঙ্গে নাই সম্বন্ধ
এবার নিজ গুণে প্রাণ গোবিন্দ পুরাও মনস্কাম ॥

গান—৫

শ্রীগুরু চৈতন্যের হাটে, নিয়ে চলরে ভাই।
দূর থেকে নাম শোনা যায়, যাওয়ার সন্ধান নাহি পাই ॥

১। কতজনার সঙ্গ ধরে হাঁটলাম সারা জনম ভরে,
তবু পড়ে আছি দূরে পথের শেষ হয় নাই।
এমন সন্ধ্যা বেলায় চেয়ে দেখি সাথী কেহ নাই।

২। জনম ভরে করেছি যা, টানছি শুধু ভূতের বোঝা
সাজার উপর এত সাজা, কাজেই ফুরায় নাই,
আমার হাত ধরে যে নিয়ে যাবে,
এমন বান্ধব কোথায় পাই ॥

৩। ভুল পথে মুল খোওয়াইয়ে বল্লভ বলে কাঙ্গাল হয়ে
কর্মফলের বোঝা লয়ে, আমি এখন কোথায় যাই,
ভেসে নয়ন জলে হরি বলে যেন, ভক্ত সঙ্গ পাই ॥

গান—৬

অকূল নদী কেমনে যাবি বাইয়া পাগল নাইয়া
ও তোর পূবের বেলা পশ্চিম গেল, দেহতরী জীর্ণ হলো।
সাথী সঙ্গী গেল পলাইয়া।

১। নিয়ে এলি পঞ্চ রতন, না করে সেই মালের যতন
অযতনে ফেল্লি খোলাইয়া।
শুন্য হাতে সন্ধ্যা কালে ভাসতে হবে নয়ন জলে,
তোর ব্যথা কেউ দেখবেনা চাইয়া।

২। ও তোর মাস্তল ভাঙ্গা কদাম ছেঁড়া মল্লা ছয় জনে
বেয়ারা, পাক জলেতে নাও দিল ডুবাইয়া।
যদি লক্ষ্য রেখে নাও চালাতি, সময় থাকতো জল ফেলাতী।
ও তোর সাধের তরী যেতনা ডুবিয়া।

৩। সহস্র বৎসরের পারি, কেমন করে যাবি বাড়ী,
কাল মেঘে আকাশ গেল ছাইয়া।
পার হতে এই অকূল নদী, বল্লভের আর নাই দরদী।
গুরু তুমি বিনে কে নিবে তরাইয়া ॥

গান—৭

বাসি হইয়ারে আর কত কাল রব আমি পরের জ্বালা সইয়ারে—
নিজের ভাঙ্গা বুক জুড়াব তোমার পরশ সাহারে।

(১) অন্তরে অনন্ত জ্বালা ব্রেথার মাল সাথী এ জগতে যেতে।
হলনা কৃষ্ণ সেবার সাধিরে আমি ব্রেথার থালা নিয়ে বেরাইজে কাদিয়ারে।

(২) তীর্থ যাত্রি কাঁদে যেমন হারা হয়ে সাথি
পতি হারা সতি কাঁদেরে যেমন চন্দ্র হারা রাতি
আমি আর কাঁদিবো ভবে সাথি হারা হইরে

(৩) পাগল বিজয় বলে কাঁদাও যত অতে খতি নাই
সকল দুঃখে শান্তি পাব যদি তোমার দেখা পাই
কবে তুমি আমায় আসবে নিতে বাশরি বাজাইরে।

গান—৮

গুরু আমি ভাবি তাই অন্তরে কি দিয়ে ভজিব গুরু
তোমার হরি যে ধনেতে তুমি তুষ্ট সে ধন আমার

(১) নিয়ে এলাম ষোলো আনা দয়াল করবো তোমার উপাসনা
আমি কি করিতে কি যে করি ভাসি নয়ন জলেরে

(২) ফুলে মধু থাকলে পরে দয়াল গুরু ভ্রমর যায়কি অন্যস্থানে।
আমি কার সেবার ধরা কারে দিয়ে হলেম সেবা বাদিরে।

(৩) পূর্ণ ক্রান্ত থাকলে পরে দয়াল গুরু
নিত আমায় আদর করে
আমি কোন মহতের সন্দ ধরে ভ্রান্ত প্রোরণ করিবে ॥

গান—৯

শ্রীবৃন্দাবন আধার হয়ে গেলরে মধন মোহন
মোহন কৃষ্ণ বিহনে।

(১) নন্দের কানন সাধ ছিল বিন্দাবন ধাম
কৃষ্ণ বিনে হয়ে ছেরে সসানেব সমান।
ওলাই কোলের সৌরব কুকিলের রবসৌ
আসেনা পুর্ণিমাব চাদ গগলে॥

(২) জলে বিচছেদ অনল বিচছেদ অনল জুমুনার জল
নিরবে স্থক সাড়ি কাদে তমালের ডালে
জল বিচছেদ অনল সহস্র গুনসৌ
গুকল পোরেছে ঐ আগুনে॥

(৩) মলিন হয়েছে বৃক্ষ তরো তরুলতাগণ
বনময় সুধাইছে মধুর বৃন্দাবন
এবার ফিবে এসো রাধা রমণৌ
পাগল বিজয় পড়েছে আজ দুর দিনে॥

গান—১০

এস হে কাঙ্গালের ত্রিনাথ এস আমার আসবে
হে ত্রিনাথ এস আমারো আসরে।
নিগুণে দায় করে দাও চরণ দুখানি॥

(১) ভাটি বাসে ছিলাম জবা জবা ওজান কেনে
জায়ারো ত্রিনাথ ত্রিনাথ এসহে॥

(২) জবা ওজান কেনে ধায়া না জানি কোন
অপরাধ করিছি বৃন্দাপায়॥ ওহে ত্রিনাথ এসহে॥

(৩) ব্রামনের এক ছেলে ছিল হে সে গেল
মারিয়াহে ত্রিনাথ এসহে এস
ও ত্রিনাথ সে রোল মারিয়া ঠাকুর ত্রিনাথের
নামের গুণে মরা ওঠিল বাচিয়াহে
ত্রিনাথ এসহে এস॥

গান—১১

জিবন নদীর নাইরে আমার নদির নাইয়ারে।
কবে আমার তিরে ভিরাবে নাও ধীরে ধীরে বাইয়ারে

(১) বের হইয়েছি সেই জে ভুরে ধরনি ধুলে সাথি পাই মোর
চলার পথে মাঝি পথ গিয়েছি ভোলে।
এখন সব হারাইয়ে নদির কুলে আজিহে দারাইরে
(২) সাথি হারা গেছে তারা ফেলিয়া আমায়
আমি শুধু আছি বসে মাঝি তোমারি আশায়
এমন কাঙ্গাল বলে অভাগারে দিওনা ফেলিয়ারে
(৩) যোল আনা তফিল নিয়ে করিলাম কারবার
এমন জমায় পূর্ণ খরচ বেসি মাঝি হইছে আমার
এমন হিসাব আর নাই তফিল আমার দেখেছি মিলাইয়ে
(৪) পাগল বিজয় বলে আমি আছি এই ভব নদির কুলে
কবে নাবিক বন্ধু নিবে নৌকায় তোলে
কবে পারের বা দান দিবে তো লে গুণের নাগাল পাইয়ারে ॥

গান—১২

পর বাসি হইয়ারে আর কত কাল রব আমি
পরের জালা সইয়ারে।
পিজর ভাঙ্গা বুক জুরাব তোমার পরম পাইরে
(১) অন্তরে অনন্ত জ্বালা ব্রেথার থাল সাথী
এ জগতে কেও হলনা, কৃষ্ণ সেবার সাথিরে।
আমি ব্রেথার মালা বলে নিয়ে
বেরাইজে কাদিয়ারে ॥
(২) তীর্থ যাত্রি কাদে যেমন হারা হয়ে সাথি।
গতি হারা সতি কাদেরে যেমন চন্দ্র হারা রাত্রি
আমি আর কাদিবে ভবো সাথি হারা হইরে
(৩) পাগল বিজয় বলে কাদাও যত তাতে যতি নাই।
সকল দুঃখে শান্তি পাব যদি তোমায় দেখা পাই
কবে তুমি আমায় আসবে নিতে বাসরি বাজাইরে।

গান—১৩

আগে নিজে রসিক হওনা, আগে নিজে রসিক হওনা।
রসিক মানুষ চেনা যায় না।
(১) রসিকের সঙ্গে কর রসিকের করণ কর
রসিকের রস সাধকের জেনে উপসম।
উতোর উপসনা ঠিক না হলে রসিক ও হওয়া যায় না।
পঞ্চরসের কাবর নিগুন রসিক বয় আর কেও বুঝে না।

(২) রসিকের করণ জেনে পঞ্চবান পঞ্চ গুণে
গুণে বাণে সু সন্ধানে মদন জয় করনা
গুসাই বলে চিত্ত সুধ আসে করে লওনা
ও তুর চিত্ত শুধু না হইলে সংখবিনে রং ধরে না।

(৩) দুধ মৈথান করলে পড়ে দুধ হইতে মাখন উঠে
সে মাখন রসিক বটে বিন্দু আর ছুটে না
ওরে দুধে মূলে মিসাইলে সে মাখন মিলে না
রসিকের তেমনি ঘটনা সে জিব সমাজে আর মিসে না।

গান—১৪

ঘাটের ওপর হাট বসায়ে নিতাই ডাকে আয়রে আয়
হাটের ইশন কোনে নিশান সারা দেখলে জগত ভুল যায়

(১) গোলক হতে রত্ন তুলে, নিতাই আনল জিবকে দিবে বলে
আমার গের ভাবের ভাবুক হলে,
নিতাই-বিনা মূলে মাল বিলায়।

(২) যোল জনকে করতে বাধা, যোল নাম হয় সাধন সাধা।
ব্রজের শ্রীরাধিকা যার-আরাধা, নিতাই বাধা তার কথায়

(৩) থাকিতে ইন্দ্রিয় বিকার, সে হাটে নাই তার অধিকার
ওরে চৈতন্য জ্ঞান হয়েছে যার, সাধ্য বস্তু নেই সে পায়।

(৪) হাট ভারলে হাটুরা যাবে, দয়াল নিতাইরে দোকান বন্ধ হবে
যখন ইজারাদার খাজনা চাবে এমন বল্লভরে তোর কি ওপায়।

খ—বিভাগ

—সদস্য/সদস্যাদের নাম—

তারিখ—৯।৫।৯০

সুপর্ণা দে
মীনাক্ষী দত্ত
মীনা পাণ্ডে
সুপর্ণা ঘোষ
প্রণব সরকার

আজ ৯ই মে লোক সাহিত্য ক্ষেত্র গবেষণার চতুর্থ দিন। গত কয়েক দিনের মত আজও আমাদের বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল লোক সাহিত্যের সংগ্রহ উপাদানের জন্য। সকাল নটায় বেরিয়ে পড়েছিলাম ডালখোলা সৎসঙ্গ বিহার আশ্রম থেকে।

আজ আমাদের লক্ষ ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। পূর্ব-নির্ধারিত কোন গ্রাম নয়। মাঠে, ঘাটে, ষ্টেশনে, দোকানে, গাছের তলায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য, বহু বিচিত্র উপাদান। মূল কথাটা হলো জন সংযোগ স্থাপন করা। লোক সাহিত্য ক্ষেত্র গবেষণা কর্মী হিসাবে সর্বপ্রথম যে গুণটি প্রয়োজন, যে পদ্ধতি শিক্ষার প্রয়োজন—তা হোল জন সংযোগ স্থাপন করা। মানুষের প্রকৃত বন্ধু, সহকর্মী, সহমর্মী বা প্রতিবেশী সুলভ আচরণ করা এবং অতি কৌশলে অবাস্তব প্রসঙ্গ থেকে মূল প্রসঙ্গের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া। তারপর সুকৌশলে নিজের অভিপ্রেত বিষয়টি জেনে নিতে হয়। কিন্তু সর্বাগ্রে চাই সাহস বা মনোবল।

এই সাহস নিয়েই বসে পড়েছিলাম ডালখোলা রেল ষ্টেশনে। সেখানে বিভিন্ন ধরণের সাধারণ মানুষের সাথে ভাব জমতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগেনি। সেখান থেকেই আমরা লৌকিক প্রণয়মূলক গান, লোক গাথা, রূপকথা, নূতন ধরণের লোক ঔষধ, ছড়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান খুঁজে পেলাম। এখান থেকেই মাইল খানেক দূরে কাটনা কালীর পূজার থান। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সেখানে বসেছে বাৎসরিক মেলা। এই কালীর উদ্ভবের কাহিনী, পূজা, উপাচার ও পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে জানালেন এই কালী পুজোর অন্যতম পুরোহিত সিয়ারাম ঝা, তিনি নানা অলৌকিক কাহিনী শোনালেন। যা অভিনব ও আনন্দদায়ক।

আমাদের আর এক কর্মী স্বপর্ণা দে, লোক সাহিত্যের 'বিস্ময় বালক' মাদার গাছির প্রদীপ সিংহের নিকট থেকে যোগাড় করেছেন রূপকথার গল্প, চব্বিশটি ধাঁধাঁ, সারিগান— (এই গানের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে মনসা মঙ্গল পালা গাওয়া হয়।) ও একটি কাহিনীমূলক ধাঁধা।

লোক সাহিত্যের ক্ষেত্র গবেষণার শেষ দিনে কতকগুলি কথা অবশ্যই না বললে নয়। এই গবেষণা কার্যের মধ্যে আমরা নানান অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। যা ভবিষ্যতে আমাদের নানা কাজে লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের গাইড প্রতিকূল সরকার, রঞ্জন মুখার্জীর কাছে। ডালখোলা সৎসঙ্গ শিবিরের শ্রদ্ধেয় কর্মীবৃন্দের প্রতি আমাদের ঋণের শেষ নেই। তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

নাম—ফইসুম আলি। গ্রাম—মহম্মদপুর।
পোষ্ট—জগদীশপোশ। জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর।
ভায়া—ডলখোলা।

লৌকিক কাহিনীমূলক গান—

কাহিনী—একটি বটগাছের তলায় বসে কালা নামের একটি ছেলে রোজ বাঁশি বাজাত। সেই সময় আনোয়ারা নামে একটি মেয়ে প্রতিদিন স্নান করতে যেত। সেই সময় ছেলেটি মেয়েটির প্রতি প্রেম নিবেদনের চেষ্টা করত। কিন্তু মেয়েটিও সহজ যায়

না। সে কালাকে জানিয়ে দেয় যে সহজে বশ্যতা স্বীকার করতে সে রাজি নয়। উত্তর-প্রত্যুত্তর-মূলক এই গান তারই প্রকাশ।

গান

কালা— স্নান কর সুন্দরী কন্যা হে
ও কন্যা আওলো মাথার কেশ
কোন বাসরে থাক কন্যা
কোথায় তোমার দেশ

আনোয়ার—আনোয়ারা মোর নামটি কালা রে
ও কালা দক্ষিণ শিয়ারী বাড়ি
বেফাঁস কথা বললে কালা
পুলিশ দিব ধরী কালারে

কালা— পুলিশ নাহি লাগবে কন্যারে
ও কন্যা আমি হব চোর
যে কয়দিন বান্দিয়া রাখ আপত্তি নাই মোর কন্যা হে
সেই থানার দারগো হইরে
মরুভূমির প্রতীক আমি রে
ও কন্যা জল পিপসায় মরী
তুমি তো পূর্ণ সরোবর
জল দাও পান করি কন্যা হে

আনোয়ারা—ছি ছি মরমে মরি কালা রে
ও কালা লজ্জা নাই তোমার
আজকে আমি যাচ্ছি চলে
কাল হবে বিচার
এই গাছ তলে থাইকো তুমি
ও কালা কালকে এই সময়
বকুল ফুলের মালা আনবো
বান্দিতে তোমায় কালারে।

প্রেম যদি নিষিদ্ধ হয় এবং প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক যদি ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা থাকে তবে সেই প্রেম যে কত বিপদজনক হয় নায়িকার কণ্ঠের এই গানটিতে তারই প্রকাশ। এখানে মামু ভাগ্নীকে বিয়ে করার পর ভাগ্নীর জীবনে দুর্দশা প্রকাশিত:

গান

বাড়ীর পাশে সিঞ্চীয়া নদী
মাছ ধরিতে যাই
আমারই রূপ দেখিয়ারে মামা
ঘটক পাঠাল রে
কি সর্বনাশ করলি মামারে
মেজো মামা প্রাণের গো পতি
বড় মামা ভাসুর
ছোট মামা হইয়াছে গো দেওর
নানা হল শশুর রে
কি সর্বনাশ করলি মামারে
আগে যদি জানতাম মামা রে
আমায় করবা বিয়া
আতুর ঘরে মরিতাম আমি
লবণ মুখে দিয়া রে
কি সর্বনাশ করলি মামা রে।

কাহিনীমূলক গান

একদিন বাবা এবং শিশুপুত্র একত্রে নৌকায় চড়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। শিশুটি এক প্রান্তে এবং বাবা অপর প্রান্তে বসেছিল। এক সময় অসাবধান বশত শিশুপুত্র নদীর জলে পড়ে যায়। বাবা তার সন্ধান পায় না। পরে ছেলেটি নদীতে ভাসতে থাকে। বাবা মাছ মনে করে কোশ [বঁড়শি] দিয়ে গেঁথে তুলবার চেষ্টা করে। বঁড়শিতে পুত্রটির অর্দ্ধাংশ ওঠে। এই লোক গাঁথাতে তারই বর্ণনা।

গান

সন ১৩৪৯ সালে দিনাজপুর জেলায়
দুরঘটনা ঘটিল তথায়
তাহার একটি ছেলে ছিল
জলে পড়ল ধাপের মধ্যে উহার খবিরুদ্দিন
মাছ ভাবিয়া কোশ দিয়ে কোপায়
ছেলে উঠায় কোলে বিধিরে বিধি।

পড়িলেন ধুলায়
আয় সোন চাঁদ জাদুমণি
আয় আমার কোলে
একবার ডাকরে মা বলে
আমার শোকের আগুন
ঠাণ্ডা করিব তোমায় নিয়ে কোলে
চেরাকেতে তেল থাকিতে
নিভিল যে ছাই
খোদা তোর কি দয়া মায়া নাই
ও আমার ও বন পড়া সকলে দেখে মন পড়া
কাহারো দেখিবার শক্তি নাই
আদম নেহাজ বলে অসীম লীলারে
খোদা বুঝিবার শক্তি নাই।

ছড়া

বকবকম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কালকে
চলবে সোনার পালকি
খুকুমণি জন্ম নিল
যিদিন মদের ঘরে
পরিরা সব দেখতে এল
কতই খুশি ভরে
আদর করে দুধ খাওয়াল
সোনার পিয়াল হাতে
দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াল
জ্যোৎস্না মামার হাতে
ঘুরে পুরে নাচে গায়ে
হাত ধরে সব তারা
কতই খেলা খেলল তারা
ফুলের বিছানায়।

লোক ঔষধ

নাম—বিশু প্রসাদ, বয়স—৭০, গ্রাম—সুভাষ পল্লী

(১) গলার উপরের অংশ থেকে শরীরের যে-কোন জায়গায় দুরারোগ্য ঘা হলে কাটিইয়া (হলুদ ফুল যুক্ত কাঁটাগাছ—শিয়াল কাঁটা) গাছের শিকড় রবিবার প্রাতঃকৃত্যের আগে তুলে ১ম দিনে ২১টা গোলমরিচের সঙ্গে খেতে হবে। ২য় দিন থেকে ৫টা গোলমরিচের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে এই ধরণের দুরারোগ্য ঘা সেরে যায়। এইভাবে ৫—৭ দিন খেতে হবে।

(২) চোখ থেকে জল পড়লে বা চোখ লাল হলে কাটিইয়া বা শিয়ালকাঁটা গাছ থেকে যে দুধের মত রস নির্গত হয় সেই রস লাগালে চোখ সেরে যায়।

(৩) বেহায়া (ঢোলকলমী) গাছের রস লাগালে শ্বেতী বা চর্মরোগ সেরে যায়।

(৪) হাঁপানী রোগে বনতুলসী গাছের শিকড় রবিবার দিন বাসী মুখে তুলে ২১টি গোলমরিচের সঙ্গে বেটে বাবা বাস্‌কীনাথের নাম করে খেতে হবে। ভাল হলে পিপুল গাছের নীচে একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়ালে ভাল হয়। একবারে ভাল না হলে সপ্তাহে একবার করে তিন-চার সপ্তাহ খেতে হবে। বাস্‌কীনাথের নাম এবং পিপুল গাছের নীচে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো—এগুলি হল ঐ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস।

(৫) গায়ে চুল্‌কানি হলে দুল্‌ফি (গুম্মা—হিন্দীতে) গাছের রস স্নানের আগে দু-তিন দিন লাগালে সেরে যাবে।

(৬) সাপে কামড়ালে চিবচিরি (কাঁটাযুক্ত গাছ) গাছের শিকড় তুলে বেটে গোলমরিচ বা কেঁচোর সঙ্গে মিশিয়ে খাইযে দিলে রোগী বেঁচে যাবে। তবে এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস গাছ তোলার সময় যদি শিকড় অক্ষত অবস্থায় উঠে আসে তবে রোগী বেঁচে যাবে আর যদি তোলার সময় শিকড় ভেঙ্গে যায় তবে রোগী বাঁচবে না।

গান

গায়িকা—মালতী রায়, বয়স—৩০, গ্রাম হনুমান টুলি

চরণ দাও গো হরি ভরসা তোমার
কি দিয়ে পূজিব হরি আমি চরণ তোমার গো হরি চরণ তোমার
আতপ চাল গঙ্গাজলে পূজিব হরি তোমার পায়ে

এটি একটি অপূর্ব পাঁচালী গান।

গায়ক—ফৈজুর আলি, বয়স—৩০, গ্রাম—মহম্মদপুর

কোকিল ডাকিস্ না রে আর
এল বসন্তের বাহার সুখ বসন্ত
সুখের কালে বন্ধু নাইরে যার
বন্ধু হইল দেশান্তর
আমার ভাঙ্গিল আশার ঘর
কে বুঝিবে মনের ব্যথা বন্ধু নাইরে যার
ভাবি ননদী আমার শাশুড়ি
জ্বালায় বারে বারে
কে বুঝিবে মনের ব্যাথা বন্ধু নাইরে যার

এক ব্যক্তি বিবাহ করে আনার পর ব্যক্তিটির নববধূর সঙ্গে শাশুড়ির ঝগড়া বাধে। তখন স্বজন-পরিজনহীন বা পিত্রালয়ের আত্মীয়হীনা বধূটির কণ্ঠে বিলাপের সুর ভেসে ওঠে।

রূপকথা

নাম—বিশু প্রসাদ, গ্রাম—সুভাষ পল্লী, পোঃ—ডালখোলা, জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর।

এক রাজা ছিল কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। রাজা নানা দেশ থেকে আগত পণ্ডিতদের নিকট থেকে সন্তান লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করত। জনৈক এক পণ্ডিত রাজাকে জানালো সন্তান লাভের পূর্বে অর্থাৎ অন্য রাজার মৃত্যু হইবে। রাজা জানালো পণ্ডিতের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে পণ্ডিতকে কারাগারে বন্দী কর হইবে। রাজা ঘোড়ার পিঠে করে শিকার করতে গিয়ে এক গাছের তলায় বিশ্রামকালে ঘোড়া রাজাকে জানালো তাকে সামনে না বেঁধে রাখলে রাজার বিপদ হইবে। কিন্তু রাজা তাহার কথায় কর্ণপাত না করায় জঙ্গল থেকে এক দানব বাহির হইয়া রাজার মৃত্যুর কারণ ঘটালো। তারপর দানব রাজার পোষাক পরে রাজার দেশে ঘোড়ার পিঠে চড়ে উপস্থিত হল। রানী ঘোড়ার নিকট থেকে জানতে পারল আসল রাজার মৃত্যু হয়েছে। ঘোড়া দানবের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হিসাবে জানালো দানবকে খেতে দিয়ে রানীকে ঘোড়ার পিঠে লইয়া দেশান্তরে যাইবে কিন্তু দানব বুঝতে পেরে ঘোড়ার পশ্চাৎ ধাবন করলে রানী ঘোড়ার নির্দেশ মত তাহার পশ্চাৎ ভাগ কাটিয়া দিল। ঘোড়ার অগ্রভাগ রানীকে নিয়ে এগিয়ে যাবার কালে ঘোড়া জানাইল তাহার মৃত্যুর পর তাহার দেহ মাটির তলায় যেন কবর

দেওয়া হয়। ঘোড়ার মৃত্যু হইলে রানী যথারীতি তাকে কবর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক মালীর গৃহে আশ্রয় পাইল। সেখানে রানী এক পুত্র সন্তান লাভ করিল। মালীর স্নেহে পালিত রাজপুত্র এক পশু শিকার কালে এক হংসী ধরিল। হংসী এক মুক্তির উপায় স্বরূপ ঘুমুর প্রদান করিল যার কাছে যা প্রার্থনা করিবে তাই মিলিবে। রাজপুত্র ঘুমুরের কাছে প্রার্থনা করিল তাহার প্রাসাদ নির্মাণ করে দেবার জন্য। যথারীতি তাহার প্রাসাদ নির্মিত হল এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাহার কন্যার সহিত বিবাহ দেবার প্রস্তাব করিল। এক রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইল। তারপর রাজপুত্র ঘুমুরের প্রতি নির্দেশ দিল এক অজানা জায়গায় লইয়া যাইতে। সেখানে এক সাধুর দ্বারা আশ্বাভাজন হইয়া একটা খড়ম ও একটা লাঠি লাভ করিল। খড়মকে নির্দেশ দিলে সে বহদূর লইয়া যাইতে সক্ষম ও লাঠিকে নির্দেশ দিলে সে যে কোন ব্যক্তিকেই মারতে সক্ষম। অতঃপর রাজপুত্র খড়মের দ্বারা রানীকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়ার কবর স্থানে উপস্থিত হল এবং নিজের আঙুল কাটিয়া কবর স্থানে ছড়িয়ে দেবার ফলে ঘোড়ার আবির্ভাব ঘটিল। অতঃপর ঘোড়ার নিকট হইতে পিতার মৃত্যু রহস্য শুনে পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হল এবং লাঠিকে নির্দেশ দিল দানবকে হত্যা করার জন্য। যথারীতি লাঠির আঘাতে দানবের মৃত্যু হইল। তারপর ঘোড়ার পিঠে করিয়া রাজপুত্র ও রানীমাতা পিতার কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে হাতের আঙুল কাটিয়া রক্ত কবর স্থানে ছড়িয়ে দিল। মৃত রাজার আবির্ভাব ঘটিল। অতঃপর রাজা, রানী ও রাজপুত্র নিজরাজ্যে উপস্থিত হল।

রূপকথা

রাজপুত্রের গল্প

এই গল্পটি মাদারগাছি গ্রামের অধিবাসী প্রদীপ কুমার সিন্‌হা নামক এক রাজবংশী ক্ষত্রিয় বালকের কাছ থেকে পাওয়া।

এক ছিল রাজা। তার ছিল দুই রানী। বড় রানী নিঃসন্তান ছোটরানীর দুই পুত্র শীত ও বসন্ত। রাজা ছোট রানীকে বেশী ভালবাসে, এই দেখে বড় রানীর মনে খুব হিংসা হয়। সে ঠিক করে যে, যে কোন উপায়ে সে রাজার কাছ থেকে আগের মত আদর পেতে চেষ্টা করবে। এই ভেবে সে একদিন রাত্রে নিজের শয্যার নিচে কিছু পাটকাঠি রেখে দেয়, এরপর রাত্রিবেলা যখন রানী সেই বিছানায় শুলেন তখন পাটকাঠি গুলো মটমট করে ভাঙতে লাগলো, আর রানী বলতে লাগলেন যে তার হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এই শুনে রাজা বললেন কেন সে এমন অসুস্থ তখন রানী বল্লেন যে, যদি সে একটি শর্তে রাজি হয় তাহলেই সে বলবে, তখন রাজা রাজি হলেন। এরপর রানী বল্লেন

তার খুব সখ সে ছোট রানীর দুছেলের মাংস খায়। তখন যেহেতু রাজা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ তাই তিনি জহ্লাদকে আদেশ দিলেন দুই ছেলেকে বলি দেওয়ার জন্য। এদিকে ছোট রানীর কাছে একথা গেলে তিনি তো কেঁদে আকুল। তিনি জহ্লাদকে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। এবং শেষে বল্লেন যে তুমি কি তোমার নিজের ছেলেকে এভাবে মারতে পারতে। একথা শুনে তার পিতৃ হৃদয় ব্যথিত হল। এবং সে তাদের বলি না দিয়ে একটি কুকুর কিংবা ছাগলের সন্ধানে বের হল। কিন্তু পথে কিছু না পেয়ে সে তার নিজের ছেলেকেই বলি দিয়ে রাজার সামনে উপস্থিত করলো।

এদিকে ছোটরানীর নির্দেশ মত দুই রাজপুত্র ঘোড়া চড়ে বহু ধন সম্পদ নিয়ে দেশ থেকে পলায়ন করলো। ঘোড়া ছুটতে ছুটতে তারা এসে পৌঁছালো এক ছক্কশে (চারি দিকে ২৪শ মাইল) মাঠে। সেখানে এসে ছোটভাই শীত বড়ই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লো। তখন বসন্ত তার জন্য জলের সন্ধান করতে চলল। এবং পেলো একটা কুয়া। কিন্তু যখন সে এখান থেকে জল তুলছে তখনই সেখানকার রানীর পাইক এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। রাজপ্রাসাদে পৌঁছে সে পূর্ব স্মৃতি বিস্মৃতি হল এবং সেই রানীর সঙ্গেই বিয়ে করে সংসার আরম্ভ করলো। এইভাবে একদিন হঠাৎ একটি বহুমূল্যবান মানিক, হিরে বোঝাই ঘড়া চুরি হয়ে গেল। রাজার পাইক গেল চোর ধরতে। এবং তারা মার ধোর দিয়ে তুলে আনলো বসন্তের ছোট ভাই শীতকে। কিন্তু শীতকে দেখে স্মৃতি বিস্মৃত বসন্তকে চিনতে পারলো না এবং তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার নির্দেশ এবং বলল তাকে ৭ দিনে একবার খেতে দেওয়া হবে।

এরপর রাজা বাণিজ্য যাত্রার জন্য একটা জাহাজ নির্মাণ করলেন। কিন্তু সে জাহাজ বলল যে নর বলি না দিলে সে চলবে না। একথা শুনে রাজা কারাগারের বন্দীরই বলির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বলির পূর্ব রাত্রেই দেবতা নবরূপে তাকে দেখা দিয়ে বলে গেলেন যে সে যদি নদীর জল নিয়ে জাহাজের চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় তাহলেই জাহাজ চলবে। পরের দিন সকালে যখন শীতকে নদী তীরে নিয়ে যাওয়া হল তখন সে বলল যে সে এই জাহাজ চালিয়ে দিতে পারে। একথা শুনে রাজা তাকে সেই আজ্ঞাই দিলেন এবং সে দেবতার কথা অনুসারে কাজ করে উপকার পেলো। জাহাজ চলল। এরপর রাজা তাকে সেই জাহাজের চালক নিযুক্ত করে পাঠালেন বাণিজ্যে।

বাণিজ্যে গিয়ে প্রতি দেশেই বহু দ্রব্য সামগ্রী বিতরণে সে হল সমর্থ। এতভাবে চলতে চলতে একদিন সে এক রাজ্যে পৌঁছালো সেখানকার রাজকন্যা তাকে দেখে হল মুগ্ধ এবং শীতের সঙ্গে হল তার পরিণয়। শীত তাকে বাণিজ্য শেষ করে ফেরার সময় নিয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলে। এরপর সে প্রায় বহু দেশ বাণিজ্য করে এবং ৮-১০টা বিয়ে করে ফেলল। কিন্তু শেষে সে সিদ্ধান্ত নিলো যে সে তার প্রথমা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরবে। এইভেবে সে এসে পৌঁছালো তার স্ত্রীর

কাছে। স্ত্রী তখন তাকে গোপনে বলল যে তার পিতা যৌতুক দিতে চাইলে সে যেন পিতার কাছ থেকে মন্ত্রপূত দাদুর লাঠিটা চেয়ে নেয়। যথারীতি পরের দিন সকালে সে তার শ্বশুরের কাছ থেকে যৌতুক হিসাবে যাদুদণ্ডটি চাইলো এবং তিনি তাকে তা দিলেন।

এই দণ্ড নিয়ে যখন শীত ও তার পত্নী বাড়ী ফিরছে তখনই জাহাজের কুলিদের নজর পড়ল শীতের রূপসী কন্যার উপরে। তারা ঠিক করলো যে শীতকে জলে ফেলে দিয়ে তারা এই সুন্দরীকে বিয়ে করবে এবং সেইমত তারা শীতকে ফেলে দিল দরিয়ার জলে। কিন্তু শীতপত্নী এটি দেখেই তার যাদুলাঠিকে স্মরণ করে বলল যাদুলাঠি যেন বোয়াল মাছের পেটের ভেতর শীতকে স্থান দিয়ে তাকে ডাঙায় তুলে দেয়।

এরপর জাহাজ চলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎই বোয়াল পড়লো এক জেলের জালে ধরা, এবং তারপর তাকে কিনে নিয়ে গেল এক গোয়ালা। এরপর গোয়ালিনী মাছ কাটতে গিয়ে পেলো ছোট 'শীত'কে। তারা ছিলো নিঃসন্তান। তাই তারা শীতকেই সন্তান স্নেহে মানুষ করতে লাগলো।

এদিকে জাহাজও রাজকন্যা নিয়ে পৌঁছালো। কুলিরা রাজার কাছে গিয়ে তারা সকলেই রাজকন্যাকে পত্নীরূপে চেয়ে বসলো। তখন রাজকন্যা তাদের বল্লেন যে সত্য কাহিনী শোনাতে পারবে তাকেই রাজকন্যা করবে বিয়া। প্রত্যেকেই করলো চেষ্টা কিন্তু পারলো না কেউই।

এই খবর হঠাৎ পেল শীত, তখন সে গেল রাজবাড়ীতে। সেখানে গিয়ে সে তার জীবন কথার বর্ণনা দিল। এবং সে কথা শুনে বসন্তের পূর্ব স্মৃতি এল ফিরে। এরপর শীতের সঙ্গে রাজকন্যার হল বিয়ে। এরপর শীত ও বসন্ত হাতি চড়ে ফিরে চলল তাদের মায়ের কাছে। মা নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা তার দুই পুত্রকে সস্নেহে দিলেন রাজ্য ও সিংহাসন।

প্রদীপ কুমার সিন্‌হার কাছ থেকে প্রাপ্ত ধাঁধা ঃ—

i) রাজার ব্যাটায় বীর। ওড়ায় মারে তীর॥ উঃ চোরকাঁটা
ii) চার ঠ্যাঙ ধাপ্পা। বসে মাথা নাড়ে বাবা॥ উঃ চৌকি
iii) চার ডাণ্ডা এক ঠোঁট। কহু তোরে বাপ্তত। উঃ ঢেরা (দড়ি পাকাবার যন্ত্র)
iv) এখেরি ঢুক্কাই। ভূতের ঘরে লুক্কাই॥ উঃ আলু
v) আলু কি করে বংশ বৃদ্ধি করে? উঃ চোখ দিয়ে
vi) রাজার ঘরের শুদলি। দিনে রাতে না শুকায়। উঃ জিভ

vii) রাত্রিতে জন্ম হয় তার অকালে মরণ
যার ঘরে জন্ম তার অবশ্য ক্রন্দন
মা বাপ জন্ম দিয়া রে ছাড়িয়া পালায়
ঘুষ্টির দুনিয়া লোকে করে হায় হায় ॥ উঃ চোরের সিঁদকাঠি

viii) রাজার ঘরের হাস। করে কাত কাত। উঃ ধানের ঢেকি

ix) উপর থি কাককুলের বাস। তার ডিমাডি কানা মাছা ।।
হও যদি পণ্ডিতের ব্যাটা। করো কটা কটা ॥ উঃ সুপারির গাছ ও ফল

x) নব গুরু ছব্বই চ্যালা চৌদ্দ রুটি সঙ্গে গেল
বেল হল ভাটি আনো জো জো রুটি বাটো ॥

উঃ নতুন গুরু ১ জন ছব্বই চ্যালা ৬ জন মোট ৭ জন ১৪টি রুটি ২ টো করে ভাগ করে দিতে হবে।

xi) বারো বৈরাগী তিন মুসলমান। এক ভাগ সুপারী চার ভাগ বাটো সমান সমান ॥

উঃ বারো বৈরাগী=সুপুরিগুলোকে কাটা। ৩ মুসলমান। প্রত্যেক ভাগে ৪ টি সুপুরী পড়বে।

xii) জলে জন্ম ডাঙায় বাস। আবেক বার জলে গেলে মরে পটাস ॥ উঃ লবন

xiii) একটি বুড়ি তিনটি মাথা। সে খায় গাছের মাথা ॥ উঃ উনুন

xiv) ঘর আছে তো দুয়ার নাই। উঃ মশারি

xv) ফেলে দিলে মেলে যায় ওগো গোরান।
টিপে দিলে নামে যায় ওগো গোরান ।। উঃ ছাতা

xvi) উড়িতে সনসন বসিতে পাহাড়।
লইক্ষ লইক্ষ জীব মারে তা হনি বার বার ॥ উঃ জাল

xvii) জল মধ্যে জন্ম যার না ছুয়ে নীর
দেখিতে কৃষ্ণের বর্ণ ত্রিভঙ্গ শরীর
নিম্নদিকে আঁখি তার ত্রিভঙ্গ কায় ॥ উঃ জয়ল

xviii) উত্তরতি (দিক থেকে) দাসিল কামার রসলা কাহ পরে
গাষ্টেয় পাতা নি কাটিম কেমন কর। উঃ মানুষের ছায়া।

xix) আর এক বাপ ব্যাটা আর এক বাপ ব্যাটা
তাল বাড়ীতে যায় তিনটে ভাল খায়। উঃ পিতামহ, পিতা, পুত্র।

xx) হে হে হে তোর পাস দিয়ে গেল কে। উঃ বাতাস।

xxi) ধুতরি (জোয়ান) কইল্লা গাছে চড়ে
তিন মর্দ ধরে রাখে। উঃ উহুনের তিনটে বি-কের উপর ভাতের হাঁড়ি।

xxii) লাল গরু দৌড়ে যায় / কাল গু-হাগতে যায়। উঃ আগুনের জ্বলা ও নেভা।

xxiii) ভাঙা ঘার দেউড়ি নাচে। উঃ মুড়ি।

xxiv আগে মুড়ি পিছে খই / গামা সাপের বাচ্চা। উঃ সজনে কুঁড়ি ফুল, ডাটা।

xxv বাট সাটাং পাটাং মা লুতুং বেটা গাদাম গুদাম বোন সুন্দরী।

উঃ লাউ গাছ, লাউ পাতা, লাউ, লাউ ফুল।

সরি গান ঃ এই গানের অন্তর্গত মনসা পূজোর গান। এই গান পালা আকারে গাওয়া হয়।

যখন লক্ষীন্দর বাসব ঘরে তখনকার গান।

i) গরম গরম দুই খাইলে জিভায় জ্বালে ছালে।

জুড়ায় না দুধ খাইতে মুখে লাগে ভাল ॥ (বালী) অর্থাৎ মেয়ে এখানে বেহুলা।

উঃ দুধের তুলনা কইন্যা দেই কি কারণ।

হাসি মুখে দেহ কইন্যা প্রেম আলিঙ্গন ॥ (বাল) অর্থাৎ পুরুষ লক্ষীন্দর

কাঁচ কাঁচা ডালিম খাইলে জিভয়ে লাগে কস।

পাকলে ডালিম খাইলে মুখে লাগে রস ॥ (বালী)

ডালিমের তুলনা কইন্যা কর কি কারণ।

হাসি মুখে দেহ কইন্যা প্রেম আলিঙ্গন ॥ (বালা)

কাঁচা বাসের ধনুক প্রভু কত জোরে টান।

পাকা বাসের ধনুক প্রভু বোঝার সমান ॥ (বালী)

ধনুকের তুলনা কইন্যা দেহ কি কারণ।

হাসি মুখ দেহ মোরে প্রেম আলিঙ্গন ॥ (বালা)

মা বাপ বিহায়া দিলে মো পণ্ডিত দেখিয়া।

হেথা আসি দেখাচু মুই চাষ ॥ (বালী)

চাষারও তুলনা কইন্যা দেহ কি কারণ।

গদাধর যে মাছ মারে বংশি সুরু সুতা ॥ (বালা)

সাপের গান

এবার লক্ষীন্দরকে কামড়াতে সাপ এসেছে

i) যেমন পলঙ্কের রূপ তেমন বালার রূপ

তকি ভাইরে বসে আছি পরম সুন্দর

ন য়ে ডংসিমু লক্ষীন্দরে ফিইরা জাইমু ঘরে

ওকি ভাইরে কি করিতে পারে কনি বিষহরি।

ii) আমি ব'লিস কালনাগ চান্দ মোরে পুরু হয়

ওকি ভাইরে চান্দ মোর দুরন্থের বন্ধু না।

এরপর যখন সাপে কামড়েছে তখন লক্ষীন্দর বলছে

i) উঠ সুন্দরী জ্বালাও বাতি আর কত মান আছে রাত্তি।
উঠ সুন্দরী ছাড় রাও ডাকা আনো মোর মাও বাও।
ওকি ভাইরে মা বাপ ভাসিলে বাঁচিরে মোর পরাব ॥
শরীর হইল মোর কালা কালা রে রক্ত হৈল পানি।
শরীর হইল মোর কালা কালা রে আগুন চিয়ারের ধাও ॥
ঝিমি ঝিমি করে গাওরে।
গাওরে ওরে হায়রে হায় ॥

এরপর বউ ও শাশুড়ি কাঁদতে আরম্ভ করলো

i) বধু মায়েগো কেন কন্দেগে আর
তোমার কাঁদার শুনিয়ে প্রাণ ফেটে যায় ॥

বউ বলছে :—শাশুড়ি মায়োগে কি বলুম আর দুঃখের কথা
কইলে প্রাণ ফেটে যায়।

শাশুড়ি—চুড়ো কেশি খড়ম পাই যার
বাড়িব পড়ে ধনে বংশ নষ্ট হয়ে তার
গাউর ব্যাটা মরে।

এরপর যখন ভেলা নিয়ে গাঙে ভাসলো বেহুলা। সেই সময় ঘাটের মাঝির সঙ্গে কথাবার্তা।

i) ফালাইলাম ডোর বনসি
তোক দেখিয়া উলোমতি

প্রশ্ন :—ওকি কন্যারে বিবাহ করিমু
এই ঘাটের উপর। (গদা—ঘাটেব মাঝি)
তুমি গদাহে ধন্য বাদ
মদন আমার ভুরায় নাথ
ওকি গছা ভায়ে
ভুরা ভাডিলে হব অপরাধ
ওকি হয়রে হায়। (বালী—কন্যা)
চন্দ্র সূর্য উদয় হয় / পূর্ণিমাতে শিবন হয় / ওকি ভাইরে
নাম বুঝিলাম শিলুচাদিয়া
চার ভিটায় চারখান টাটি / মাঝি যায় নাই সে মাটি
ওকি কন্যারে ঘুরে বসে দেখতেন স্বর্গীয় তারা
ঘরে আছে মোর দুটি নারী / কেহ কানি কেহ ঘুরি (গদা)
দুট থেকে করছিল খেলা। চোমুতে পড়ছিল ভেলা
কানি কানি বলে ডাকে সর্বজনে ওকি হায়রে হায়

৫। তোর ছেলের নাম কি ?

উঃ টলা পরছ। এহি কাম / ইছিয়া বিছিয়া রাখিয়া নাম
ওকি ভাইরে নাম রে / দিছে ঢিকলা মাসান।

কাহিনীমূলক ধাঁধা :

"পথত পানে ছাড়িনি / শিব মন্দিরে ঘর নিরনি
অধিক ধনলে বসিলে খাই / পিশ্চিলে জলকম্বলে"

এই ধাঁধাটিকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে নীচে তা বিবৃত হল।

এক ছিল রাণী। তার ছিল এক পুত্র। একদিন সেই রাজপুত্র ঠিক করলো যে সে এক সাধুর কাছ থেকে তিনটে মন্ত্র শিখবে সেই জন্য সে সাধুটিকে তিনটি টাকা দেবে।

এই বলে সে সাধুর কাছ থেকে এক টাকার বিনিময় পেল 'পথত পানে ছাড়িনি'। দ্বিতীয় টাকাটার বিনিময় পেলাম 'শিব মন্দিরে ঘর নিরনি' আর তৃতীয় টাকাটির বিনিময় পেলাম 'অধিক ধনলে বসিলে খাই / পিশ্চিলে জলকম্বল'।

এই তিনটি মন্ত্র শোনার পর সে এই মন্ত্র যপ করতে করতে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে পথে পেয়ে গেল একটা কাঁকড়া। তাকে পেয়ে তার মনে পড়ে গেল প্রথম মন্ত্রটা সে সেই বিশাল কাঁকড়াটাকে তুলে নিল ঝোলায়।

এরপর একদিন সে শুনলো যে রাজা ঘোষণা করেছেন যে তার কন্যার সঙ্গে যে এক রাত কাটাতে পারবে তার সঙ্গে সে নিজ কন্যার বিয়ে দেবে ও অর্ধেক রাজত্ব দেবে। এই কথা শুনে রাজপুত্র গেল রাজকন্যার সঙ্গে রাত্রী কাটাতে। গিয়ে সে দেখলো রাজকন্যা যেখানে শুয়ে আছে সেটা একটা শিব মন্দির। তার দ্বিতীয় মন্ত্রের কথা স্মরণ হল। সে "শিব যে মন্দিরে ঘর নিরনি" শিব মন্দিরে ঘুমতে নেই। সে রইল বসে জেগে। যখন সন্ধ্যা সময় প্রায় ১২টা তখন সে দেখলো যে রাজকন্যার নাক দিয়ে দুটো সাপ বের হয়ে আসছে। তখন সে তার সেই কাঁকড়াটিকে সাপের মুখের দিকে দিল ছুঁড়ে। কাঁকড়াটা ধরলো সাপের মুখ। এরপর রাজপুত্র সাপের মুখ দুটো কেটে নিয়ে লেজটাকে দিল ফেলে।

পরের দিন সকালে এক নাপিত যাচ্ছিল ঘরটির পাশ দিয়ে। সে ল্যাজটিকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দেখালো রাজাকে এবং বলল যে সে সাপ হত্যা করেছে। এদিকে রাজার লোক তো সকালে উঠে ঘুমন্ত রাজপুত্রকে মৃত বলে ফেলে দিতে যাচ্ছে সেই সময় রাজপুত্র ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়ালো এবং বলল যে সে জীবিত এবং সে বিষধর দুটি সাপকেও মেরে ফেলেছে। তার প্রমাণ বিষধর সাপের মুখ দুটো। তখন রাজা বুঝলেন যে নাপিত মিথ্যাবাদী। সেই ক্ষণেই নাপিতের হল প্রাণদণ্ড।

এরপর রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হল রাজকন্যার। সে পেল অর্ধেক রাজত্ব। কিন্তু তখনও সে তার তৃতীয় মন্ত্র "অধিক ধনলে বসিলে খাই। পিশ্চিলে জলকম্বলে সে ঠিক করলো যে রাজা হয়েও সে (খুরপি) শ্রমিকের কাজ করবে। তাই সে তার রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করে শ্রমিকের মত সাধারণ মানুষের মত পোষাক পরে চললো কাজ করতে। এই ভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করতে করতে বেলা লাগলো বাড়তে। এক সময় সব শ্রমিকদেরই টিফিন খাবার ছুটি হল তখন রাজা তার সহকর্মীদের বলল যে সে সোনার থালায় ভাত খায় এখানেও তেমনিই খাবে। এ শুনে তার কর্মীরাতো বিশ্বাসই করতে চাইলো না। কিন্তু তারপর হঠাৎই দূরে দেখা গেলো একটা রাজার গাড়ী আসছে। তা দেখে কর্মীরা বলল ওটা তো বয়ের গাড়ী। কিন্তু শেষ অবধি দেখা গল যে গাড়ীটা এসে থামলো রাজারই কাছে এবং রাজা সে সব খাদ্য খেলেন।

এই ভাবে রাজকুমার তিনটি মন্ত্রের জোরে প্রাণে বেঁচে গেল এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল।

ক্ষেত্রানুসন্ধান

'গ' বিভাগ

১। শ্রী সুব্রতনারায়ণ মজুমদার
২। সুপ্রিয়া নায়েক
৩। ইরা সরকার
৪। রুবি ভট্টাচার্য্য
৫। লিপি সরকার
৬। পরিমল ঘোষ (সহযোগী)

সংগৃহীত বিষয়

১। ক্ষেত্রপূজা
২। ব্রত
৩। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পূজা
৪। বৃষ্টি থামানোর পূজা
৫। ঘুমপাড়ানী ছড়া
৬। প্রেমের ছড়া
৭। ভজন গান
৮। খেলার ছড়া
৯। আলপনা
১০। ধাঁধা
১১। ধান ক্ষেতের ছড়া
১২। শিয়াল ও কাকড়া সংক্রান্ত ছড়া
১৩। প্রাণীসংক্রান্ত ছড়া
১৪। রূপকথা
১৫। রাজবংশীদের খাদ্য পদ্ধতি, শ্রেণীভেদ
১৬। উপসংহার

আজ ৯।৫।৯০

আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা (লোকসাহিত্য) বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ গত রবিবার থেকে ডালখোলার সন্নিকটস্থ গ্রামের জনসাধারণের কাছে লোকসাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন কথা, পালা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ সংগ্রহ করেছি। আজ ছিল আমাদের ক্ষেত্রানুসন্ধানের চতুর্থ দিবস। আমাদের দলে আমি সুব্রতনারায়ণ মজুমদার, সুপ্রিয়া নায়েক, রুবি ভট্টাচার্য্য, লিপি সরকার, ইরা সরকার এবং আমাদের বিগত দিনের নিত্য সহযোগী অজয়দার পরিবর্তে নূতন সহযোগী পরিমল ঘোষ। ইনি আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে এতবেশী সহযোগিতা করেছেন যাঁর তুলনা তিনি নিজেই। আমাদের ক্ষেত্রানুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসারে পশ্চিমদিনাজপুর জেলার ডালখোলায় হরিপুর গ্রামকে বেছে নিয়েছিলাম। প্রথমে আমরা আমাদের আশ্রয়স্থল ডালখোলা সৎসঙ্গ বিহার থেকে সকাল ৮টায় পায়ে হেঁটে হরিপুর গ্রামে ঢুকলাম। শুরুতেই দেখলাম একটা ভাঙা পুরনো মন্দিরে 'মহারাজ' মূর্তি। এটাকেই মহারাজ মন্দির বলে থাকে এই গ্রামের বিশ্বাসী সরল সাধারণ মানুষেরা। এই মন্দিরের দেবতাই এই গ্রামের জন সাধারণের গ্রামদেবতা।

তারপর আমরা হাটতে হাটতে গেলাম ওই গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবার রামানন্দ দাসের বাড়ী। সেখানে আমরা লোকসংস্কৃতির নানা বিষয়ে নানা কথা পেলাম। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্ষেত্র সম্পর্কে পূজা, গরুর চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয় যা আজকাল ওই গ্রামের জনসাধারণের কাছে নিয়মিত পূজারূপে পরিচিত, পূজা, ব্রত, উচ্চসংস্কৃতির নামের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির নামের তফাৎ প্রভৃতি। যেমন—

ক্ষেত্র পূজা ঃ—

১। হাল সবারণ পূজা।

মাঘ মাসের প্রথম দিনটিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ সংক্রান্তির রাত্রে মেয়েরা চালের গুড়ো দিয়ে ঢিল নামক একপ্রকার পিঠে তৈরী করে। পরের দিন সকালে চাকর বা গৃহস্থ নিজেই লাঙ্গল গরু নিয়ে মাঠে যায় এবং পাঁচ পাক ঘুরে হাল চাষ করে পুজো করে। পুজোর উপকরণগুলো আমাদের পুজোর মতই। তবে ওই দিন ও আগের দিনের পিঠে গুলো খাওয়ায়।

২। বাউগ্ পূজা ঃ—

এটাও জমি সংক্রান্ত পূজা। এই পূজো প্রথম আউসধান-রোনার দিন অনুষ্ঠিত হয়। যেদিন কৃষক প্রথম ধান বুনবে সেদিন সকালে সে একটা কলা পাতায় করে আতপ চাল, কাঁচা দুধ, বিচি কলা (স্থানীয় নাম আঠিয়া), ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে জমির দক্ষিণ পশ্চিম কোনায় দিয়ে পুজো করে ধান বপন করে। ধান বপনের পর কৃষক জমির মধ্যে গড়াগড়ি খায়। তারপর বাড়ী ফিরে তারা আতপ চালের ভাত খায় নিরামিষ সহকারে। পাড়ার অন্যান্য দু'চারজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। এটা কেবল মাত্র আউস বপনের সময় হয়। স্থানীয় কথায় অনেকে একে ভাদুই চাষও বলে।

৩। আষাঢ়ী পূজা ঃ—

আষাঢ় মাসে এই পূজো হয়। এই পূজোর উপকরণ হল মাটির হাড়ি, দুধ, আতপ চাল, চিনি, এছাড়া আম কাঁঠাল ইত্যাদি ওই সময়কার ফল। মাটির হাড়িতে করে গোয়াল ঘরে নূতন উনুন কেটে পায়েস রান্না করা হয়। যাকে এরা ক্ষীর বলে। অনেকে এটা ঠাকুর ঘরেও করে থাকে। মেয়েরাই এই পূজো করে।

৪। পকো খাওয়া পূজা ঃ—

কালী পূজোর রাত্রে গরুদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তাকে নিমন্ত্রণ করে আসে গরুর পায়ে জল ও খিলী দিয়ে। পরের দিন তুলশি (একধরণের ছোট ছোট গাছ যা এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়), হলুদ পাতা, ছৈতনের ছাল গুরুগুচি (লতানো একপ্রকার গাছ) বেটে রস করে চোঙায় করে খাওয়ায়। আবার রসুন পেঁয়াজ লবন কাঁচা হলুদ ইত্যাদি পাতায় মুড়ে গরুকে খাওয়ায়। এগুলি খাওয়ানোর পর হাঁসের ডিম বিচি কলা ধান দূর্বা সিন্দুর ইত্যাদি দিয়ে গোয়ালের ঘরে পূজো করে। তাদের বিশ্বাস এই পূজা করলে সারা বছর গরুর কোন রকম অসুখ হয় না।

এছাড়া এবার আসা যাক কয়েকটি ব্রতের মধ্যে ঃ—

ঘাণ্টো ব্রত ঃ—হরিপুরের মানদা দেবীর কাছ থেকে এই ব্রতের কথা জানতে পারি। চৈত্র সংক্রান্তির দিন কুমারী মেয়েরা এই ব্রত করে থাকে। এই ব্রত করবার জন্য লাগে ফুল এবং বিশেষকরে, যবের ছাতু, ছোলা, কলাই ইত্যাদি। এই ব্রত শুরুর সাত দিন আগে থেকে কুমারী মেয়েরা এই ব্রতর গান করতে থাকে। মূলতঃ কুমারী মেয়েরা পছন্দ-মত স্বামী পাবার জন্যই এই ব্রত করে থাকে।

এই ঘাণ্টোব্রত করবার সময়কার গান ঃ—

i) কৈ মাঙে অন্ধন কৈ মাঙে পুত্রধন
আমরা মাঙি স্বামী ধন।

ii) ভাঙ ধুতুরা খায়রে শিব
বসিলেন যেয়ানে
আরকি নিলেন ঘাণ্টো।

ঘাণ্টো ব্রতের ঘট ভাসাইবার সময়কার গান ঃ—

চৈত্র মাসের নানা ফুল নানা ফুলের নানা বাস।
কৈয়েন সৈয়ের পূজা
টগর ফুলের করি সৈয়ের পূজা।

b) পূর্ণিমা পূজা ঃ—

এ পূজাটি করা হয়ে থাকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। পূর্ণিমার দিন এই পূজোটি হয়। পূজার দুদিন আগে থেকে বাড়ীর লোকেরা কেউ আমিস জাতীয় খাদ্য খায়না। আতপ চাল, দুধ কলা দিয়ে সূর্য ডুবার পর পূজাটি করে। এখানে পুরোহিত দরকার হয় না।

এছাড়া সত্যনারায়ণ পূজার প্রচলন এখানেও আছে।

c) **অতি বৃষ্টি থামানোর পূজা :—**

এ এক অদ্ভুত ধরণের পূজো। অতিবৃষ্টি হলে বাড়ীর মেয়েরা বস্ত্রহীন অবস্থায় ঘরের ঢেঁকিকে উঠানের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাকে দেবতার মত করে স্নান করিয়ে আদর করে তাতে সিঁদুর, ধান দূর্বা ইত্যাদি দিয়ে পূজো করে।

d) **নরসিংহ পূজো :—**

এই গ্রামের জনসাধারণ (ছেলেরা) বিয়ে করতে যাবার সময় নরসিংহপূজো করা হয়। এই পূজোতে বিশেষ করে খাসির মাংস ব্যবহার হয়। চিত্রের সাহায্যে নরসিংহ মূর্তি দেখানো হল।

এবার পূজো অর্চনার পথ থেকে একটু অন্য দিকে মুখ ফিরাই। বিষয় ছড়া।

a) **ঘুম পাড়ানী ছড়া :—(কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে)**

পুরুষ ঘরের আশ্রাই
জলে ছাদা লাইট,
সেই লাইটের উজ্জেতে মা আমার আসবে দূরের দামুন।
দূরের দামুশ আসলে মা আমার কলম্বা গেল চুরি।
মনরা হাইসকুলের পড়া মা আমার কলম্বা গেল চুরি।

b) **প্রেমের ছড়া :—একে লগ্নি গান বলে**

ঝাণ্ডে ধরে ঝাণ্ড করলা
চালে ধরে কদু
মায়ে বাপে পালন করেচে
পয়ায় খেয়েছে মধু।

এর পর আমরা এক ভিন্ন ধরণের গান সংগ্রহ করলাম। যা ভজন পর্যায়ের।

ভজন গান :—

কৃষ্ণের নাম কর্ণে কে আর শোনাবে
পঞ্জেরা ছেড়িয়া পাখিরে পালাবে।
পাখি গেল ভাই উড়িয়া পাঞ্জেরা
রইলা পড়িয়া পঞ্জেরা দেখিয়া কান্দি
উহার বহিন।
কৃষ্ণের নাম করবে কে আর শুনাবে
পঞ্জেরা ছেড়িয়া পাখিরে পালাবে।

পাখি গেল ভাই উড়িয়া
পঞ্জেরা রহিল পড়িয়া।
পঞ্জেরা দেখিয়া কন্দিবে ভাই ভাতিজা।
মা কান্দিবে বাবারে বাবা
বহিন কান্দিবে দয়াল গে দাদা
কলারে সুন্দরী কান্দবে শিয়রে বসিযা।

খেলার ছড়া ঃ—

i). **কবাডি খেলার ছড়া**

a) কাবড্ডি আনা পেট ফুলানা
পেটকে দাবা হাম সেলেনা।

b) চাকার পর আদো/তোর মুই দাদো।

c) শোন কাবাডি অ্যাণ্ডারপ্যান
ঘড়ি বলে ট্যাং ট্যাং
ঘড়ির কোপালে বেটা
মাছ মারু গোটা গোটা
মাছের রক্ত মোর বুক শেক্ত।

মাদার গাছী গ্রামের শ্রী প্রদীপ সিনহার কাছ থেকে সংগৃহীত ধাঁধা।

১। গাছডো থ্যাচড়া ফলডো ব্যাকড়া (উঃ লঙ্কা)

২। হক্কর পুজা মাটি খুঁদে
তার দশখান ঠ্যাং তিনখান কটি। (উঃ লাঙল ও চাষ)

৩। ইর কিজি চির কিজি
নাই চাষা নাই বিচি। (উঃ লবণ)

৪। দৌড়ে গেনু দৌড়ে আসনু
ধীরগঞ্জের হাট
কতুই নি দেখ মুই ফুলের উপর পাত। (উঃ আনারস)

৫। রাত্রিতে জন্ম তার সকালে মরণ
মা-বাপ জন্ম দিয়া ছাড়িয়া পালায়
তুনিয়ার লোক দেখে করে হায় হায়। (উঃ চোরের সিঁদ কাটা)

৬। ডুব ডুব ডুবতে যায়
তুইডা আল বাঁধতে চায়। (উঃ লাঙল দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলা)

৭। পি পি পি
উপর মুখে হাগে কি? (উঃ কেঁচো)

৮। উত্তর তিতে আসিল চিলা
সে চিলা কয় মানুষ গিলা। (উঃ জামা)

৯। উপর তি ঝাবার ঝুবুর তলতি লোটা
যাহার নি কহবা পারে
তায় বুড়া বান্দবের বেটা (উঃ ওল গাছ)

১০। কাঠের গায় মাটির লোকো
তার দুধ খয়, সেই দুধ মানুষে খায়। (উঃ তাল গাছ ও তার রস)

১১। মাটির ঘোরা খেরি লাবাঙ
দু'মন তিন মন বোঝ দিলে নি ভাঙে। (উঃ উনোন, স্থানীয় ভাষায় আখ)

১২। এতোটি কুঠি ধান করে বিশি বিশি। (উঃ শালুকের বীজ)

১৩। আনহু লাঠি ভাঙহু ডাল
কোন জন্তুর হড্ডিত বাল। (উঃ পাকা তালের বীজ)

১৪। চার ঠ্যাং চলে দুই ঠ্যাং ঝুলে
দুইটা জীবের মধ্যে একটা বীজ বলে। (উঃ ঘোড়ার উপর মানুষ)

১৫। লাল টুক টুক সিঁদুর বরণ
মা গিছে পেট বরণ
আজ্জা'ছে তো পাজ্জা নি
জিব'ছে তো ভরসা নি। (উঃ বুড়িয়া পাখী)

মাঠে এক প্রকার ছোট পাখী থাকে। মাঠে রাখাল ছেলে ঝোপে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে বুড়িয়া পাখী বাচ্চাগুলি একথা বলছে। কারণ বাচ্চাদের মা গেছে খাবার খোঁজে। তার বাচ্চারা বাঁচতে চায়।

১৬। তিন অক্ষর নাম যার
জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে বসে সুখ পাই। (উঃ কোকিল)

১৭। ছোটতে দুই শিং
জামানতে নেই
বৃদ্ধকালে দুই শিং
সূর্য গোসাই। (উঃ চাঁদ)

১৮। ছোটতে গোস্তি বিনা
জামানতে নাই। (উঃ বাঁশের চারা)

১৯। হেতা গাড়িনু খুঁটা
কালো গাইয়ের দুধ মিঠা। (উঃ মৌচাক)

২০। বাচ্চা যন্ত্রটির ঘেড়ির পাও
চুমুক করে চুমা খেয়ে দৌড়ে ঘরে যায়। (উঃ বোলতা)

২১। ঢিল রসি টান টান
ছকটি বার কান। (উঃ মই)

২২। অসংখ্য জঙ্গলে চড়িল হরিণ
দশ জনে পিটানি দুজন মড়িল। (উঃ উকুন ধরে মারা)

২৩। নাগরের কন্যা সাগরের ভেট
বাপে আনে বেহায়
বেটা করে পেট। (উঃ ট্যাপা মাছ)

২৪। পি পি পি লেঙ্গুর দিয়ে জল খায়
তার নাম কি। (উঃ কুপি)

২৫। বাস কাটে ঠুকুর ঠাকার
কঞ্চি বাজড়ায়।
হাজার টাকার মারল কোন নি টিকায়। (উঃ মৃতদেহ)

২৬। মুঠি আটেতো কুঠিৎ নিয়ে আটে। (উঃ ছাতা)

২৭। এক মারলে দুই হাপর
বিনা বায়ারে করে হাপর হাপর (উঃ কলাপাতা)

২৮। উবুর খায় পরহু থ্যাচম্যাটায় ধরহু
পুস্তাটা নিকলায় দিহু,
নয়াটা ঢুকাই দিহু। (উঃ ঘরে পুরানো খুঁটি পাল্টে নতুন খুঁটি লাগানো)

*২৯। জিনিষটা দেখতে শুনতে ভাল
কিন্তু তার মাথাডো কাল। (উঃ কুচফল)

৩০। আট পায়ার গাড়ী
চার মুখের চলি।
একটা পাইয়ের একটা বাছুর। (উঃ পালকির বেয়ারা ও বরকনে)

৩১। ঘরের হাটুয়া ধরে কে ? (উঃ ঝাটা)

৩২। গটে ইস্কুলের ছোয়ালার
একখান কটি। (উঃ রসুন)

৩৩। উপরিতিতে পরল চরকা
চেরকা নাচন জানে।
সোনার চাকা ভাজিয়ে জলে
কেউনি চেনবা পারে। (উঃ বৃষ্টির ফোটা)

৩৪। উপর ভিতে পড়িল ধুম।
ধুম কয়ে মোর কবিধা শোন। (উঃ মাম)

প্রবাদ—

৩৫। উড়ে গেল টিটির বাচ্চা
পড়ে গেল শ্বেতশ্বরীর হাড়
জামরুল করে চ্যাঙ মাছ আহার।

ছড়া (ধান খেতের)—

৩৬। হাঁসের ডিমা কচুর ফুতি
আয় লক্ষ্মী মোর ভাতি।
নিন্দুর ধরিয়া দূর ফালা
পোকামাকর দূর ফালা।
শোরা শোরা সবারে ধান আউল-বাউল
মোর ধান দুধের চাউল।

কালী পূজোর আগের দিন ধান খেতে গিয়ে এই ছড়া গাওয়া হয়।

ছড়া

শিয়াল ও কাকড়া সংক্রান্ত ছড়া ঃ

i) শিয়াল কাকড়াকে খাবে বলে তাকে বলছে—
কাঙ্কুড়ি কাঙ্কুড়ি পরম সুন্দরী
ঘরে হস্ত বের হো প্রনাম করি।

কিন্তু কাকড়া খুব বুদ্ধিমান—
লেপিচু মুছিচু সন্ধ্যায় চু ঘর
পন্নাম করবি তুই দূরে দূরে কর।

প্রাণী সংক্রান্ত ছড়া ঃ

ii) হাত্ত আছ পাও আছে জারে করকরা
কেননি বান্দিস বীরেন খোপড়া।

iii) থপর থপর চলল হাতি।
হাতির মাথায় সোনার ছাতি।
হাতি শুঁড় দিয়ে খায়।
হাতির কুলার মতন কান
হাতির লেজটি ধরে টান।

iv) ডালে বসে কাক ডাকে কা-কা।
বনেতে শিয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া।
ময়রার দোকানে অনেক মিঠাই।
রসগোল্লা ভরা ছিল কড়ায়।
কাক্ এসে ঠুক করে নিল ঠোঁটে করে।
শিয়াল চালাক বলে শুন তোরে ভাই।
তোমার মত মিঠে গান কভু শুনি নাই।
সেই কথা শুনে কাক বলিল কা
ঠোঁট থেকে পড়ে গেল রসগোল্লা।
সেই রসগোল্লা নিয়ে দৌড়ে পালায়
ডালে বসে কাক শুধু করে হায় হায়।

v) আয় বৃষ্টি কেটে ধান দিব মেপে।
ধানের মধ্যে পোকা, জামাই বাবু বোকা।

বিয়ের সময় কনের বাড়ীর লোকে বরকে ঠাট্টা করে এই ছড়াটি বলে।

রাজার ছেলের গল্প

এক ছিল রাজা। রাজার এক রাণী ছিল। তারা নিঃসন্তান। এতে তাদের মনে খুব দুঃখ ছিল। এমন সময় তাদের ছেলে হলো। ছেলে হওয়ার আট দিন পর রাজার বাড়ী ডাকাতি হয়ে গেল। ডাকাতরা কিন্তু রাজবাড়ীতে ধনসম্পদ চুরি করতে আসেনি, এসেছিল রাজপুত্রকে চুরি করতে। কারণ রাজার কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে পরবর্তী সময়ে তারা রাজসিংহাসন দখল করতে পারবে। ডাকাতরা রাজপুত্রকে চুরি করলো গভীর রাতে সবার অলক্ষ্যে এবং অন্য রাজ্যে নিয়ে গিয়ে গভীর জঙ্গলে ফেলে দিল। এই সময় প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। তারা ভাবল আট দিনের শিশু এই শিলাবৃষ্টিতে রাজপুত্র আপনিই মরে যাবে। এই ভেবে ছেলেটিকে না মেরে ফেলে দিয়ে তারা চলে গেল। বৃষ্টি ও বরফ-শিলার আঘাতে শিশু রাজপুত্র চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। এই সময় ঐ বনে একটু দূরে এক বিরাট বড় হস্তিনী তার বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছিল; সে মানুষের বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়ে নিজ শাবকটিকে একদিকে সরিয়ে রেখে কান্না অনুসরণ করে এল এবং অসহায় শিশু রাজপুত্রকে দেখে তার মনে দয়া হলো। সে শিশুকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে গেল আপন আবাসস্থলে এবং দুই কান দিয়ে তার নিজের বাচ্চা ও মানুষের বাচ্চাটিকে রক্ষা করতে লাগলো। এমনি করে বেশ কয়েক বছর যায় হাতির বাচ্চা এবং রাজপুত্র উভয়েই বড় হতে থাকে। তারা দু'জনে একসঙ্গে খেলা করে। হাতির বাচ্চা মানুষের বাচ্চাকে (রাজপুত্র) দাদা বলে ডাকে। তাদের দুজনের মধ্যে খুব সদ্ভাব।

তারা পরস্পর জানে না যে তারা সহোদর ভাই নয়। এমনি করে দিন যায়, বছর যায় আস্তে আস্তে তারা যৌবনপ্রাপ্ত হয়। এই সময় গাড়ী চড়ে স্কুলে যেত। এই যাবার দৃশ্য তারা কয়েকদিন ধরেই দেখে শেষে রাজপুত্র কৌতূহল বশে হাতিভাইকে বললো চল্ দেখে আসি কি ওটা। হাতি মায়ের নির্দেশ ছিল তারা যেখানেই যাক্ যেন একসঙ্গে যায়। এ নির্দেশ ছাড়াও তাদের সহোদর প্রীতি ও বন্ধুত্ববশতঃ হাতিভাই রাজপুত্রকে পিঠে বসিয়ে বনের ধারে রাস্তার কাছে নিয়ে গেল। এরপর যখন রাজকন্যাকে দূর থেকে আসতে দেখলো তখন রাজপুত্রের মাথায় একটা ফন্দী এলো—সে হাতিভাইকে বললো ঐ গাড়ীকে ধরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতিভাই তাতে রাজি হয়ে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। গাড়ী যেই পাশে এল অমনি হাতিভাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গাড়ীর পেছনটা শুঁড় দিয়ে চেপে ধরলো। রাজকন্যা যতই গাড়ী চালাতে চেষ্টা করলো ততই গাড়ী অনড় হয়ে রইল। এদিকে হাতি ডাক ছাড়তে বন থেকে তার মা হাতি সমেত সমস্ত হাতির দল এসে গাড়ীকে চারপাশ থেকে শুঁড় দিয়ে চেপে ধরলো। এই সময় রাজপুত্র গাড়ীতে উঠে সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হলো এবং তাকে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু রাজকন্যা রাজী হলো না। তখন রাজপুত্র তাকে ভয় দেখিয়ে বললো তোকে যদি মাথার উপর তুলে বন্‌বন্ করে সাতপাক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলি তবে তুই সাত সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়বি। তখন ভয়ে রাজকন্যা রাজি হলো। রাজপুত্র পরের দিন তাকে সিঁদুর নিয়ে আসতে বললো। কিন্তু পরদিন থেকে রাজকন্যা আর ওমুখো হলো না। অন্য পথ দিয়ে সে স্কুল যাওয়া শুরু করলো। রাজপুত্র কিন্তু সর্বদা সিঁদুর নিয়ে ঘুরতো —সুযোগ পেলেই রাজকন্যাকে বিয়ে করবে। সুযোগ একদিন মিলে গেল—বেশ কিছুদিন পর একদিন বনের অন্তপ্রান্তে হাতিভাই ও রাজপুত্র খেলা করতে করতে ঐ গাড়ী দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তারা আবার ঐ গাড়ী ধরলো এবং রাজপুত্রের কোমরে গোঁজা সিঁদুর সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার সিঁথিতে পরিয়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করে নিল। এরপর তারা বনের মধ্যে হাতি মায়ের সেইআবাস যেখানে রাজপুত্র বাস করে সেখানে এল। দিন যায় তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলো। কিন্তু রাজকন্যার পরামর্শে একদিন রাজপুত্র হাতি-মা'কে বললো যে মা আমি তো তোমার পালিত সন্তান, সুতরাং আমার তো মা-বাবা আছে, আমি এখন তাদের কাছে যাব।

হাতি-মা এবং হাতি-ভাই কেউই তাদের যেতে দিতে চায় না। সে আর ফিরে আসবে না ভেবে তারা ব্যথাতুর হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের অনুরোধে তাদের যেতে দিতেই হলো। তবে হাতি-ভাই তাদের সঙ্গে যেতে চাইলো। রাজপুত্র এই প্রস্তাবে রাজি হলো। হাতি-ভাইয়ের পিঠে চড়ে রাজপুত্র বধূসহ আপন পিতৃ-মাতৃ সন্ধানে চলল বনের পাশের রাস্তা ধরে। এই সময় বনের সমস্ত জীব-জন্তু বেরিয়ে এসে তাদের আশীর্বাদ করতে লাগলো।

রাজপুত্র-রাজকন্যা এবং হাতি-ভাই যেতে যেতে এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলো। তারা এই গ্রামের এক গৃহস্থের কাছে আশ্রয় চাইলো। গৃহস্থ তাদের থাকবার জন্য একটা বারান্দা দিল। এখানে তারা দু'তিন মাস থাকবে ভাবলো। কিন্তু গ্রামের বাচ্চা ছেলে-পিলে হাতিকে দেখে খুব মজা পেল। তারা এসে কেউ লেজ ধরে টানে, কেউ শুঁড় টানে, কেউ খোঁচা মারে, এতে সে রেগে গিয়ে তাদের শুঁড় দিয়ে মারতে লাগলো। এতে গ্রামের লোকেরা রাজপুত্রের উপর রেগে গিয়ে বললো, তুমি এই হাতিকে হয় বিক্রি করো নচেৎ এখান থেকে চলে যাও। রাজপুত্র তার হাতি-ভাইকে বিক্রয় করতে রাজি হলো না। ওখান থেকে চলে গেল এবং যেতে যেতে এক নির্জন সমুদ্র-তীর দেখে সেখানে কুটির বানিয়ে বাস করতে লাগলো। সেই সময় রাজকন্যার গর্ভে একটি শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করলো। দিন যায় পুত্রটি হামাগুড়ি দিতে শিখলো। এমতাবস্থায় একদিন রাজপুত্র এবং রাজকন্যা ঘরে ঘুমিয়ে পড়লে শিশুটি বল নিয়ে খেলা করতে করতে বলটি সমুদ্রে গড়িয়ে পড়ে স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। শিশুটি তখন জলের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে বলটি নেবার জন্য যেতে লাগল। শিশুটিকে হাতি-ভাই মেরে ফেলতে পারে এই সন্দেহ করে রাজকন্যা সর্বদা হাতিকে বেঁধে রাখতে বলতো। রাজপুত্র এতে কান দিত না। কিন্তু এই দিনই বিরক্ত হয়ে হাতি-ভাইকে মোটা শিকল দিয়ে শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। হাতি-ভাই এইভাবে বাঁধা অবস্থায় শিশুটিকে জলের দিকে যেতে দেখে নিরুপায় হয়ে খুব চিৎকার শুরু করলো কিন্তু কিছুতেই রাজপুত্র-রাজকন্যা জাগলো না। হাতি তখন শিকল ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মোটা শিকল সহজে ছিঁড়লো না। হাতির একটা পা রক্তাক্ত হয়ে শেষে শিকল ছিঁড়লো সেই পায়ের, অন্য পাটি যে খুঁটিতে বাঁধা ছিল সেই খুঁটি উপড়াতে উপড়াতেই ছেলে জলে পড়ে ডুবে গেল। হাতি তখন জলে নেমে শুঁড় দিয়ে খুঁজে খুঁজে ছেলেকে পেলো। কিন্তু ছেলের তখন মৃত্যু হয়েছে। ছেলে জল থেকে তুলতে হাতির সমস্ত দেহ জলের মধ্যে ডুবে গেল, শুধু শুঁড়ে ছেলেটি উঁচু করে ধরে আস্তে আস্তে সে ডাঙায় আসতে লাগলো। এমন সময় ঘুম ভেঙে রাজকন্যা বাইরে এসে এই দৃশ্য দেখে সম্পূর্ণ ভুল বুঝে রাজপুত্রকে বললো ঐ হাতি তার ছেলে মেরে নিয়ে আসছে। রাজপুত্র প্রথমে একথা বিশ্বাস করলো না। দূরে বল ভাসতে দেখে সে বললো ঐ বল ধরতে গিয়েই ছেলে জলে পড়েছে। কিন্তু কিছুতেই সে তা বুঝলো না; বললো হয় হাতিকে মারো, নয় আমাকে ত্যাগ করো। রাজপুত্র হাতি-ভাই সম্বন্ধে এই অপবাদ কোনমতেই বিশ্বাস করলো না। কিন্তু রাজকুমারী নাছোড়বান্দা। তার সেই এক কথা হয় শুধু সে থাকবে, নয় শুধু হাতি থাকবে। তখন দুঃখে কাতর রাজপুত্র আরও কাতর হয়ে এবং অভিমান বশে হাতির ছেঁড়া শিকল দিয়ে হাতিকে মারতে লাগলো। হাতি-ভাই তাকে ভুল বোঝার জন্য এত দুঃখ পেলো যে মরণের জন্য ঘাড় পেতে দিল। রাজপুত্র পুত্র শোকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এবং আজীবনের সাথী হাতি-ভাই এই দুষ্কর্ম করলো ভেবে রাগে-দুঃখে তাকে মারতে মারতে মেরে সমুদ্রে ফেলে দিলো।

এরপর তারা ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করলো। যেতে যেতে এক রাজবাড়ীর সামনে এসে তারা ভিক্ষা চাইলো। এই রাজবাড়ীই তাদের বাড়ী। তারা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াতেই জানালা দিয়ে রাণী তাদের দেখতে পেয়ে দাসী দিয়ে তাদের ভেতরে ডাকলো।

তারা ভেতরে গেলে হঠাৎ রাণী রাজপুত্রের কোমরে জন্মের পর তিনি পরিয়ে দিয়েছিলেন। রাণীর মনে সন্দেহ হলো—এ কবচ কি করে এর কাছে এলো। রাণী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এটি কোথায় পেলো। রাজপুত্র বললো এটি তো তার কোমরে ছোটবেলা থেকেই আছে; কে জানে কে দিয়েছে। মা বাবাকে তো সে চোখে দেখেনি। হাতি-মা'র কাছে বনের মধ্যে সে মানুষ এবং ঐ হাতি-মা'র কাছেই শুনেছে। তাকে নাকি ডাকাতরা কোথা থেকে এনে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বনে ফেলে দিয়েছিল। এই কথা শুনে রাণী বুঝলেন এই-ই তাঁর সেই হারানো সন্তান। বিশাল রাজৈশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও রাজা-রাণী সন্তান হারিয়ে প্রায় পাগল হয়েছিলেন; তাঁরা তাঁদের হারানো সন্তানকে এমন হঠাৎ করে পেয়ে পুত্র-পুত্রবধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাদের চোখে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো। এরপর মহাধুমধামে অভিষেক করে রাজা রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা-রাণী তার হাতে রাজ্য ও সংসারের সব দায়িত্ব অর্পন করে নিশ্চিন্ত মনে সাধন ভজন করতে লাগলেন। রাজপুত্র ও রাজকন্যা সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

মাদারগাছি গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান প্রদীপকুমার সিন্‌হার
কাছ থেকে এটি পাওয়া গেছে

আদিবাসী সমাজের দৈনন্দিন জীবন-সংক্রান্ত কিছু তথ্য
রাজবংশীদের খাদ্য পদ্ধতি

একই পাতে প্রথমে এরা দই-চিড়ে-গুড় ইত্যাদি খায়, তারপর মুড়ি, আলুভাজা, ইত্যাদি শুকনো নোনতা খাবার খায়, তারপর ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ ইত্যাদি খায়।

মাছ রান্নার পদ্ধতি—আলুকুচি করে কেটে ছোট ছোট মাছ কুচি করে বেশী করে লঙ্কা এবং তেল দিয়ে ভাজা-ভাজা করে রান্না করে।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীভেদ

১। ব্রাহ্মণ, ২। দেশীয়া, ৩। পোলিয়া, ৪। কোচ, ৫। হাড়ি, ৬। সাঁওতাল, ৭। মুসহর, ৮। লোওয়া, ৯। ডোম।

সর্বউচ্চবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ২য় উচ্চবর্ণ—দেশীয়া, পোলিয়া, ৩য় উচ্চবর্ণ—সদ্‌গোপ, গোয়ালা, ৪র্থ বর্ণ—কোচ, হাড়ি, মুসহর, লোওয়া, তোলয়া (এরা শুদ্র)।

আদিবাসী—ডোম, সাঁওতাল।

'দেশীয়া' এবং 'পোলিয়া' এই দু'টি সম্প্রদায়ের দু'টি ভাগ।

এই বিভক্তিকরণের পেছনে একটি কিংবদন্তী আছে—প্রাচীনকালে কোন এক সময় এই অঞ্চলে যুদ্ধ লেগেছিল তাতে কিছু লোক দেশ ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, আর কিছু লোক দেশে ছিল। যারা পালিয়ে গিয়েছিল পরবর্তী সময়ে তাদের 'পোলিয়া' বলা হয়। যারা দেশে ছিল তাদের বলা হয় 'দেশীয়া'।

এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না ; তবে সম্প্রতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নিয়মভঙ্গ হতে দেখা যায়।

স্থানীয় ভাষায় দ্রব্যের নাম ঃ—কাঠের হামানদিস্তার বাটিটাকে 'ছাম' এবং মুগুরকে 'গাহিন' বলে।

গরুর মুখের জাল—'জাবি'

নিড়ানী বা খুরপী—'পশ্‌নী'
হাতপাখা—ব্যান,
মই—চোঙো।

বিয়ের গান (বেহার গীত)

(১)

ময়নার বাবা কাঁন্দছে জলের ঘটি নিয়ে।
কাঁহা গেল্ মোর ময়না বেটি।
আজ যদি রহল্‌তে ময়না বেটি।
আনে দিল্‌তে জলের ঘটি।
ময়না উরাল দেশো ছাড়ি।
ময়নার মা ও কাঁন্দছে রান্ধন ঘরে বসি।
কাঁহা গেল্ মোর ময়না বেটি।
ময়না উরাল দেশো ছাড়ি।
আজ যদি রহল্‌তে ময়না বেটি।
আনে দিল্‌তে ভাতেরো থালি।
ময়না উরাল দেশো ছাড়ি।

(২)

ময়নার জন্ম শশুর হেরিয়ানি
ময়না হলে ভন্ডির গালি।

বিয়ের সময় কাসাই গাছ ভাজার গান

(৩)

উঠো বহিন্ কুটো কাসাই
কাঁহে লাগালো এতেক দেরী।
কাসি ভাজা চুল্হা ও তহকে দিমুগে বহিন্
কাঁহে লাগালো এতেক দেরী।

(৪)

সিনায়ে ধুনায়ে মায়ের আগে খাড়া হ
মাগে খুলো কানের সোনা
কানের সোনা খুল্‌লে বে বেটা কানো শুন
ব্যাটারে রহ বছর দিন
বছর দিনো রহলে নিজাম হবে কারা
মাগে রহাল্ নিজাছে
চিঠি ভেজি কয়না চিঠি ভেজছে।
মাগে রহাল্ নিজাছে।

আমাদের এই শেষ দিনের সংগ্রহ কার্যের শেষে আমরা বলতে পারি যে আমরা শহরে মানসিকতার ধরণে মানুষ হলেও গ্রামীন সংস্কৃতি আমাদের মন থেকে চলে যায়নি। গ্রামের গৃহহারা সাধারণ মানুষের সরল প্রাণে থাকে দুঃখের আনন্দময় হিল্লোল। তারা দিনান্তে একত্র মজলিসে বসে চালায় প্রবাদের বাদ প্রতিবাদ, ধাঁধার ধাক্কা দেওয়া ছড়ার মালা, আর লোকনাট্যের লোকহাস্যতা। এ এক নূতন অনুভূতি আমাদের মনন ধারায়। আরও বেশী ভাল লাগল আজকের এই পুণ্য তিথিতে। আজ ১২৬তম জন্মোৎসব রবীন্দ্রনাথের। আর আজকের দিনটিতেই লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে আমরা রবীন্দ্রনাথের আন্তিকালের লোক সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তা ভাবনাকে আগামী প্রজন্মের কাছে আরও বেশী আকর্ষণীয় করার প্রতিজ্ঞা নিতে পারলাম। জানাই সমস্ত ডালখোলার পার্শ্ববর্তী দোমোহনা, চৌন্তাড়া, মাদার গাছী, হরিপুর গ্রামের সাধারণ মানুষকে, ডালখোলা সৎসঙ্গ শিবিরের কর্মকুশলী শ্রদ্ধেয় দাদা ও ভাইদের অজস্র ধন্যবাদ। সবশেষে আমার বিভাগের ইরা সরকার, সুপ্রিয়া নায়েক, রুবি ভট্টাচার্য, লিপি সরকার, আমি সুব্রত নারায়ণ মজুমদার প্রত্যেকের অকৃত্রিম সহযোগিতা। যারা প্রখর সূর্যের উত্তাপ উপেক্ষা করে মানুষের কাছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনত। যদি কিছু পাই যারে লোকসংস্কৃতিকে সংগ্রহশালাকে প্রদান করতে পারা যাবে। এদের কথা কোনদিন ভোলা যাবেনা। আর যাবেনা ভোলা পথপ্রদর্শক অজয়দা, পরিমলদাকে। সর্বোপরি অধ্যাপক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাস দা, যাদের সহযোগিতা না পেলে লোকসাহিত্য সংগ্রহ অভিযানই আমরা করতে পারতাম না। সবার কাছেই আমরা ঋণী।

ধন্যবাদান্তে—শ্রীসুব্রত নারায়ণ মজুমদার

বিভাগ-ঘ

নিশীথ মাহাতো
যশোদা ঘোষ (ভাই)
অখিল বিশ্বাস
পারমিতা চৌধুরী
মধুমিতা মজুমদার
সাহেরা তরফদার (বোনটি)

০৬. ০৫. ৯০ তারিখের সকাল ৮টার সময় যে অভিযান শুরু করেছিলাম আজ ০৯. ০৫. ৯০ তারিখের ঠিক দু'টোর সময় তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যে কৌতূহল ও দায়িত্ববোধ নিয়ে আমাদের ক্ষেত্র-গবেষণার কাজ শুরু করেছিলাম, তাতে কৌতূহল আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও সময় ফুরিয়ে যাওয়ার জন্ত নিরস্ত হতে বাধ্য হই।

ভুসামনি, ভগবানপুর, পাতনোর, পালসী, ভুসামনি (উত্তর) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত এই গ্রামগুলি থেকেই বেশিরভাগ তথ্য আমরা সংগ্রহ করি। লোক-সংস্কৃতির তথ্য সংগ্রহে উক্ত গ্রামগুলোর জনসাধারণ যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও ভালবাসা দিয়ে আমাদেরকে সময় দিয়েছে তাতে শুধু অভিভূতই হইনি—তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা—লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে।

শেষ দিন অর্থাৎ ০৯. ০৫. ৯০ তারিখ বুধবার আমরা মল্লিকপুর (রিহার) ও ভুসামনি (উত্তর) পঃ দিনাজপুর গিয়ে যে সমস্ত লোক সংস্কৃতি সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেছি তার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

মল্লিকপুর গ্রামের একটি বাড়ীতে শিব মন্দির নির্মাণের কারণ।

মল্লিকপুর গ্রাম পোঃ ডালখোলা, থানা বলরামপুর এক মহিলার কাছে তাঁদের বাড়ীতে শিব মন্দির নির্মাণের কারণ অনুসন্ধান করলাম। উক্ত পরিবারটি শিব ভক্ত। তারা বাবা ভোলানাথের ধামে পূজা দিতে যেত। তাদের মধ্যে দু'জনের পা ফুলে গেল এবং অবশ হয়ে যাওয়ায় হাঁটতে বা চলাফেরা করতে পারতো না। তাই তারা বাবার কাছে তাদের নিজেদের অপরাধী মনে করায় ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং বাবার কাছে জানতে চাইলো কি অপরাধে তাদের পায়ে এই ব্যাধি হয়েছে। বাবা ভোলানাথ মানুষের স্বরে তাদের জানায় যে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে গৃহে। তাই তারা বাবার নির্দেশ মতো গৃহে মন্দির নির্মাণ করে বাবাকে প্রতিষ্ঠা করে। এরপর তাদের পা ভালো হয়ে যায়। তারা এখন প্রতিদিন সকালে বাড়ীর সকলে স্নান করে ঐ পূজা মণ্ডপে উপস্থিত হয় এবং নিজেরাই ফুল, বেলপাতা ও ফলমূলাদি দ্বারা পূজা করে। ঐ মন্দিরে শিবরাত্রির দিন বড় করে পূজাটা হয়—যদিও ঐ পূজাও তারা নিজেরা করে।

রূপকথা ঃ

ভুষামনি গ্রামে রীতা রায় নামে একটি মেয়ের কাছে যে রূপকথাটি শুনলাম তা নিয়ে লিখিত হল—

এক বুড়ি ছিল। বুড়িটি মুড়ি বিক্রি করতো। বুড়ির এক নাতি ছিল। নাতিটি খুবই দুরন্ত ছিল। বুড়ি একদিন মুড়ি বিক্রি করে এসে পুকুরে মাছ ধরতে গেল। কিন্তু বড় মাছ একটিও না পড়ায় সেই বুড়ি ছোট মাছ যা পেয়েছিল সেগুলো সব ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত একটা ছোট মাছ নিয়ে বুড়িকে বাড়ী ফিরতে হ'ল। সেই মাছটি একটা হাঁড়িতে করে বুড়ি পুষতো। প্রতিদিন মুড়ি বিক্রি করে এসে বুড়ি মাছকে মুড়ি খাওয়াতো। এইভাবে মাছটি বড় হতে লাগল। একদিন বুড়ি মুড়ি বিক্রি করতে গেছে এমন সময় বুড়ির নাতিটি সেই মাছ ধরে ভাজা করে খেয়ে নিল। বুড়ি মুড়ি বিক্রি করে বাড়ী আসে এবং মাছ না দেখে নাতিটিকে জিজ্ঞাসা করল মাছ কোথায়। সে জানাল যে মাছ ভাজা করে সে খেয়েছে। তখন বুড়ি কাঁটাগুলো দেখতে চাইল এবং নাতি তাকে মাছের কাঁটাগুলো দেখাল। বুড়ি কাঁটাগুলো একটা কৌটায় ভরে রাখল। কয়েকদিন পর ঐ কৌটায় এক অপরূপ সুন্দরী রাজকুমারী জন্ম নিল। মাছের কাঁটা থেকে নির্মিত ঐ রাজকুমারী প্রতিদিন ভোরে উঠে লুকিয়ে বুড়ির বাড়ীর সমস্ত কাজ পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সম্পন্ন করতো। বুড়ি এবং তার নাতি কোন রকমেই সিদ্ধান্তে আসতে পারে না যে কে এসে সমস্ত কাজ এত পরিষ্কারভাবে করে দেয়। ব্যক্তিকে সন্ধান করতে না পারায় বুড়িটি রাত জেগে বসে থাকে—কেননা সেই ব্যক্তিকে যেভাবেই হোক দেখতে হবে। কিন্তু যখনই বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ে তখনই সেই রাজকুমারী সমস্ত কাজ সেরে নেয়। বুড়ি তখন অন্য উপায় অবলম্বন করে। বুড়ি হাতের একটি আঙুল কেটে একটা পাত্রে লবন রেখে সেটা কাছে নিয়ে বসে। যখন-ই ঘুম আসে তখন কাটা আঙুলে লবণ লাগায়। ফলে আর ঘুম আসে না। এবং যথারীতি সেই সুন্দরী নারীকে বুড়ি দেখতে পেল এবং তার নাতিকে দেখালো। নাতির সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেয়। পাশের বাড়ীর এক ধোপার মেয়ে এই সুন্দরী নারীকে হিংসা করতো—যেহেতু সে অপরূপ সুন্দরী। হিংসা পরায়না ঐ ধোপানী রাজকুমারীর ছদ্মবেশ ধরে একদিন রাজকুমারীকে কেটে বাড়ীর একপাশে পুঁতে রাখে। বুড়ির নাতি ধোপানীকে তার স্ত্রী মনে করে। সেই সুন্দরীকে যেখানে পোঁতা হয়েছিল সেখানে একটি কুমড়া গাছ হয় এবং তাতে কুমড়া ধরে। ছদ্মবেশী ধোপানী সেই কুমড়া কেটে যখন রান্না করছিল তখন সেই তরকারী বলে উঠল—

ঠকর থকর, ঠকর থকর ধোপানীরে খাই
চাকনী খান ঘুচায় দে বাহির বাড়ী যাই।

তখন ধোপানী ভয় পেয়ে যায়। এবং কিছু সিদ্ধান্ত করতে না পারায় সেই তরকারী ফেলে দেয়। ঠিক সেখানে আবার একটি বাতাবি লেবু গাছ জন্ম নেয়। স্বাভাবিক

নিয়মেই লেবু ধরলো। ইতিমধ্যে ধোপানীর এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। রাজকুমারীবেশী ধোপানী তার পুত্রকে নিয়ে ঐ লেবু গাছের ছায়ায় বসতো। একদিন ঐ লেবু গাছের নীচে ধোপানী তার পুত্রকে শুইয়ে রাখে এবং একটা লেবু তার গায়ে পড়ে এবং পুত্রটি মারা যায়।

এই পুত্র হত্যার জন্য দায়ী ছিল ধোপানীর (বধূহত্যা) অপরাধ।

বাউল

(১)

গুরু তুমি কৃপা করে ঘুচাও তোমার সন্দেহ
তুমি বিনে হিমোৎ দিতে না পারে কেহ।
শাস্ত্রে বলে মাতা-পিতা, গুরু হয় হে।

বাৎসল্যের পাত্র-পুত্রে কি কারণে তাহাকে
ত্রিতাপে জড়িত ক'রে ঠেকান বিপাকে।
পিতা-মাতার এই কি উচিৎ, বুঝাত গুরু আমাকে।

ভবের কাণ্ডারী জানি দীক্ষা গুরু পরমজন
কর্ম সূত্রে কেন করেন শিষ্যকে বন্ধন।
আমি অতি মূঢ় মতি, বুঝিনা ইহার কারণ।

এ সকলের কারণ প্রভু কহ গো কৃপা করি
গুরুগণের কার্য দেখে ভয় হল ভারী।
শুনবো আমি এসব তত্ত্ব কৃপা হলে তোমারি।

শিক্ষা গুরু দীক্ষা গুরু, পুরুষ কিবা প্রকৃতি।
কৃপা করে বল গুরু কোথায় কার স্থিতি।
কৃপা করে বল গুরু হরেনের এই মিনতি।

(২)

কি বাজিল কে বাজাল প্রাণ নিল প্রাণ নিল সই।
বাঁশী শুনে কেমন করে গৃহে বসে রই।
যমুনা পুলিনে কিম্বা বিপিনে কি বাজে সই।

শ্রবণের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল স্বর।
মধুর স্বরে আকুল করে তোমারি অন্তর
কুলবধূ আকুল করে, তার প্রাণে কি নাই গো ডোর।

উতলা হইএ রাধে, ঘরে আছে গুরুজন
কেন খোয়াইবি রাধে নিজে নিজের মান।
পলকে যায় জাতি কুলমান তিলেক নহিলে সাবধান।

কেমনে পাইব দেখা, হেন বাণী করে যেই
শ্যাম কালিয়া বলে যারে একি সখী সে
বিলা কবে কই বিশাখা শুন বাঁশী শুন সই।

বড় অপরূপ শ্যামরূপ, নয়ন কোনে আছে কাম
ভ্রূযু গে ইন্দ্র ধনু পুবে মনস্কাম
প্রেম রসে মাখা তনু হৃদে শান্তি সুখ ধাম।

হেন বাঁশী রব শুনিয়ে কুলের গৌরব গেল সই।
মনে লয়তার কাছে গিয়ে পায়ে পরে রই।
চল যাই সই, যথা বাজে বাঁচি মরি দেখে লই।

অলতা তিলকা পরা, রূপে আলো করেছে
কেয়র কুন্তল বানাই কিবা শোভা করেছে
চরণ সরজ ভেবে অলি মধু লোভে ঘুরতেছে।

এ দেহ এ মম প্রাণ সই লাগে যদি তার কাজে
ধর্ম অর্থ মক্ষ কাম মোর চরণ সরজে
(অধম) হরেন্দ্র কয় হই যেন লয় যুগল শ্রীপদ পঙ্কজে।

বাস্তুপূজা ঃ—

পৌষ সংক্রান্তিতে সকালে স্নান সেরে মাঠের কোন জায়গায় কিছু লোক জমায়েত হয়ে পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য বাস্তুদেবীর কাছে (মৃত্তিকা) প্রার্থনা করা হয় যেন আমাদের ফসলাদি ভালো হয়। ফসল উৎপাদনে কোন বিঘ্ন না ঘটে, ঠিক মতো ঘরে তুলতে পারি এবং তা দিয়ে আমাদের ভরণ-পোষণ ও সাংসরিক উন্নতিবিধান করতে পারি। শুধু পুরুষেরা এই পূজা করে থাকে। পূজাতে সেই কলা ব্যবহার করা হয় যে কলা অন্য পূজাতে ব্যবহার করা হয় না।

শেষে সেখানে ভাত রান্না করে খাওয়া হয়। উনানটি তৈরী করা হয় হিবলীর ডাল দিয়ে। সেখানে শেষে গান কীর্তনাদিরও ব্যবস্থা করা হয়।

বাস্তুপূজার একটি গানের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল—

মাগো বাস্তুদেবী তোমাকে জানাই
তোমার প্রসাদে যেন ভাল ফসল পাই
ফসল ভালো হলে পরে আনন্দ হবে ঘরে ঘরে
এই ভিক্ষা মা তোমার কাছে চাই।

নীরাকালির পূজা ঃ—

মানুষ বিপদে পড়লে বা নিরুপায় হয়ে এই পূজা করে থাকে। বাড়ীর এয়োস্ত্রী মেয়েরা এই পূজা করে। এই পূজার উপকরণ—কাচা কলা, সোয়া কিলো চাল, বাতাসা, চিনি, পান সুপারি। সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের এয়োস্ত্রীরা একটা বাড়ীর কোন একটা ঘরে জমায়েত হয়ে এই পূজা করে থাকে। এবং এই সময়ে নিম্নলিখিত গানটি করা হয়।

ওপরলতা মাটির পুসতি, ফুল ফুটেছে ডালে তারে দেখিলে
আমি যদি হইতাম গো সুতা তাহলে কৃষ্ণের শাল দিতাম
কাড়িয়ে চড়িয়ে তার গায়েতে তাকে দেখলে।
আমি যদি হইতাম চূড়া তাকে গড়িয়ে গড়িয়ে দিতাম
মস্তকে তাকে দেখলে।
আমি যদি হইতাম গো মালা তাকে গড়িয়ে গড়িয়ে দিতাম
কৃষ্ণের গলাতে তাকে দেখলে।
ইনতুলতা কানে কুনি ময়ুর পাখা দিয়ে ছানি, তারে দেখিলে
মধ্যে মধ্যে আবের ও ছানি ও লক্ষণ ভাই, হনুরে পাঠাও
মায়ের তুলতুলসি আনতে।
ও লক্ষণ ভাই পূজার এখন সময় হয়ে যায়
এখন তাড়াতাড়ি হনুরে পাঠাও চিনি দুধ আনতে।

ধাঁধা

(১) হাতীর দাঁত ময়ুরের পাখ
যে না বলতে পারে শুয়োরের জাত।

উঃ— মূলা

(২) হলদি চকচক দুধের বর্ণ
যে না ভাঙতে পারে গাধার জন্ম।

উঃ— ডিম

(৩) এক বেতে দু'চাল।

উঃ— কলাপাতা

(৪) চারদিকে চারটে খুটা
মাঝখানে ভিটা
খেতে খুব মিঠা।

উঃ—দুধ

(৫) এক ঘরে এক খুটি।

উঃ— ছাতা

(৬) চিৎকরিয়া ফেলিয়া
মুট করে ধরিয়া
আমার কাম করিয়া
দিলাম ছাড়িয়া।

উঃ— নীলনোড়া

(৭) এক গাছ টান দিলে বেত গাছ নড়ে
কুকিলে ডাক দিলে সমুদ্র নড়ে।

উঃ—ভূমিকম্প

(৮) পুরীতে ঝনঝন পুরীতে নিপুর
হাত নাই পাও নাই তার ঢোল হাত নেপুর।

উঃ— মাছ ধরার ছোট জাল

(৯) ঢোল ধইরা নাওটা ঢোল ধারে বায়
আগল পিছল দুইটা মানুষ কথা কইয়া যায়।

উঃ— মই, গরু, দুই মানু

(১০) এতম গাছে বেতম ধরে
ধরতে ধরতে আরো ধরে
রাত হলে ভেঙে যায়।

উঃ—হাট।

(১১) থাপুন থাপুন গাছটা থাপুন ফল ধরে
সুন্দরিরা বসে আছে থাপুন গাছের তলে।

উঃ—পাকা লঙ্কা।

(১২) এপার থেকে মারল তীর
ওপারে গিয়ে করে বিড়বিড়।

উঃ—মাছের পোনা।

(১৩) ছোট ছোট বাচ্চারা দুধে ভাতে খায়
বড় বড় গাছের সাথে যুদ্ধ করতে যায়।

উঃ—উলু/উই পোকা।

(১৪) কালো কৃষ্ণ জলে ভাসে হাড় নাই তার মাংস আছে

উঃ—জোক।

(১৫) উপরে লুতুপুতু পাতালে দরজা
আসিবে রাজার বেটী খুলিবে দরজা।

উঃ—বাবুই পাখির বাসা।

(১৬) কালো কালো মেদেনী কালো ঘাস খায়
রাত্রিতে মেদেনী খুকুদ লুকায়।

উঃ—নাপিতের কাচি।

(১৭) ছোট্ট ছাকরি ঘাস খায় টোকরি।

উঃ—উনুন।

(১৮) ইনবিল শীল সব বিল শুকায় গেল
গাছ হচ্ছে বিল।

উঃ—ডাব।

(১৯) দিন করে লক লক রাত্রিতে কোঁকড়া।

উঃ—গরু বাঁধার দড়ি।

কাহিনীমূলক ধাঁধা

(১) শোন কন্যা বিবরণ
ইন্দুরে যে বিড়াল মারে
ইহার কি কারন।

বিড়াল যদি শিকে থেকে কোন জিনিষ চুরি করে খায় আর তখন যদি কোন ইঁদুর শিকের দড়ি কেটে দেয় তবে বিড়ালটা মারা যায়।

(২) আঁখির ভিতর পক্ষীর বাসা
জল দিয়াছে শানে
চারপায়ের উপর নিপায়া আছে
দুপারে তুলেছে ডালে।

মরা গরুর মাথার কঙ্কালের চোখের গর্তে চড়াই পাখি বাসা করেছে। সকাল বেলায় কাশবনের উপর যে শিশির পড়ে সেটিই হচ্ছে শান। নদীতে ভাসমান মোষের পিঠে একটি পুঁটিমাছ লাফাচ্ছে। একটি কাকপক্ষী মাছটিকে তুলে নিয়ে গাছের ডালে বসেছে।

বিনা অক্ষরে কোন জিনিসের নামের বানান

(১) গলার হার, চোখের মনি—হারমনি।
(২) লাঙ্গলের ইস, নদীর কুল—ইস্কুল।
(৩) আকাশের তাপ, কানের দুল—আব্দুল।
(৪) হালের ইস, কলের পাত—ইস্পাত।

কয়েকটি প্রেমমূলক ছড়া

(১) পুকুরেতে পানি নাই
পাতা কেন ভাসে
যার সঙ্গে কথা নাই
সে কেন হাসে।

(২) ঘরের পিছনে নারকেল গাছ
চিকি চিকি পাতা
তোমার কথা মনে হলে
মাথায় ধরে ব্যাথা।

(৩) ফুল সুন্দর চাঁদ সুন্দর
আরো সুন্দর তুমি
পৃথিবীতে দুটি কথা তুমি আর আমি।

(৪) কষ্ট করে পত্র দিলাম
যত্ন করে যেখো
আমার কথা মনে হলে
চিঠি খুলে দেখো।

গল্প ঃ

কোন এক গ্রামে একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি ছোটবেলা থেকেই ভীষণ ডানপিটে। পরে সে যখন বড় হলো তখন সে একজন ডাকাতে পরিণত হলো। সে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে এক ভাঙা বাড়ীতে বাস করতো। কিছুদিন পরে এক সন্ন্যাসী কে সেই জঙ্গলেব মধ্য দিয়ে যেতে দেখে সেই ডাকাতটির হঠাৎ মনের পরিবর্তন হল এবং সে দীক্ষা নিতে চাইলো। সে সন্ন্যাসীকে সমস্ত ঘটনা বললো কিন্তু সন্ন্যাসী তাকে তখনি দীক্ষা দিতে চাইলো না। সন্ন্যাসী ডাকাতটিকে বললো পাশের রাজ্যে রাজার এক কন্যা আছে। সে কখনো পুরুষের মুখ দেখেনি। সেই রাজকন্যাকে যদি তুমি বিয়ে করতে পারো তবে তোমাকে কৃষ্ণ মন্ত্র দেবো।

সেখানে রাজবাড়ীতে রাজকন্যাকে কড়া প্রহরার মধ্যে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেই ডাকাত যুবকটি সব বাধা অতিক্রম করে রাজকন্যার কাছে পৌছিল এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। কিন্তু রাজকন্যা সেই বিয়ের প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হল না। সে বললো যুবকটি যদি সমুদ্র সেচে তিনটে হীরা তাকে এনে দিতে পারে তবেই সে তাকে বিয়ে করবে। সে তখন সেই প্রস্তাব মেনে নিয়ে সমুদ্র সেচতে গেল। কিন্তু দৈবক্রমে সেখানে তার সঙ্গে এক সাধুর দেখা হয়। এবং সাধুটি যুবকের সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং যুবক যে সমুদ্র সেচের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে তা জানতে পেরে তাকে নানাভাবে ভৎর্সনা করে এবং সমুদ্রের পাশে এক জায়গায় খুঁড়তে বলে এবং সেখান থেকে এক ঘড়া হীরা পাওয়া যায়। সেই হীরা নিয়ে সে যখন রাজবাড়ীতে গেল তখন রাজকন্যা সানন্দে তাকে বিয়ে করলো। তাদের বিয়ে হয়ে যাবার পরে যুবক ডাকাতটি আবার সেই সন্ন্যাসীর কাছে গেল। কিন্তু সন্ন্যাসী বিশ্বাস করতে চাইলো না যে সে রাজকন্যাকে বিয়ে করেছে। তখন রাজকন্যার দেওয়া একটি আংটি সন্ন্যাসীকে দেখালে সে বিশ্বাস করে কিন্তু তাকে আবো পরীক্ষার জন্য বলে যে, তার কৃষ্ণ মন্ত্র দেওয়ার বইখানি একজন কালো ছেলে চুরি করে নিয়ে গেছে। তখন সেই যুবক চোরকে ধরার জন্য অনুসন্ধান চালাতে থাকে এবং এক জঙ্গলের মধ্যে ছদ্মবেশী কৃষ্ণের কাছে সেই বইগুলো দেখতে পায়। বইগুলো চাইতে সে দিয়ে দেয় কিন্তু পর মুহূর্তে তাকে আর দেখতে পায না। যুবকটি তখন সবই কৃষ্ণলীলা বলে বুঝতে পারে। এবং সন্ন্যাসীকে একথা জানালে সন্ন্যাসী তাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করে এবং সন্ন্যাসী তাকে গুরু বলে স্বীকার করে নেয কারণ সেই ডাকাত যুবকটি কৃষ্ণের দেখা পেয়েছিল কিন্তু সন্ন্যাসী বহুদিন বহু তপস্যা করে কৃষ্ণের দেখা পায়নি।

(২) এক জোলা ও বাঘের গল্প ঃ

কোন এক গ্রামের এক প্রান্তে এক জোলা ও তার বউ বাস করতো। একদিন জোলা কিছু চাল এনে তার বউকে দিয়ে বললো—এগুলো তুই তাড়াতাড়ি রান্না করে দে, আমি খেয়ে ঘরে যাব। আমি বাঘ ভালুক কাউকে ভয় পাই না শুধু ট্যাবইকে ছাড়া। জোলার বউ তখন তাড়াতাড়ি রান্না করে জোলাকে খেতে দেয়। কিন্তু জোলা যখন খাওয়া দাওয়া করে ঘরে যাচ্ছে তখন তাকে বাঘে ধরে। কিন্তু তাকে যখন বাঘে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সে তখন এক গাছের ডাল ধরে আত্মরক্ষা করে। এবং গাছের উপর উঠে পড়ে। কিন্তু এ দিকে বাঘ বনের যত বাঘ জুটিয়ে এনে জোলাকে ধরার চেষ্টা করে। তখন বাঘের উপর বাঘ দাঁড়িয়ে জোলাকে ধরার চেষ্টা করে। জোলা এ ডাল থেকে ও ডালে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। এই পালিয়ে বেড়াবার সময় ডালে ডালে শব্দ উঠতে লাগলো। তখন জোলা বুদ্ধি করে বলতে লাগলো পড় পড় বুড়ো বাঘের উপর পড়। বুড়ো বাঘ ছিল সবার নীচে। সে পড়ি কি মরি করে ছুটে পালালো। বুড়ো ছুটতেই অন্য বাঘগুলো হুড়মুড় করে পড়ে গিয়ে ছুটে পালালো। তখন জোলা নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরে বউকে বললো, বউ আমি বলেছিলাম না, বাঘ ভালুক কাউকে আমি ভয় পাই না, শুধু মাত্র ট্যাবই (বৃষ্টি) ছাড়া।